সচিত্র

শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্য

—শ্রীহরিভক্ত দাস

শ্রীশ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্য

(পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)

নব্যং দিব্যং মধুর মধুরং নন্দপুত্রস্য ধাম্নঃ
প্রেমানন্দং প্রতিপদমহো সংবিধাতুর্মনোজ্ঞম্।
মাহাত্ম্যং তৎরুচিররসদং সর্ব্বতীর্থাধিমূর্দ্ধ্নঃ
নিত্যং পাঠ্যঞ্চ রসিকজনৈঃ শ্রীলবৃন্দাবনস্য ॥

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

শ্রীহরিভক্ত দাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

শ্রীগিরিধারি পাত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীবৃন্দাবন তৃতীয়া
শ্রীগৌরাঙ্গাব্দ—৫০৪
শ্রীবৃন্দাবন, মথুরা

ভিক্ষা— ১৫.০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। শ্রীহরিভক্ত দাস শাস্ত্রী,
কিনুবাবু কুঞ্জ, বাগবুন্দেলা
বৃন্দাবন মথুরা।

২। শ্রীমদ্ প্রিয়াচরণ দাস বাবজী মহারাজ
গোবর্দ্ধন অভিরাম গ্রন্থাগার

৩। শ্রীকৃষ্ণগোপালদাস বাবাজী মহারাজ
শ্রীরাধাবিনোদ মন্দির, রাধাকুণ্ড।

৩। শ্রীনিতাই গোপাল চন্দ
সিঙ্গাই যমুনা, মেদিনীপুর।

৪। শ্রীরূপ সনাতন গৌড়ীয় মঠ, বৃন্দাবন, মথুরা

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৃন্দাবন, সেবাকুঞ্জ

৬। মহেশ লাইব্রেরী
২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রিট, কলেজ স্কোয়ার
কলকাতা—১২

৭। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮ বিধান সরণী
কলিকাতা – ৬

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়দয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥

"নিবেদন"

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেব-
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ॥

শ্রীবৃন্দাবন একটি সর্ব্বোত্তম মহামহিমাময় তীর্থ। ত্রৈলোক্যের মধ্যে সর্ব্বতীর্থময় এই তীর্থের মহিমা মহর্ষি শ্রীবেদব্যাসও বর্ণন করিতে সমর্থ হন নাই। কেবল তাই নয় সর্ব্বসমর্থ স্বয়ং ভগবানও যাঁহার মহিমা বর্ণনে অসমর্থ। পূর্ণতম স্বরূপ শ্রীনন্দনন্দন পরিকর সমভিব্যাহারে যেস্থানে নিত্য বিলসিত, যেস্থানের বন উপবন সতত শিখিরবে মুখরিত, যাহার নানাবিধ উদ্যান পুষ্প সম্ভারে সমৃদ্ধিশালী, মুনিতুল্য বৃক্ষরাজি যেস্থানে সর্ব্বদা ফল ফুলে অবনত, যুগল কিশোরের ক্রীড়োপকরণ কুঞ্জ কুণ্ড ও সরোবর যাহাতে নিত্য সুশোভিত, যাহার চতুর্দ্দিকে স্বচ্ছ সলিলা পূত পাবনী শ্রীযমুনা সর্ব্বদা কলকল নাদে প্রবাহিত হইয়া আলবালের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। কাল প্রভাবে মহামহিমান্বিত সেই মহোত্তম তীর্থ লুপ্ত প্রায় হইলে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু স্বীয় অন্তরঙ্গ পরিকর শ্রীপাদ রূপগোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামী দ্বারা সেই লুপ্ত তীর্থের উদ্ধারের নিমিত্ত আদেশ করিলে, তদনুসারে তাঁহারা সেই লুপ্ত তীর্থের পুনরায় প্রকট করিয়াছেন। রাগানুগা ভক্তিতে শ্রীবৃন্দাবন লীলার স্মরণ

মনন যেমন একান্ত বিধেয়, তদ্রূপ রাগানুগীয় সাধক শ্রীবৃন্দাবন-বিহারীর নিত্যলীলার সহিত নিত্যলীলার স্থলকেও অপরিহার্য্য-রূপে স্মরণ মনন ও দর্শন করিয়া থাকেন। গোস্বামিগণের প্রকটিত বা প্রদর্শিত পন্থানুসারে সেই লীলাস্থলীর যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গোস্বামীগণের পদাঙ্কানুসরণে লীলাস্থল দর্শনার্থী শ্রীবৃন্দাবন হইতে বাহির হইয়া মধুবন, তাল-বন, কুমুদবন, বহুলাবন, কাম্যবন, খদিরবন, ভদ্রবন, বেলবন লৌহবন ও মহাবন দর্শনান্তে শ্রীবৃন্দাবন প্রত্যাগমনে যাত্রা সমাপ্ত করেন। মুখ্য এই দ্বাদশ বনের অন্তর্গত দর্শনীয় আরও দ্বাদশ উপবন ও বনাদি আছে তাঁহারা তাহাও দর্শন করিয়া থাকেন যথা—রাল বা বিহারবন, শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীবদ্রীনারায়ণ, শ্রীবর্ষাণ, সঙ্কেত, নন্দীশ্বর, যাবট, কোকিলাবন, কোটবন, খেলনবন, মাঠবন বা সেড়গড় ও বিক্রমবন বা দাউজী। চার-ধাম যথা—শ্রীবদ্রীনাথে শ্রীবদ্রীনারায়ণ, কাম্যবনে শ্রীরামেশ্বর, কুশীতে শ্রীদ্বারকানাথ এবং দাউজীতে শ্রীজগন্নাথদেব। অপর শ্রীগোবর্দ্ধন, শ্রীবর্ষাণ ও শ্রীনন্দীশ্বর এই পর্ব্বতত্রয়ও দর্শনীয় তথা বহুলাবনস্থ মানসরোবর, কুসুমসরোবর, চন্দ্রসরোবর, নারায়ণ সরোবর, প্রেমসরোবর, পাবন সরোবর এবং শ্রীবৃন্দা-বনে যমুনা পর পারে মানসরোবর এবং বংশীবট, শৃঙ্গারবট, সঙ্কেতবট, নন্দবট, যাবট বা কিশোরবট, অক্ষয়বট, ভাণ্ডীরবট শ্রীশ্যামকুণ্ডের পূর্ব্ব পার্শ্বে শ্যামবট তথা শ্রীমথুরায় শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গা, যাবটে পাড়ল গঙ্গা, শ্রীশ্যামকুণ্ডে পাতালগঙ্গা, গোবর্দ্ধনে

মানসীগঙ্গা, আদি বদ্রীতে অলকানন্দগঙ্গা এবং কুশীতে গোমতী গঙ্গা। অপর শ্রীমথুরায় শ্রীভূতেশ্বর, গোবর্দ্ধনে শ্রীচাক্‌লেশ্বর, কাম্যবনে শ্রীকামেশ্বর নন্দগ্রামে শ্রীনন্দীশ্বর এবং শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোপেশ্বর। যদিও প্রতি গ্রামের বনশোভা সত্যই মন হরণ করে তথাপি রালে বিহারবন শ্রীরাধাকুণ্ডে কদমখণ্ডী, পেটৌ-গ্রামে কদমখণ্ডী, পুছরীতে কদমখণ্ডী, সনেরায় নাগাজির কদম-খণ্ডী, বর্ষাণে গহ্বরবন, নন্দগ্রামে উদ্ধব কেয়ারী প্রভৃতি বিশেষ আকর্ষণীয়। শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায় ব্যতীত আরও কয়েক সম্প্রদায় আছেন যথা শ্রীরাধাবল্লভী সম্প্রদায়, গোকুলিয়া গোস্বামীগণ, শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায় প্রভৃতি তাঁহারাও প্রতি বৎসর দীর্ঘ সময় নিয়া মহাসমারোহে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ও দর্শন করিয়া থাকেন। শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ শ্রীজন্মাষ্টমীর পর দ্বাদশীর বৈকালে শ্রীবৃন্দাবন হইতে বাহির হইয়া মথুরায় শ্রীভূতেশ্বরে রাত্রি যাপন করতঃ ত্রয়োদশীতে মধুবন, তালবন ও কুমুদবন হইয়া পুনরায় মধুবনে রাত্রি বাস করেন। পরদিন মধুবন হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়া শান্তনুকুণ্ড হইয়া বহুলাবনে রাত্রিবাস। পরদিন বহুলাবন হইতে রাল হইয়া রাধাকুণ্ডে রাত্রিবাস। তারপর দিন শ্রীকুণ্ড হইতে শ্রীগিরিরাজ পরিক্রমা করতঃ গোবর্দ্ধনে রাত্রিবাস। অনন্তর শ্রীগোবর্দ্ধন হইতে যাত্রা করিয়া বেহেজ হইয়া রাত্রিতে লাঠাবন বা দিগ্‌ গ্রামে বিশ্রাম। পরদিবস লাঠাবন হইতে পরমাদর গ্রাম ও আদিবদ্রী হইয়া শ্রীকাম্যবনে অবস্থান করেন। পরদিবস শ্রীকাম্যবনের দর্শন ও

পরিক্রমা করতঃ রাত্রিতে কাম্যবনে বিশ্রাম। তারপরদিন কাম্যবন হইতে সনেরা হইয়া রাত্রিতে বর্ষাণে বিশ্রাম। অনন্তর বর্ষাণ হইতে সঙ্কেত হইয়া শ্রীনন্দগ্রামে অবস্থান। পরদিন নন্দগ্রাম হইতে কোকিলাবন দর্শনান্তে চরণ পাহাড়ী হইয়া শেষশায়ীতে রাত্রি যাপন। পরদিবস শেষশায়ী হইতে আসিয়া ফারাণ গ্রামে বাস। পরদিন শেরগড় বা খেলনবনে অবস্থান তারপরদিন খেলনবন হইতে রামঘাট ও চীরঘাট হইয়া রাত্রিতে নন্দঘাটে অবস্থান। অনন্তর নন্দঘাট হইতে ভদ্রবন, ভাণ্ডীরবন, মাঠবন, বেলবন ও মানস সরোবর হইয়া পাণিগ্রামে রাত্রিবাস। পরদিন পাণিগ্রাম হইতে লৌহবন, আনন্দীবন্দী হইয়া দাউজীতে রাত্রি বিশ্রাম। পরদিবস দাউজী হইতে ব্রহ্মাণ্ডঘাট হইয়া গোকুলে বিশ্রাম। পরদিবস গোকুল হইতে মথুরায় আসিয়া ভূতেশ্বরে বিশ্রাম। অনন্তর শ্রীমথুরার দর্শনান্তে শ্রীবৃন্দাবন প্রত্যাগমনে যাত্রা সমাপ্ত করেন। শ্রীব্রজমণ্ডলের বিশেষ বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়ের মাত্র দিক্ দর্শন করা হইল। কিন্তু অসীম বস্তুকে সসীমে আনা ইহাও নিতান্ত বাতুলতারই পরিচায়ক। যাহা হউক লীলাস্থল দর্শনার্থীর আহারাদির অনিয়মে দীর্ঘ পরিভ্রমণে পথশ্রমাদি হইলেও লীলাস্থল দর্শনে যে আনন্দ তাহাতে কিন্তু সেই বেদনা আদৌ স্থান পায় না ইহাই লীলাভূমি সন্দর্শনের নৈসর্গিক শক্তি। শ্রীমথুরা মাহাত্ম্য, শ্রীব্রজরীতি চিন্তামণি, শ্রীভক্তিরত্নাকর, শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে এই পুস্তিকার উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে এবং শ্রীমদ্

ব্রজমোহনদাস বাবাজী মহারাজকৃত ব্রজদর্শন গ্রন্থই এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য জ্ঞাতব্য এই যে এই পরিক্রমার ক্রম পুরাতন। কিন্তু নূতন পরিক্রমায় সেই ক্রম কিছু ব্যতিক্রম হইয়াছে, তবে এই ক্রমভিন্ন ব্রজের সীমান্ত পরিক্রমার আরও একটি ক্রম রহিয়াছে। সর্ব্বসাধারণের অবগতির নিমিত্ত সেই ক্রমটি এখানে সন্নিবেশিত করা হইল। যথা ক্ষেত্রপাল শ্রীভূতেশ্বর বাবার প্রণামাদি করিয়া সীমান্ত পরিক্রমার্থিগণ এখান হইতে মধুবন, তালবন ও কুমুদবন দর্শনান্তে ভেরকিনাগরা, সুখ, বচগাঁ কোথরা ও খেরাস্বামী বা স্বামীখেরা হইয়া পুছরী আগমন করেন, তদনন্তর শ্যামঢাক, বরোলী, ধাঁধুকি নাগরা এবং সোজাসুজি বেহেজ হইয়া দিগ্ আগমন করেন। অনন্তর মহিমনপুর খো, করমুখা, আলীপুর আদিবদ্রি, পশব, বড়োলী হইয়া কেদারনাথ। কেদারনাথ হইতে চরণপাহাড়ী হইয়া কলাবাটী পেঁছাইবে। তদনন্তর পাইগ্রাম, তিলোয়ার হইয়া সিঙ্গার, অন্ধোপ, সোন্দ। অনন্তর বনচারী, ডাকোরা হইয়া মেরোলি, খামি, লিখই, হোসেনপুর পেঁছাইবে। হোসেনপুর হইতে যমুনা পার হইয়া মারব ও দুর্ব্বাযা টীলা দর্শন করিয়া জেদপুরা, মানাগড়ি, ভমরোলা • বাজনো, পার্শলি বরোট, পিতোরা, সুরীর, টেটিগ্রাম হইয়া হিণ্ডোল, নসিটি বোরিকি নাগরা, এখান থেকে বোম্বার ধারে ধারে গমন করতঃ দরবে পর্য্যন্ত পেঁছাইতে হইবে। অনন্তর সরদার গড়, রায়া, কারব ও আনন্দীবন্দী হইয়া দাউজী পেঁছাইবে, অনন্তর

হাতোরা নুরপুর, তারপর চিন্তাহরণ ঘাট, এখান হইতে যমুনা পার হইয়া ২/৩ গ্রাম পর বাদে পেঁছাইবে এখান হইতে ধন-গ্রাম হইয়া শ্রীভূতেশ্বরে পেঁছাইলে সীমান্ত পরিক্রমা সম্পূর্ণ হইয়া থাকেন।

জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে শ্রীব্রজমোহন দাসজী ১৩১৭ সালে স্বসঙ্কলিত ব্রজ দর্শন নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন কালাপাহাড় যখন দেবমন্দির ধ্বংসে প্রবৃত্ত হয় সেই সময় তাহার অত্যাচারের পূর্ব্বেই শ্রীবৃন্দাবনস্থ বিশেষ বিশেষ শ্রীবিগ্রহ জয়পুর কারেলী প্রভৃতি স্থানে স্থানান্তরিত হয়েন। কিন্তু এ বিষয়ে আরও একটি কিম্বদন্তী প্রচার আছে যে যবন ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারে দেব মন্দির ধ্বংস হয়, কিন্তু ইহার প্রকৃত তথ্য সুধীগণের অন্বেষণীয়।

শ্রীশ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্য

শ্রীবৃন্দাবন ধাম

বৃন্দাবনানাং বিলসদ্বনানাং
বৈকুণ্ঠকুণ্ঠিকর বৈভবানাম্।
বৃন্দাবনং নাম বনং গুণশ্রী-
বৃন্দাবনং তৎ কতমচ্চকাস্তি ॥

শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র শ্রীবজ্রনাভকে মথুরা মণ্ডলে এবং হস্তিনাপুরে স্বীয় পৌত্র শ্রীপরীক্ষিৎকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া স্বধামে গমন করিলেন। অনন্তর একদিন মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীবজ্রনাভের দর্শনোৎকণ্ঠায় মথুরায় আগমন করিলে শ্রীবজ্রনাভ পিতৃব্যচরণে প্রণাম করতঃ পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা অভ্যর্থনা পূর্ব্বক সুখাসনে উপবেশন করাইয়া ধীরে ধীরে নিবেদন করিলেন। হে তাত! আমি যদিও মথুরায় রাজপদে সমাসীন তথাপি আমার মনে হয়, আমি যেন নির্জন অরণ্যেই বাস করিতেছি। শ্রীপরীক্ষিৎ শ্রীবজ্রনাভের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সন্দেহ নিরসনের নিমিত্ত শ্রীনন্দাদি গোপকুলের পুরোহিত শ্রীশাণ্ডিল্য ঋষিকে আহ্বান করতঃ স্বাভিপ্রায় জ্ঞাপন

করিলে ঋষিবর শ্রীবজ্রনাভ ও পরীক্ষিৎ উভয়কেই সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিতে লাগিলেন—হে নৃপদ্বয়! তোমরা একাগ্রচিত্তে এই ব্রজভূমির রহস্য শ্রবণ কর। এই ভূমি সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের অতীত পরব্রহ্মস্বরূপ সর্ব্বব্যাপক, এই হেতু ব্রজ বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং ইহা সদানন্দময়ী, অবিনাশী ও মুক্তগণের উপাস্য-ভূমি। ইহা কালত্রয়ের অতীত ও প্রলয়াদি বিকার রহিত। ঋষিবর তাঁহাদিগকে এই প্রকার বহু সারগর্ভ উপদেশ দিয়া পরিশেষে বলিলেন—হে বজ্রনাভ! তুমি আমার আদেশে শ্রীকৃষ্ণের লীলানুসারে এখানে গ্রাম ও বহু নগরাদি স্থাপন কর, তাহা হইলে ইহাতেই তোমার যাবতীয় অভিলাষ পূর্ণ হইবে।

শ্রীবজ্রনাভ তাঁহার আদেশ সানন্দে শিরোধারণ করতঃ শ্রীব্রজমণ্ডলে সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় সমস্ত লীলাস্থলী প্রকট করিলেন। তদনুসারে কোথাও গ্রাম কোথাও নগর, কোথাও বা কূপ খনন এবং কোন কোন স্থানে শ্রীবিগ্রহ স্থাপনাদি কার্য্য সম্পাদন করিলেন। কিন্তু কাল প্রভাবে তাহা লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল।

শ্রীবৃন্দাবন তথা শ্রীবৃন্দাবনস্থ তীর্থাদির কথা লোকে প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল। এমনই এক সময় কলিযুগ পাবনাবতার করুণা বরুণালয় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা তথা বন্যজন্তু প্রভৃতিকেও প্রেম প্রদানে কৃতার্থ করিতে করিতে শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্যের সমভিব্যাহারে শ্রীবৃন্দাবনে

আগমন করিয়াছিলেন। স্বীয় লীলাভূমির সন্দর্শনে প্রেম পুরুষোত্তমের প্রেম সহস্র সহস্র গুণে প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার দর্শনে শ্রীবৃন্দাবনের স্থাবর, জঙ্গম, ময়ূর ময়ূরী শুকশারী তৃণ গুল্মাদি প্রেমে নৃত্য করিতেছিল।

তীর্থপদের পাদস্পর্শে শ্রীবৃন্দাবনভূমি নিজেকে কৃতার্থ মানিলেন। এইরূপে ব্রজের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণে বিশেষ বিশেষ তীর্থ শ্রীরাধাকুণ্ডাদি আবিষ্কার দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনের এক দিক্ দর্শন দিয়াছেন। তাই এক কথায় বলা যায় এই শ্রীবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরই অবদান। শ্রীবৃন্দাবন ভূমির সর্ব্ব প্রথম আলোকপাত তাঁহারই। শ্রীমন্মহাপ্রভুই এই ভূমির ভিত্তি করিয়াছেন। শ্রীরূপ সনাতন প্রমুখ গোস্বামিগণ সেই ভিত্তির উপর গাঁথিয়া তুলিয়াছেন অপূর্ব্ব প্রাসাদ। তাঁহাদের প্রসাদেই লাভ করিয়াছি এই মহাপ্রাসাদ। যদিও গোস্বামিগণের সবই বিদিত, তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে তাঁহারা শাস্ত্ররীতিকে অঙ্গীকার করিয়া বহু শাস্ত্র সঙ্কলন পূর্ব্বক ব্রজের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করতঃ বহুযত্নে সমস্ত লুপ্ত তীর্থের পুনঃ উদ্ধার করিয়াছেন। ত্রিলোকের সমস্ত তীর্থের মধ্যে এই শ্রীবৃন্দাবনই ধন্য। শ্রীবৃন্দাদেবী কর্ত্তৃক এই বন সর্ব্বতোভাবে পরিরক্ষিত। শ্রীমহাদেব এখানকার ক্ষেত্রপাল। সর্ব্বমনোহর লীলামাধুর্য্যে বিমণ্ডিত পূর্ণতম স্বরূপ শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দন নিত্যলীলা পরায়ণ হইয়া গোপগোপীর সহিত নিত্যই এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন। সর্ব্ব-

পাতক নাশক পরম রমণীয় এই বন দেবতাগণেরও দুর্লভ। তাঁহারাও সূক্ষ্মরূপে এই স্থানে নিবাস করিতেছেন। সর্ব্বদুঃখের হারক, জীবমাত্রেরই মুক্তিদায়ক এই বনে সমস্ত ধামের পূর্ণ সমাবেশ এবং সমস্ত তীর্থ মূর্ত্তরূপে বিরাজিত। বৈকুণ্ঠের বৈভবকেও খর্ব্বকারী মহাবৈভবশালী পরম শোভনীয় এই বন গুণ ও শোভাসম্পদ সমূহের একমাত্র আধার স্বরূপে সর্ব্বোৎকৃষ্টতার সহিত শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। যাঁহার চতুর্দ্দিকে কজ্জলরাশি প্রতিম কৃষ্ণসলিলা শ্রীযমুনা সপ্তসিন্ধু, সপ্তলোক ও পৃথিব্যাদি ব্রহ্মাণ্ডের সপ্ত আবরণ ভেদ পূর্ব্বক গোলকধামে ভ্রমণ করিয়াও যেন শ্রীবৃন্দাবনের সেবার নিমিত্ত আলবালের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। এখানকার সকল বৃক্ষই শ্রীভগবানের অবতারের ন্যায় চিদাত্মক অর্থাৎ চিন্ময় তাদৃশ শক্তিমান অর্থাৎ অবতারবৎ শক্তিশালী ও রমণীয় তথাপি জগতস্থ প্রাকৃত ব্যক্তিগণ অবতারের তুল্য সেই সকল বৃক্ষকেও প্রাকৃত বৃক্ষের তুল্য দর্শন করিয়া থাকেন। সর্ব্বধামময়, সর্ব্বদেবতাময় সর্ব্বতীর্থময় এই বন যদিও প্রাকৃতবৎ প্রতীত হয় তথাপি ইহা লোকোত্তরবর্ত্তী লোকগণের অর্থাৎ বৈকুণ্ঠবাসী জনগণেরও চিত্তহরণ করিয়া থাকেন। অন্য প্রসঙ্গেও যদি কোন ব্যক্তি এই স্থানে একদিন মাত্রও নিবাস করে, তথাপি সেই ব্যক্তিরও শ্রীকৃষ্ণে সুদুর্লভা ভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইস্থানে প্রণালী মধ্যে, প্রাসাদে, শশ্মানে, শূন্যস্থানে, সর্পদষ্ট, পশুহত, অগ্নিদগ্ধ অথবা জলমগ্ন হইয়া যাহারা প্রাণত্যাগ করে স্থান প্রভাবে তাহারাও বিষ্ণু

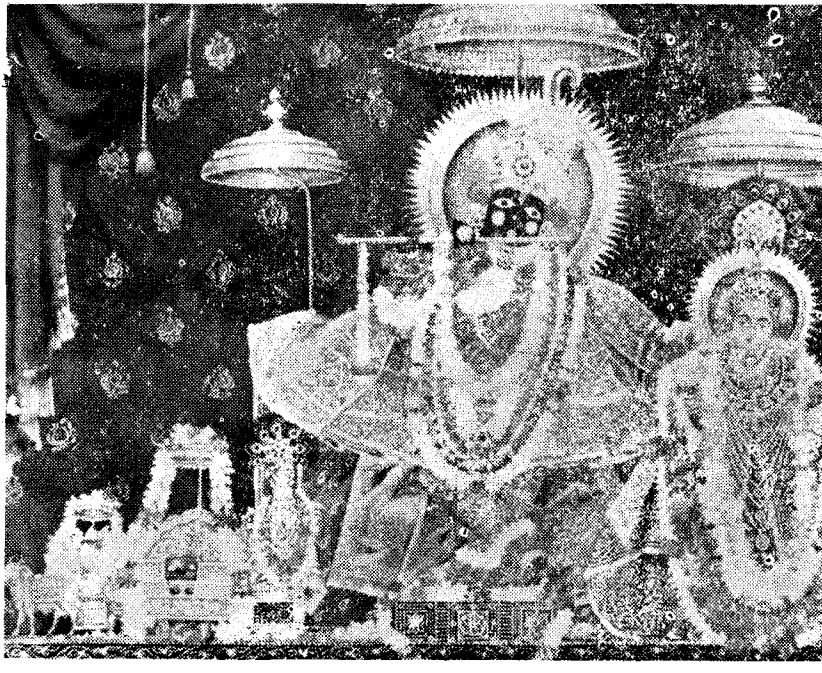

শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দদেব জীউ।

দীব্যদ্বৃন্দারণ্য কল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্রত্নাগার সিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধা শ্রীলগোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি।।

লোকে গমন করে। এখানে জীবনের মধ্যে যাহারা মাত্র একবার শ্রীগোবিন্দদেবকে দর্শন করিয়াছে, পৃথিবীতে তাহারাই কৃতার্থ। তাহারা সকলে পুণ্যবানগণের গতিই প্রাপ্ত হইবে। এই প্রকার দর্শনীয় বহুল শ্রীমূর্ত্তি শ্রীবৃন্দাবন ভূমিকে সমুদ্ভাষিত করিয়া অনাদিকালের সংসারবদ্ধ জীবনিচয়কে স্বীয় দর্শন দানে কৃতার্থ করিতেছেন। কিন্তু ইঁহাদের সকলের নাম ও পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয় বলিয়া কেবলমাত্র গোস্বামিগণের ও তৎসম সাময়িক কালের শ্রীমূর্ত্তির এবং নাতি প্রামাণ্য কিছু সংখ্যক শ্রীমূর্ত্তির নাম ও পরিচয় দিক্ দর্শন করা হইতেছে।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেবজীউ

শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া প্রাচীন মন্দিরের নৈঋত কোণ সংলগ্ন শ্রীগোমাটীলা হইতে শ্রীগোবিন্দদেব প্রকট হইয়াছিলেন। একদা শ্রীপাদ রূপগোস্বামী অত্যন্ত বিরহে অনাহারে শ্রীব্রহ্মকুণ্ড তীরে ভজন করিতেছিলেন। তৎকালে অকস্মাৎ এক গোপবালক তাঁহাকে দুগ্ধপূর্ণ একটি ভাণ্ড দিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল। বালকের সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য দর্শনে গোস্বামিপাদ মুগ্ধ হইলেন। তদনন্তর বালকের সেই অদৃষ্টপূর্ব্বরূপ ও দুগ্ধদানের কারণ চিন্তা করিতে করিতে সেই দুগ্ধ সমূহ পান করিয়া এরূপ আস্বাদন পাইলেন যে তাহা অমৃত কি দুগ্ধ ইহা কিছুই অনুভব করিতে না পারিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে তথায় শূন্য পাত্রটিও

দেখিতে পাইলেন না। গোস্বামিপাদ বালকের নিরূপম রূপ, লোকাতীত দুগ্ধাস্বাদ ও ভাণ্ড অন্তর্হিত বিষয় মনে বিচার করতঃ বুঝিতে পারিলেন যে ইহা একমাত্র নন্দনন্দন শ্রীগোবিন্দের কার্য্য। তখন তিনি তাঁহার দর্শনোৎকণ্ঠায় অত্যন্ত কাতর হইয়া বহু বিলাপ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার আর্ত্তিপূর্ণ করুণ ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া ভক্তবৎসল শ্রীগোবিন্দ তাঁহার প্রতি স্বপ্নাদেশে জানাইলেন আমি যোগপীঠে মৃত্তিকার মধ্যে আছি, প্রত্যুষে তুমি তথায় উপনীত হইয়া দেখিবে একটি দুগ্ধবতী গাভী আসিয়া দণ্ডায়মান হইলে যে স্থানে তাহার স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইতেছে, সেই স্থানের মৃত্তিকার নিম্ন হইতে উত্তোলন করিয়া তুমি আমাকে সেবা করিবে। গোস্বামিপাদ স্বপ্নাদেশ পাইয়া সানন্দে পরদিবস প্রত্যুষে যোগপীঠে উপস্থিত হইয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন দণ্ডায়মাণ একটি কপিলা গাভীর স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছে। তদনন্তর গাভী প্রস্থান করিলে দুগ্ধাভিষিক্ত ঐ মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে অপরূপ ললিত ত্রিভঙ্গ শ্রীগোবিন্দ জীউকে দেখিতে পাইয়া সানন্দে তথা হইতে উত্তোলন করিয়া অভিষেকাদিক্রমে সিংহাসনে স্থাপন করতঃ স্বয়ং সেবা করিতে লাগিলেন।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর উদ্ভাবনায় অত্যুচ্চ চূড়াযুক্ত সপ্ততলা বিশিষ্ট অত্যাশ্চর্য্য মন্দির নির্ম্মাণ হয়; এই শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের অন্তরালে এক অদ্ভুত দৈব ঘটনা নিহিত আছে। শ্রীমন্দি-

রের আরও এক বৈশিষ্ট্য মন্দিরের মধ্যস্থ জগমোহনের উপরি ভাবে সহস্রদলবিশিষ্ট পদ্ম আজও দর্শনার্থীর নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন। ইহাও দৈব ঘটনার অকৃত্রিম নিদর্শন।

কথিত আছে শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদনমোহন এই মূর্ত্তিত্রয়কে শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র শ্রীবজ্রনাভ শ্রীউত্তরা দেবীর আদেশে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শ্রীউত্তরা দেবী বিগ্রহত্রয়কে দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন—শ্রীগোপীনাথ জীউর বক্ষঃস্থল সত্যই কৃষ্ণের ন্যায় হইয়াছে এবং শ্রীগোবিন্দের মুখারবিন্দ আর শ্রীমদনমোহনের শ্রীচরণ, এই বিগ্রহত্রয়ের সম্মিলনে সাক্ষাৎ স্বরূপ প্রকটিত। একারণ ভক্তবৃন্দও দর্শনের পরিপূর্ণতার নিমিত্ত সবিশেষ উল্লাসভরে নিত্যই শ্রীবিগ্রহত্রয়ের দর্শন করিয়া থাকেন।

অনন্তর শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর উদ্ভাবনায় শ্রীগোবিন্দ জীউর শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ হইলে পর উড়িষ্যা হইতে শ্রীরাধামূর্ত্তি শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করতঃ শ্রীগোবিন্দের বামপার্শ্বে শোভা বর্দ্ধন করিলেন। কথিত আছে দাক্ষিণাত্য দেশবাসী শ্রীবৃষভানু নামে জনৈক ব্রাহ্মণ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি সাতিশয় প্রীতিভরে কেবল শ্রীরাধামূর্ত্তির সেবা করিতেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি স্বধামে গমন করিলে গ্রামবাসী সেই শ্রীরাধামূর্ত্তির সেবা পূজা করিতেছিলেন; পরে তাঁহারা পুরীর ভূপতি প্রতাপরুদ্রের নিকট পাঠাইয়া দেন। নৃপতি স্বপ্নাদেশ পাইয়া রাধামূর্ত্তিকে শ্রীজগন্নাথদেবের বামপার্শ্বে চক্রবেড়ে স্থাপন করিলে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকগণ তাঁহাকে শ্রীলক্ষ্মীদেবীরূপে

পূজা করিতেন। সেই সময় শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপগোস্বামীর হৃদয়সর্ব্বস্ব শ্রীগোবিন্দ জীউ প্রকট হইয়াছেন। তখন শ্রীরাধিকা একদিন রাত্রে প্রতাপরুদ্রের পুত্র পুরুষোত্তমকে এবং শ্রীল গদাধর গোস্বামীর এক শিষ্যকে স্বপ্নে বলিলেন আমার প্রাণনাথ শ্রীনন্দনন্দ শ্রীবৃন্দাবনে প্রকট হইয়াছেন, এক ভক্তের প্রেমে বশীভূত হইয়া আমি উড়িষ্যায় আসিয়াছি কিন্তু আমাকে অতি শীঘ্র ব্রজে পাঠাইয়া দাও, আমি লক্ষ্মীদেবী নই। শ্রীরাধিকার স্বপ্নাদেশ পাইয়া পুরুষোত্তমদেব শ্রীগদাধর পণ্ডিতের দুই শিষ্য দ্বারা শ্রীরাধামূর্ত্তি বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া মহাসমারোহে শ্রীগোবিন্দের বামপার্শ্বে শ্রীরাধামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। বর্ত্তমান সময়ে তিনি জয়পুর পত্তনে শ্রীগোবিন্দদেবের বামপার্শ্বে শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন।

তদনন্তর গোস্বামীগণের অপ্রকটের পর কালাপাহাড় কর্ত্তৃক শ্রীবৃন্দাবনে উৎপাত হইবার সম্ভাবনা মনে করিয়া জয়পুরের ভাগ্যবান রাজা শ্রীভগবদাদিষ্ট হইয়া শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন, শ্রীরাধামাধব, শ্রীরাধাদামোদর, শ্রীরাধাবিনোদ জীউকে আপনার রাজ্যে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। এই সময় শ্রীরাধারমণ, শ্রীরাধাবল্লভ এবং শ্রীবঙ্কুবিহারী জীউকেও লইয়া যাইবার প্রস্তাব হইয়াছিল কিন্তু মন্দিরের সেবকবৃন্দ শ্রীমূর্ত্তিকে ব্রজের বাহির করিতে কিছুতেই সম্মত না হওয়ায় অগত্যা এই মূর্ত্তিত্রয়কে শ্রীবৃন্দাবনে রাখা হয়। যে সমস্ত শ্রীবিগ্রহ জয়পুর পত্তনে স্থানান্তরিত হইয়াছেন,

তন্মধ্যে শ্রীমদনমোহন করৌলীতে বিরাজমান, শ্রীরাধামাধব জয়পুর রাজধানীর তিন মাইল দূরবর্ত্তী ঘাঁটি নামক মনোরম স্থানে বিরাজিত শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীরাধাবিনোদ জয়পুর রাজধানীর উপরেই বিরাজমান, শ্রীগোবিন্দদেব জীউ জয়পুর রাজান্তঃপুর মধ্যে মহা আড়ম্বরে পূজা গ্রহণ করতঃ সমাগত ভক্তবৃন্দের ভক্ত্যর্ঘ্য প্রাপ্ত হইতেছেন। অপর শ্রীরাধাদামোদর জয়পুর রাজধানীর শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। এই প্রকারে শ্রীবৃন্দাবনের প্রধান প্রধান শ্রীবিগ্রহ জয়পুরাদিতে স্থানান্তরিত হওয়ায় কালাপাহাড় শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মন্দিরে কোন বিগ্রহ দেখিতে না পাইয়া অবশেষে শ্রীমন্দিরের চূড়াগুলি ভগ্ন করিয়া অন্যত্র গমন করিলে পূর্ব্বোক্ত মন্দিরের সেবকগণ শ্রীভগবদাদেশে পুনরায় পুরাতন মন্দিরের পার্শ্বে নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া শ্রীমূর্ত্তি স্থাপনা করিয়াছেন। সেই শ্রীগোবিন্দদেবই এক স্বরূপে শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য বিহার সম্পাদনের নিমিত্ত প্রাচীন মন্দিরের নৈঋত কোণে নূতন মন্দিরে বিজয় মূর্ত্তিতে শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন।

যাঁহারা জীবনের মধ্যে মাত্র একবার শ্রীবৃন্দাবনে বৃন্দাবনাধিদেব ললিত ত্রিভঙ্গ অপরূপ মাধুর্য্য বিমণ্ডিত শ্রীগোবিন্দদেবকে দর্শন করিয়াছেন, সেই কৃতকৃতার্থ ব্যক্তিগণ আর কোন দিন যমপুরে গমন করিবেন না, ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। শ্রীগোবিন্দদেবের এই নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন

শ্রীযুক্ত নন্দকুমার বসু মহোদয়। প্রাচীন মন্দিরের পূর্ব্ব ঈশান-কোণে শ্রীরঙ্গনাথ জীউর গড়ের মধ্যে শ্রীগজরাজ কুণ্ড অবস্থিত। শ্রাবণী পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে এখানে গজেন্দ্র মোক্ষণ লীলার অভি-নয় হইয়া থাকে। গোবিন্দ মন্দিরের ঈশান কোণে শ্রীব্রহ্মকুণ্ড অবস্থিত। অতি পুণ্যজনক রমনীয় এই মহাতীর্থে প্রাণত্যাগ করিলে সেই ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুলোকে গমন করেন। কুণ্ডতীরে তপস্যারত শ্রীব্রহ্মাজী দর্শনীয়, এই মন্দিরের পূর্ব্বকোণে চৌষট্টী মহান্ত সমাধি অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীপাদ রঘুনাথ ভট্ট গোস্বা-মীর তথা ছয় চক্রবর্ত্তী ও অষ্ট কবিরাজের সমাধি বিরাজমান দর্শনীয়। এই সমাধির উত্তরে বেণু কূপ অবস্থিত। একদা শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে সখাগণের সহিত মল্লযুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই সময় সখাগণ তৃষ্ণায় কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট জল প্রার্থনা করিলে শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে বেণুর মুখ রাখিয়া ধ্বনি করিবামাত্র পাতাল হইতে জল নির্গমন হইতে লাগিল। সখাগণ তখন পরমানন্দে সেই জল পান করিয়া বারম্বার শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসা করিতে করিতে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। সেই অবধি এই কূপের নাম বেণু কূপ বলিয়া প্রসিদ্ধ। পুরাতন মন্দিরের নৈঋত কোণে পাতালদেবী বা যোগমায়াদেবী বিরাজমান এবং বায়ু-কোণে শ্রীবৃন্দাদেবীর মন্দির ও মন্দিরের সম্মুখের দক্ষিণভাগে শ্রীকৃষ্ণবলরাম ও বামভাগে শ্রীরাধাগোপাল জীউ দর্শনীয়।

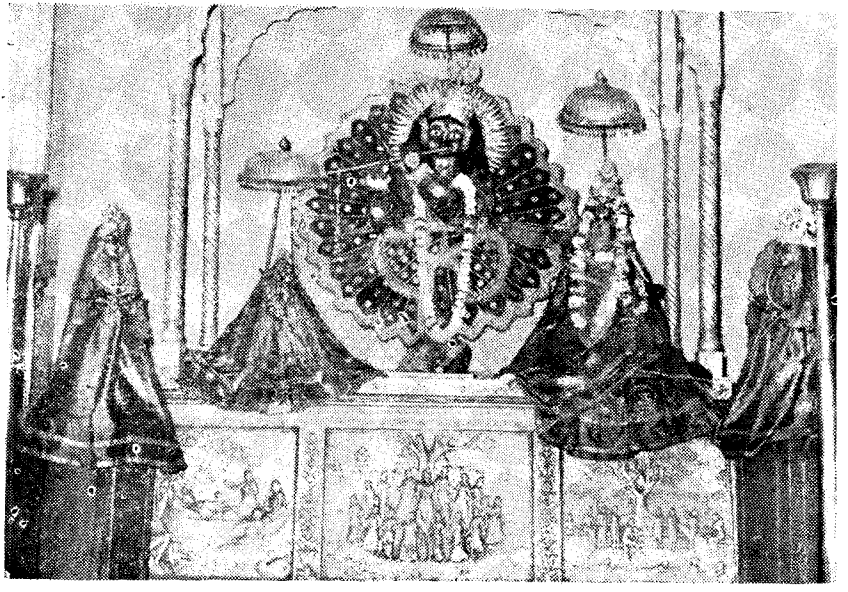

শ্রীশ্রীরাধা গোপীনাথ জীউ।

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপী গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥

শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ জীউ

শ্রীল মধুপণ্ডিত নবদ্বীপবাসী, ইনি শ্রীল গদাধর গোস্বামীর শিষ্য, শ্রীকৃষ্ণ গুণগানে দিবানিশি বিভোর থাকিতেন, একদিন ভক্তমুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণ লীলা মাধুরী শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের নিমিত্ত সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। একদিন প্রভুর প্রবলাকর্ষণে অকস্মাৎ পাগলের ন্যায় গৃহত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করতঃ কেশিঘাটে পরমানন্দ ভট্টাচার্য্যের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন লালসা প্রবলরূপে বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি আর কোথাও স্থির হইতে না পারিয়া পাগলপারা হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন বংশীবটের তটে বসিয়া সাতিশয় বিহ্বল অন্তরে বিলাপ করিতে করিতে মূর্চ্ছা হইয়া যান। ভক্তবৎসল শ্রীভগবান ভক্তের ব্যাকুল ক্রন্দনে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তখন অপরূপ রাসরসারম্ভী ললিত ত্রিভঙ্গী স্বরূপে মধুর মুরলী বাজাইতে বাজাইতে শ্রীগোপীনাথরূপে তাঁহাকে দর্শন দিলেন। তৃষিত চাতকের ন্যায় তাঁহার রূপামৃত পানে অতৃপ্ত হইয়া প্রার্থনা করিলেন—প্রভু তুমি এইরূপেই আমার নিকট সর্ব্বদা অবস্থান কর, আমাকে আর বঞ্চনা করিও না। ভক্তবৎসল ভগবান মধুপণ্ডিতকে বলিলেন মধু! আমি তোমার নিকট সর্ব্বদা এইরূপেই অবস্থান করিব কিন্তু এখন কলিকাল, সুতরাং সকলের সমক্ষে আমার এইরূপে

অবস্থান সম্ভব নহে, সকলের জন্য আমি শ্রীমূর্ত্তিরূপে দর্শন দিব, এই বলিয়া শ্রীগোপীনাথ মূর্ত্তিরূপে আবির্ভূত হইলেন, শ্রীমধু পণ্ডিত প্রেমে তাঁহাকে আলিঙ্গন করতঃ নিজস্থানে আনিলেন এবং শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীরাধাগোপীনাথ নামে সেই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই অবধি শ্রীরাধিকা গোপীনাথ জীউর বাম পার্শ্বে শোভিত আছেন অনন্তর শ্রীপাট খড়দহ হইতে শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীমতী জাহ্নবাদেবী স্বীয় পরিকর সমভিব্যাহারে শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিলে তৎকালে শ্রীরূপ সনাতন শ্রীগোপাল ভট্ট ও শ্রীজীব প্রমুখ গোস্বামীবৃন্দ সকলেই তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনাদি করতঃ তাঁহারা সঙ্গে লইয়া শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদনমোহন প্রভৃতি দর্শন করাইয়াছিলেন এবং শ্রীমতী জাহ্নবা মাতা শ্রীমুখে শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন প্রভৃতি শ্রীমূর্ত্তির মহিমা বর্ণন দ্বারা গোস্বামীবৃন্দকে আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত করতঃ স্বয়ংও আনন্দ সহকারে শ্রীবৃন্দাবনের দর্শন ও পরিক্রমাদি করিতেছিলেন। কিন্তু শ্রীপাট খড়দহ গমনে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া রামাই প্রভু অনুযোগ করিলেন, মাগো! শ্রীকাম্যবন দর্শন কতদিনে হইবে? শ্রীরামই প্রভুর আগ্রহাতিশয় দেখিয়া মা জাহ্নবা শ্রীরূপ সনাতন ও শ্রীজীব প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীদাস গোস্বামীকে দর্শন দিয়া কাম্যবনে আগমন করিলেন। কাম্যবনে শ্রীগোবিন্দ জীউ দর্শন করিয়া শ্রীগোপীনাথ মন্দিরে আগমন করতঃ প্রাণবল্লভ শ্রীগোপীনাথের দর্শন করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন।

মা জাহ্নবা শ্রীগোপীনাথের নিমিত্ত স্বহস্তে রসুই করিয়া ভোগ সমর্পণ করিলেন। অনন্তর সন্ধ্যাকালে শ্রীরূপসনাতন প্রমুখ গোস্বামীগণ আকুল আবেগভরে শ্রীগোপীনাথের সম্মুখে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে শ্রীমতী জাহ্নবা মাতা শ্রীগোপীনাথের আরত্রিক আরম্ভ করিলেন। আরত্রিক অন্তে দেবী শ্রীগোপীনাথকে প্রণাম ও পরিক্রমা করিয়া বাহিরে আসিবেন এমনি সময়ে শ্রীগোপীনাথ মা জাহ্নবার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করিলে দেবী উলঠিয়া গোপীনাথের নয়ন প্রান্তে নয়ন প্রদান করিবামাত্র শ্রীগোপীনাথ দেবীকে আত্মসাৎ করতঃ প্রীতিভরে স্বীয় বাম পার্শ্বে বসাইলে মা জাহ্নবা সেই বিগ্রহে তথায় সমাধিস্থ হইয়া যান। তদবধি ব্রজের সর্ব্বত্র শ্রীগোপীনাথ জীউর বামপার্শ্বে শ্রীমতী জাহ্নবা-মায়ের শ্রীমূর্ত্তি শোভিতা আছেন। এই হেতু শ্রীগোপীনাথের দক্ষিণে শ্রীরাধা ও বামপার্শ্বে শ্রীমতী জাহ্নবা মাতা শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। এই মন্দির বর্ত্তমান গোপীনাথ বাজার সংলগ্ন শ্রীরাধারমণ মন্দিরের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। কালাপাহাড়ের উৎপাত কালে শ্রীগোপীনাথ জীউ জয়পুর পত্তনে স্থানান্তরিত হওয়ায় শ্রীভগবদাদেশে মন্দিরের সেবকবৃন্দ পুরাতন মন্দিরের উত্তরভাগে শ্রীগোপীনাথ জীউর বিজয় মূর্ত্তি নূতন মন্দিরে স্থাপনা করিয়াছেন, এই মন্দিরের পার্শ্বে শ্রীপাদ মধু পণ্ডিত গোস্বামীর সমাধি অবস্থিত। এই মন্দিরও শ্রীযুক্ত নন্দ কুমার বসু মহাশয় নির্ম্মাণ করাইয়া ধনী নামের সার্থকতা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন জীউ

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মমন্দমতে র্গতী।
মৎসর্ব্বস্ব পদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া শ্রীমদনমোহন মথুরার চৌবে রমণীর গৃহ হইতে আসিয়া তাঁহার সেবা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। কথিত আছে—শ্রীবৃন্দাবনে পূর্ব্বে কোন গার্হস্থ্য আশ্রমী ব্যক্তির বাস ছিল না, কেবল নিবিড় অরণ্যেই পূর্ণ ছিল। তজ্জন্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী প্রত্যহ ভিক্ষার জন্য অর্থাৎ আহার্য্যের নিমিত্ত মথুরায় যাইতেন। তিনি একদিন কোন চৌবের গৃহে শ্রীমদনমোহনকে দর্শন করিয়া তাঁহার রূপ লাবণ্যে মোহিত হন। তদবধি শ্রীসনাতন প্রতিদিন মথুরায় যাইয়া প্রথমেই শ্রীমদনমোহন দর্শন করিয়া তদনন্তর ভিক্ষা করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। চৌবের রমণী স্বাভাবিক প্রীতিভরে বাৎসল্যভাবেই মদনমোহনের সেবা করিতেন। তৎফলে আচারের দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না, তদ্দর্শনে শ্রীসনাতনের মনে দুঃখ হওয়ায় তিনি একটু পবিত্রতার সহিত সেবা করিতে আদেশ দেন। কিন্তু চৌবের রমণী স্বাভাবিক প্রীতিবশতঃ বিধির দিকে লক্ষ্য রাখিতে পারেন নাই। সেইরূপেই শ্রীমদনমোহনের সেবা করিতেছেন পরদিন শ্রীসনাতন

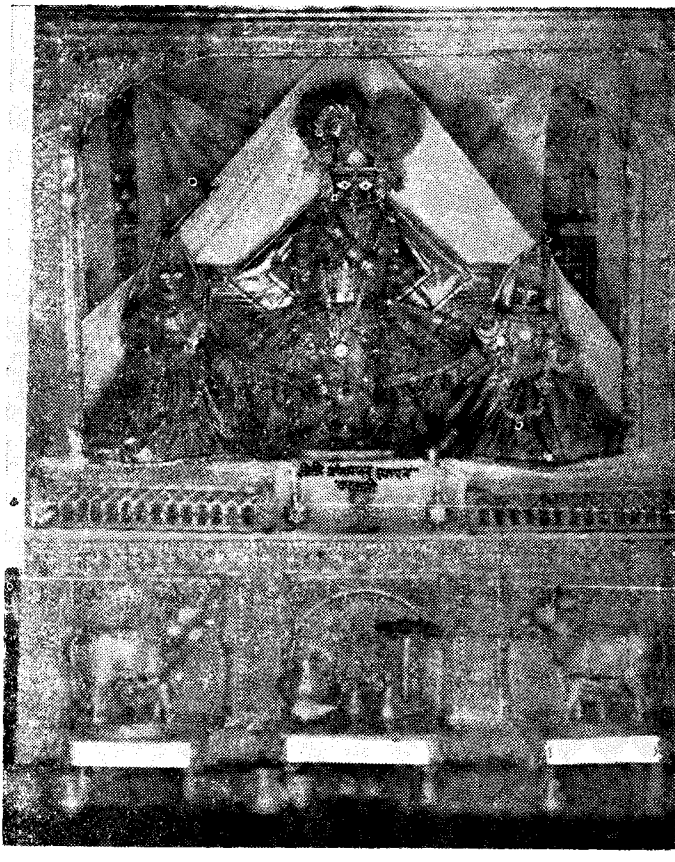

শ্রীশ্রীরাধা মদনমোহন জীউ।

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মমন্দমতের্গতী।

মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ॥

চৌবের গৃহে যাইয়া দেখেন শ্রীমদনমোহন চৌবে বালকের সহিত একত্রে বসিয়া ভোজন করিতেছেন এবং বালক স্বভাব সুলভ চাঞ্চল্য দোষ বশতঃ যেরূপ গোলমাল করিয়া থাকে শ্রীমদনমোহনও বালকগণের সহিত তাহাই করিতেছেন। তখন শ্রীসনাতন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চৌবের স্ত্রীকে প্রণাম ও বহুবিধ স্তুতি করিতে করিতে আপনাকে অপরাধী জ্ঞানে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ যেখানে শুদ্ধভাব সেই স্থানে আচার বিচার বা পবিত্রতা স্থান পায় নাই, শুদ্ধ ভাব লাভের নিমিত্তই যাবতীয় আচার বিচারের অনুষ্ঠান। অনন্তর শ্রীসনাতন চৌবে স্ত্রীর নিকট শ্রীমদনমোহনের ভোজনাবশেষ প্রার্থনা করিলেন। চৌবে স্ত্রী প্রসন্ন মনে শ্রীমদনমোহনের ভোজনাবশেষ সনাতনকে প্রদান করিলেন। শ্রীসনাতন মদনমোহনের ভোজনাবশেষ প্রাপ্ত হইয়া প্রেমে পুলকিত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যাগমণ করিলেন।

এইদিন রাত্রে শ্রীমদনমোহন শ্রীসনাতনকে বলিলেন—তুমি আমাকে মথুরা হইতে আনিয়া কেবল জল ও তুলসী দিয়া সেবা করিবে। এদিকে চৌবের স্ত্রীকে শ্রীমদনমোহন জানাইলেন তুমি আমাকে সনাতনের হস্তে সমর্পণ কর!

শ্রীল সনাতন গোস্বামী চৌবে রমণীর নিকট হইতে প্রাপ্ত এই শ্রীমদনমোহন মূর্ত্তি শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর প্রকটিত

মদন গোপাল শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থে কথিত আছে– শ্রীল অদ্বৈত প্রভু তাঁহার পিতামাতা বৈকুণ্ঠে গমন করিলে, গয়ায় বিষ্ণুপাদপদ্মে তাঁহাদের পিণ্ড প্রদান পূর্ব্বক তীর্থ যাত্রায় বহির্গত হইয়া ক্রমে ক্রমে বৃন্দাবনস্থ গোবর্দ্ধনে আসিয়া উপনীত হইলেন, গোবর্দ্ধনের শোভা দর্শন করিয়া তিনি প্রেমানন্দে উর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং লীলাস্থানাদি দর্শন পূর্ব্বক রাত্রিতে এক বটবৃক্ষের নিম্নে শয়ন করিলে স্বপ্নে নবীন নীরদ কান্তি শিখিপুচ্ছমৌলি বংশীবদন ভুবনমোহন অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া পরমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন–তুমি আমার এক অঙ্গ গোপীশ্বর শিব, জীব উদ্ধারের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছ, শোন অদ্বৈত ! দ্বাদশাদিত্যতীর্থের যমুনাতীরে শ্রীমদনমোহন নামে মহামণিময় আমার এক দিব্য মূর্ত্তি অল্প মৃত্তিকাভ্যন্তরে আচ্ছাদিত রহিয়াছে, আমার এই মূর্ত্তিকে কুব্জা সেবা করিয়াছিল, দস্যুভয়ে আমি সংগোপন হইয়াছিলাম। গ্রাম হইতে বহু লোকজন আনিয়া আমাকে উঠাইয়া সেবা প্রকাশ পূর্ব্বক জগতে কল্যাণ বিধান কর। শ্রীঅদ্বৈত স্বপ্নাদেশ পাইয়া পরমানন্দে লোকজন সহ কোঠারী কোদাল লইয়া বহু পরিশ্রমে দ্বাদশাদিত্যতীর্থ যমুনাতীর হইতে ললিত ত্রিভঙ্গ অপরূপ শ্রীমদনমোহন মূর্ত্তি উঠাইয়া বটবৃক্ষের মূলে একখানি ঝুপরি বাঁধিয়া অভিষেকাদিক্রমে শ্রীমদনমোহনকে স্থাপনা করিলেন এবং সদাচারী একজন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে সেবায় নিযুক্ত করিলেন। অনন্তর অদ্বৈত প্রভু তাঁহার উপর শ্রীমদনমোহনের সেবাভার দিয়া বৃন্দা-

বন পরিক্রমায় গমন করিলে ইত্যবসরে দুষ্ট যবনগণ সেই সংবাদ পাইয়া ঠাকুরের মহত্ত্ব নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে অদ্বৈতবটে আগমন করিবা মাত্রই শ্রীমদনমোহন ম্লেচ্ছভয়ে পুষ্পের নিম্নে গোপাল হইয়া লুকাইয়া থাকেন। এদিকে যথাসময়ে সেবক আসিয়া কুটীরে শ্রীমদনমোহনকে দেখিতে না পাইয়া হাহাকার করিয়া উঠিলেন। অনন্তর বালকগণের মুখে ম্লেচ্ছের দৌরাত্ম্যের কথা জানিতে পারিয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিতেছিল, হে প্রভু আমার অপরাধে আমার প্রতি নির্দয় হইয়া তুমি চলিয়া গিয়াছ। এইরূপ বহুপ্রকার বিলাপ করতঃ অনশনে পড়িয়া রইলেন। এদিকে সন্ধ্যা আগত প্রায় এমন সময় শ্রীঅদ্বৈত প্রভু সেবকের নিকট সর্ব্ব বৃতান্ত শ্রবণ করিয়া দুঃখিত অন্তরে সাতিশয় বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন হে প্রভো! তুমি স্বয়ং দয়া করিয়া আসিয়াছিলে, আমার অপরাধ জানিয়া আপনি পুনরায় চলিয়া গেলেন, অদ্বৈত প্রভু দুঃখে রোদন করিতে করিতে অনশনে রাত্রিকালে বৃক্ষমূলে শয়ন করিলে শ্রীমদনমোহন অদ্বৈত প্রভুকে মধুর স্বরে বলিলেন অদ্বৈত ওঠ, আমি ম্লেচ্ছ ভয়ে গোপালমূর্ত্তিতে পুষ্পের মধ্যে লুকাইয়াছিলাম। স্বপ্ন দেখিয়া অদ্বৈত প্রভু শীঘ্র মন্দিরে গিয়া পুষ্পতলে ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ অপরূপ গোপাল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আনন্দাতিশয্যে বাহ্যস্মৃতি হারাইলেন কিয়দন্তর বাহ্যস্মৃতি পাইয়া শ্রীগোপালকে ফল জল সমর্পণ করিলেন। তিনিও গোপালের অধরামৃত পাইয়া প্রভাতে যমুনাতীরে সেই বিপ্রের দেখা পাইয়া বলিলেন

তুমি সত্বর গিয়া ঠাকুর জাগাইয়া পূজা করিবে। বিপ্র বলিল প্রভু মন্দিরে তো ঠাকুর নাই, তদুত্তরে প্রভু বলিলেন বিপ্র! ঠাকুর সেবককে কোন দিন ত্যাগ করে না, যাও শীঘ্র মন্দিরে গিয়া মদনগোপাল নামে পূজা করিবে। বিপ্র শীঘ্র আসিয়া দ্বের উদ্‌ঘাটন করতঃ ঠাকুর দেখিয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন এবং মদনগোপাল নামে পূজা সম্পন্ন করিলেন। সেই হইতে শ্রীমদন-মোহন শ্রীমদনগোপাল নামে খ্যাত হইলেন। অনন্তর একদিন রাত্রে মদনগোপাল স্বপ্নে বলিলেন অদ্বৈত! আমার একটি কথা রাখ, এখানে ম্লেচ্ছের ভয় আছে, মথুরা হইতে এক চৌবে প্রাতঃকালে এখানে আসিবে তুমি, তার হস্তে আমাকে সমর্পণ কর। শ্রীঅদ্বৈত বলিল—ওহে মদনগোপাল তুমি আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব তোমাকে ছাড়িয়া আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব তখন শ্রীমদনগোপাল হাসিতে হাসিতে বলিল অদ্বৈত আমি চিরকালই তোমার বশীভূত, তুমি ভিন্ন আমার লীলা পুষ্টি হয় না, তুমি যেখানে সেখানেই আমি, তাই বলি তুমি আমার এই সিদ্ধমূর্ত্তি সমর্পণ করিয়া চৌবে ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ কর। পূর্ব্বের একটি বৃত্তান্ত তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিই, বিশাখা আমার যে চিত্রপট নির্ম্মাণ করিয়াছিল যাহা দেখিয়া শ্রীরাধিকা বিমুগ্ধ হইয়াছিল, সেই মূর্ত্তি আমার সহিত অভিন্ন, বর্ত্তমানে সেই মূর্ত্তি নিকুঞ্জ বনে আছে; তুমি গেলে নিশ্চয়ই পাইবে, এই চিত্রপট নিয়া তুমি দেশে গিয়া সেবা প্রকাশ করতঃ জীব উদ্ধার কর। স্বপ্ন দেখিয়া অদ্বৈত প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়াছিলেন, এমনি

সময়ে মথুরার চৌবে আসিয়া করযোড়ে প্রণামপূর্ব্বক বলিল প্রভো ! আপনি সর্ব্বজ্ঞ দেবাবতার শ্রীমদনগোপাল আমাকে স্বপ্নে আদেশ করিয়াছেন, আপনি কুব্জার সেবিত মূর্ত্তি প্রকট করিয়াছেন, সেইমূর্ত্তি আমাকে সমর্পণ করিয়া ধন্য করুন। শ্রীঅদ্বৈত চৌবেকে ঠাকুর সমর্পণ করিয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে সেবাকুঞ্জে গিয়া শ্রীবিশাখার অঙ্কিত চিত্রপট প্রাপ্ত হইয়া শান্তি পুরে গমন করিলেন। শ্রীল সনাতন এই শ্রীমদনগোপালের স্বপ্নাদেশ পাইয়া পরদিন মথুরায় যাইয়া চৌবের রমণীকে নিজ স্বপ্ন বৃত্তান্ত জানাইলেন, তিনি স্বপ্ন বিবরণ সনাতনকে বলিয়া শ্রীমদন মোহনকে শ্রীসনাতনের হস্তে সমর্পণ করিয়া বিলাপ সহ রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া গেলেন। শ্রীসনাতন নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া শ্রীমদনমোহনকে লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিলেন এবং অত্যুচ্চ আদিত্য টীলায় একটি কুঁড়ে ঘর প্রস্তুত করিয়া তথায় তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। শ্রীল সনাতন মদনমোহনকে মথুরা হইতে আনাবধি মাধুকরি পরিত্যাগ করিয়া মুষ্টি ভিক্ষা দ্বারা যে আটা পাইতেন তদ্দ্বারা আঙ্গা অর্থাৎ লবনবিহীন অতি মোটা অগ্নিদগ্ধ রুটি বিশেষ প্রস্তুত করিয়া তাহাই শ্রীমদনমোহনকে ভোগ দিয়া অবশেষ শ্রীসনাতন গ্রহণ করিতেন। শ্রীসনাতনের সহিত মদনমোহন কথা বলিতেন। একদিন সনাতন শ্রীমদনমোহনকে অলবন বন্য শাক অর্পণ কয়িলে শ্রীমদনমোহন কিছু লবণ চাইলেন, তখন সনাতন বলিলেন আমি উদাসী লোক তোমার

জন্য কাহার নিকট লবণ চাইব, তদুত্তরে মদনমোহন বলিলেন—আমি যদি কোন উপায়ে ব্যবস্থা করিতে পারি তাহা হইলে তোমার কোন আপত্তি আছে? সনাতন বলিলেন তুমি যদি আনিয়া দাও তবে আমি রসুই করিয়া দিব।

এদিকে অমৃত শহরের কোন সদাগর এগারখানা পণ্যদ্রব্য বোঝাই নৌকা মথুরায় বিক্রয়ের জন্য লইয়া আসিতেছিল। সেই নৌকা শ্রীবৃন্দাবন দ্বাদশ আদিত্য টীলার নিকটে আসিয়া যমুনার চড়ায় এরূপে আবদ্ধ হইল যে বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও নৌকা মুক্ত করিতে সমর্থ না হইয়া সদাগর অত্যন্ত মনঃদুঃখে পরিতাপ করিতে লাগিলেন। এই সময় রঙ্গী মদনমোহন একটি গোপ শিশুর রূপ পরিগ্রহ করিয়া যমুনার তীরবর্ত্তী জঙ্গল হইতে বলিলেন—তুসি বৃথা কেন পরিতাপ করিতেছ? এই টীলার উপরে সনাতন নামে জনৈক সাধু আছে তুমি তাহার নিকট গমন কর; ঐ সাধু অনুমতি করিলেই তোমার নৌকা মুক্ত হইবে। নতুবা শত চেষ্টাতেও কৃত কার্য্য হইতে পারিবে না। এই বলিয়া গোপ শিশু স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

তখন সদাগর শ্রীসনাতনের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিলে, সনাতন শ্রীমদনমোহনের চাতুরী অনুমান করিয়া সদাগরকে বলিলেন—ঐ কুটীর মধ্যে যে শিশু বসিয়া আছেন ইনিই তোমার নৌকা বদ্ধ করিয়াছেন, অতএব ইঁহার নিকট গিয়া তোমার দুঃখের কথা নিবেদন কর।

সদাগর টীলার উপর খড় আচ্ছাদিত একটি কুটীরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বের সেই গোপশিশুটিকে কুটী মধ্যে দর্শন করিয়া কাতরে নিবেদন করতঃ বলিতে লাগিলেন— হে প্রভো! তুমি যে উদ্দেশ্যে আমার নৌকা বদ্ধ করিয়াছ, তাহার মর্ম্ম আমি অবগত হইয়াছি। তাই এইবার মথুরায় যাইয়া যাহাকিছু লাভ হইবে তাহার সমস্তই তোমার সেবায় অর্পণ করিব। এই কথা বলা মাত্রই লোক আসিয়া সংবাদ দিল যে সমস্ত নৌকা মুক্ত হইয়াছে।

তখন সদাগর পণ্যদ্রব্য মথুরায় উপস্থিত করা মাত্রই তৎক্ষণাৎ বহুগুণ লাভে সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় হইয়া গেল। ভাগ্যবান সদাগর সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা বৃন্দাবন শ্রীমদনমোহনের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ এবং যাবতীয় সেবার সুব্যবস্থা করিয়া মহাজন নামের প্রকৃত গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। ঐ মন্দিরের পশ্চিম দিকের উচ্চস্থানই দ্বাদশাদিত্য টীলা, ঐ স্থানে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রহেলীক্রমে দিল্লীশ্বর আকবর বাদশাহকে শ্রীব্রজভূমির অতুল সম্পদের কিয়দংশ দর্শন করাইয়াছিলেন। দ্বাদশাদিত্যের এই টীলার উপরই শ্রীসনাতন গোস্বামীর প্রাণসর্ব্বস্ব শ্রীমদনমোহন জীউর প্রাচীন মন্দির বিরাজমান। কালাপাহাড়ের শ্রীবৃন্দাবনে ঠাকুর মন্দিরে উৎপাত করিবার সম্ভাবনা মনে করিয়া পূর্ব্বেই জয়পুরের রাজা ভগবৎ প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া সমস্ত ঠাকুর গাড়ীযোগে আপনার রাজধানীতে আনাইতেছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে রাজপুতনার করলী নামক স্থানে

শ্রীমদনমোহনের গাড়ী অচল হওয়ায় বহু চেষ্টা সত্ত্বেও অগ্রে চালাইতে অক্ষম হইয়া সকলেই শ্রীমদনমোহনের অভিপ্রায় অবগত হইলেন। সেই অবধি জয়পুর রাজ করলীতে মন্দির প্রতিষ্ঠাক্রমে শ্রীমদনমোহনের সেবাকার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন। পরে দৈব প্রেরণায় সেবকবৃন্দের প্রচেষ্টায় প্রাচীন মন্দিরের দক্ষিণ দিকে নূতন মন্দিরে শ্রীমদনমোহন জীউর বিজয় মূর্ত্তি বিরাজমান হইয়াছেন।

এদিকে পুরীর নৃপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্রের পুত্র পুরুষোত্তমদেব পরম মনোজ্ঞ শ্রীরাধা ও শ্রীললিতা জীউর মূর্ত্তি শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেন, তন্মধ্যে শ্রীরাধিকার মূর্ত্তি শ্রীমদনমোহনের বামপার্শ্বে এবং শ্রীললিতার মূর্ত্তি শ্রীমদমমোহনের দক্ষিণভাগে শোভিত হইলেন।

এই নূতন মন্দিরের ব্যয়ভার শ্রীনন্দলাল বসু মহোদয় গ্রহণ করিয়া বাঙালীর প্রকৃত গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। প্রাচীন মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীআদিত্য টীলার নিকট শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর সমাজ বিরাজমান এবং প্রাচীন মন্দিরের পূর্ব্ব ভাগের কিছু বামভাগে শ্রীঅদ্বৈতবট অবস্থিত। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া এই স্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্রেমাকর্ষণে এই স্থান হইতে শ্রীমদনগোপাল জীউ প্রকট হইয়াছিলেন এবং সেবাকুঞ্জ হইতে শ্রীবিশাখা অঙ্কিত চিত্রপট লইয়া স্বদেশে যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। এইস্থানে শ্রীসীতাঠাকুরাণী ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু এবং শ্রীরাধামদনগোপাল জীউ বিরাজমান।

শ্রীশ্রীগোপালজীউ, নামান্তর সাক্ষী গোপাল

শ্রীগোবিন্দ মন্দিরের উত্তর পশ্চিম ভাগে শ্রীগোপাল-জীউর মন্দির অবস্থিত। ছোট বিপ্র ও বড় বিপ্রের প্রেমে বশীভূত হইয়া শ্রীগোপালজীউ এই স্থান হইতে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সাক্ষী দিতে গমন করিয়া বর্ত্তমান সময়ে শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রের বার মাইল দূরবর্ত্তী শ্রীসত্যবাদী পুরে বিরাজ করিতেছেন। কথিত আছে উড়িষ্যাবাসী দুই বিপ্র তীর্থ ভ্রমণে আসিয়াছিলেন, বড়বিপ্র ছিলেন বৃদ্ধ, ছোট বিপ্র ছিলেন যুবা, ছোট বিপ্র সর্ব্বদা সেবা শুশ্রূষা দ্বারা বড় বিপ্রকে পরিতুষ্ট করিতেন। সেবায় বড় বিপ্র সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে গোপাল জীউকে সাক্ষী করিয়া ছোট বিপ্রের সহিত স্বীয় কন্যা বিবাহ দিতে অঙ্গীকার করেন। ছোট বিপ্র কিন্তু বড় বিপ্রের ন্যায় কুলীন ঘর ছিল না, তাই দেশে ফিরিয়া আসিলে বড় বিপ্রের আত্মীয়-স্বজনগণ প্রতিশ্রুত বিবাহে সম্মত হইল না। বড় বিপ্রও সমস্যায় পড়িলেন, ছোট বিপ্র তখন শ্রীগোপালের সাক্ষ্যের কথা বলিলেন। আত্মীয় স্বজন তাহাতে বলিলেন—আচ্ছা, যদি শ্রীগোপালদেব এখানে আসিয়া সাক্ষ্য দেন, তাহা হইলে কন্যাদান করা হইবে। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন বিগ্রহরূপী গোপালের আগমন তো সম্ভব নয়। যাহা হউক, ছোট বিপ্র শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীগোপাল দেবের নিকট কাঁদিয়া কাটিয়া উড়িষ্যায় যাইয়া সাক্ষ্য দানের নিমিত্ত প্রার্থনা জানাইলেন। তাঁহার ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া বিগ্রহরূপী গোপাল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া যথাস্থানে যথা

সময়ে সাক্ষ্য দিলেন। বিবাহও হইয়া গেল। সেই অবধি শ্রীগোপালজীউ উড়িষ্যার পুরুষোত্তমক্ষেত্রে সত্যবাদী গ্রামে থাকিয়া গেলেন। এই হইতে তাঁহার নাম সাক্ষীগোপাল।

এই শ্রীগোপালদেব শ্রীবজ্রনাভের নির্ম্মিত। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীগোপালজীউর ভগ্ন মন্দিরটি শ্রীগোপালদেবের সাক্ষ্য-রূপে সকলের দৃষ্টিগোচর হইতেছেন। শ্রীগোপালদেবের মন্দি-রের সম্মুখ ভাগের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে প্রাচীন শ্রীহনুমানজী মন্দির শোভা পাইতেছেন। ইনি সিংহপৌরী শ্রীহনুমানজী বলিয়া বিখ্যাত।

শ্রীশ্রীরাধারমণজীউ— শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া প্রকট হইয়াছিলেন। ভট্ট গোস্বামীর নিকট শ্রীশালগ্রাম শিলারূপে পূজা গ্রহণ করিতেন কিন্তু ভট্ট গোস্বামীর প্রেমে মুগ্ধচিত্ত হইয়া সেই শালগ্রাম শিলা হইতেই অপরূপ ললিত ত্রিভঙ্গরূপে প্রকট হইয়াছিলেন।

কথিত আছে—শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামী পিতৃ-বিয়োগের পর শ্রীনীলাচল ধামে আসিয়া শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহা-প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিলে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ভট্ট গোস্বামীকে শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে আদেশ করেন। আসাকালীন গোস্বামীপাদ এক মূর্ত্তি শালগ্রাম শিলা সঙ্গে লইয়া আসেন এবং তাঁহার সেবা করিতেন। কোন সময়ে জনৈক সমৃদ্ধিশালী ভক্ত নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কার ও ভোজ্য সামগ্রী সহ শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া

শ্রীশ্রীরাধারমণ জীউ।

গোপালভট্ট প্রিয় পূজ্যশাল-
গ্রামোদ্ভবং শ্যামতনুং সুশোভম্।
ত্রিভঙ্গরূপং কলবেণুবক্ত্রং
শ্রীশ্রীলরাধারমণং নমামি ।।

শ্রীবৃন্দাবনস্থ সমস্ত শ্রীবিগ্রহকে বস্ত্রালঙ্কার ও ভোজ্য সামগ্রী ভেট প্রদান করেন। শ্রীভট্ট গোস্বামীর শ্রীশালগ্রামকেও সেই প্রকার ভেট প্রদান করেন, তাহাতে গোঁসাইজীর মনে হইল যদি তাঁহার শ্রীশালগ্রাম হস্তচরণাদি অবয়ব বিশিষ্ট হইতেন তাহা হইলে এই সকল বস্ত্রালঙ্কার ধারণ করাইলে কতই শোভা হইত। গোস্বামী পাদের মনে এই বাসনা উদয় হওয়া মাত্রই "ভক্তবাঞ্ছা পূর্ত্তি বিনা নাহি অন্যকৃত্য" শ্রীভগবান ভক্তের বাসনা অনুরূপ শ্রীশালগ্রাম হইতে অপরূপ ললিত ত্রিভঙ্গরূপে প্রকট হইলেন। পরদিবস প্রত্যুষে উঠিয়া গোস্বামীপাদ দেখেন সত্য সত্যই ভক্তবৎসল ভগবান তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছেন। শ্রীশালগ্রাম দ্বিভুজ মুরলীধর ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম অপরূপ রূপের ছটায় বৃন্দাবন ভূমিকে সমুদ্ভাষিত করিয়া শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। অদ্যাবধি শ্রীশ্রীরাধা-রমণ জীউর পৃষ্টদেশে সেই শ্রীশালগ্রাম শিলা চিহ্ন বিরাজ করিতেছেন।

এই মন্দির নিধুবনের সংলগ্ন শ্রীগোপীনাথ মন্দিরের পশ্চাৎ ভাগে অবস্থিত। কালাপাহাড়ের উৎপাত কালে শ্রীরাধারমণজীউ স্থানান্তরিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু মন্দিরের সেবকবৃন্দের বলবতী অনিচ্ছায় তাহা বিফল হইয়াছিল। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে শ্রীরাধারমণ-জীউ দর্শন পাইতেছি ইহা কেবল সেবাইৎ বৃন্দের প্রসাদেই জানিতে হইবে, নতুবা জয়পুর পত্তনেই বিরাজ করিতেন।

এই মন্দিরের পশ্চাৎ ভাগে শ্রীরাধারমণ জীউর প্রাকট্য স্থলটি প্রস্তর ফলকে খচিত হইয়া নিত্য পূজিত হইতেছেন এবং শ্রীরাধারমণ জীউর প্রকট তিথিও এই মন্দিরে বিশেষ সমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়া থাকেন। এই মন্দিরের শ্রীজন্মাষ্টমীর তিথির অভিষেক বিশেষ আকর্ষণীয়। মন্দিরের পশ্চাৎ ভাগে শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামীর সমাজ বিরাজমান দর্শনীয়।

শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ ও শ্রীগোকুলানন্দজীউ—

শ্রীপাদ লোকনাথ গোস্বামীর প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীরাধা বিনোদদেব উমরায়ের শ্রীকিশোরী কুণ্ড হইতে প্রকট হইয়াছিলেন। শ্রীরাধারমণ মন্দিরের পশ্চিম উত্তর কোনস্থিত মন্দিরে শ্রীরাধাবিনোদ জীউর বিজয় মূর্ত্তি শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। এই মন্দিরে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সেবিত শ্রীশ্রীরাধা গোকুলানন্দ জীউও বিরাজ করিতেছেন এবং শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু প্রদত্ত শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামীর সেবিত শ্রীশ্রীরাধা গিরিধারী জিউ বিরাজমান আছেন। এই মন্দিরের বাম পার্শ্বে শ্রীপাদ লোকনাথ গোস্বামীর সমাজ দর্শনীয় এবং শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সমাজ ও শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের বৈঠক দর্শনীয়।

শ্রীশ্রীরাধামাধবজীউ—বৈষ্ণব জগতের চির স্মরণীয় তথা কলিযুগ পাবনাবতার স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আস্বাদ্য শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীপাদ জয়দেব

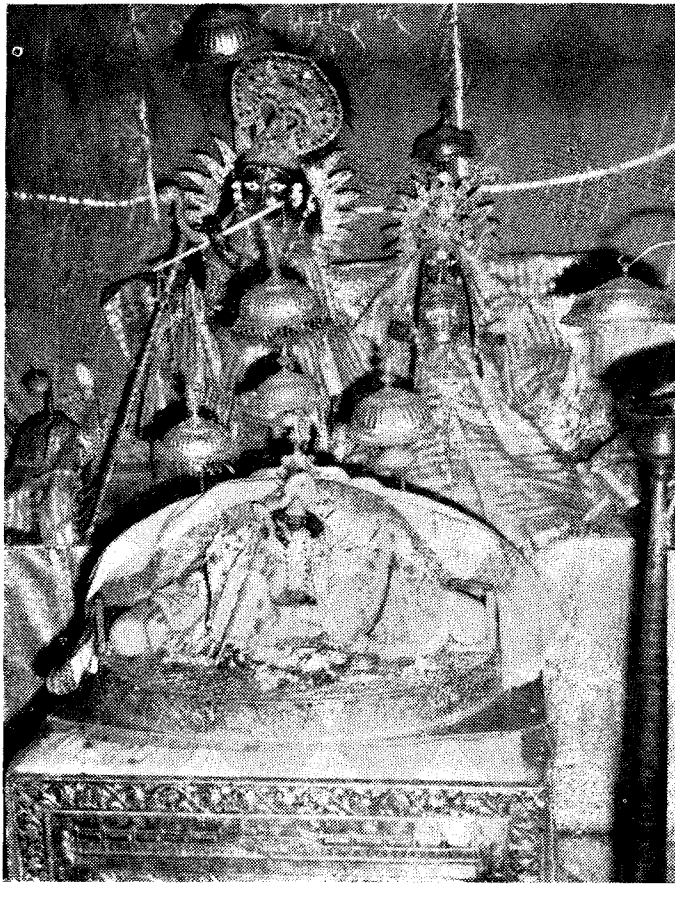

শ্রী শ্রীরাধা দামোদর জীউ।

শ্রীজীব প্রকটীকৃতং রাধালিঙ্গিত বিগ্রহম্ ।
রাধাদামোদরং বন্দে শ্রীজীবজীবিতেশ্বরম্ ।।

গোস্বামীর প্রেমে প্রীত হইয়া শ্রীরাধামাধব তাঁহার সেবা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। এই মন্দির শ্রীগোকুলানন্দ মন্দিরের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। এই মন্দিরে শ্রীরাধামাধবের বিজয়মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। এই মন্দিরের ঈশানকোণে শ্রীযুগল কিশোরের উচ্চ মন্দির চূড়া বিহীন অবস্থায় দর্শকের নয়নগোচর হইতেছেন।

শ্রীশ্রীরাধাদামোদরজীউ—শ্রীজীব গোস্বামিপাদের সেবিত শ্রীবিগ্রহ। শৃঙ্গারবটের দক্ষিণ পূর্ব্বকোণে অবস্থিত মন্দিরে শ্রীরাধাদামোদর জীউর বিজয়মূর্ত্তি শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিহ্ন যুক্ত যে গোবর্দ্ধন শিলা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা এই মন্দিরে নিত্য পূজিত হইতেছেন। কথিত আছে—শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী প্রতিদিন শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পরিক্রমা করিতেন। বৃদ্ধাবস্থায় পরিক্রমায় পরিশ্রম অনুভব করিয়া শ্রীরাধামদনমোহন গোপবালকের বেশে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া গোস্বামিপাদের অঙ্গের স্বেদ মোছাইয়া দিয়া সাশ্রু নয়নে মধুর স্বরে বলিলেন—বাবা তুমি তো বহু বৃদ্ধ হইয়াছ, এখন পরিশ্রম করিবার সমর্থ নাই, সুতরাং আমার একটি কথা শোন। গোঁসাইজী বলিলেন বল? তাঁহার কথা শুনিতেই গোপশিশু শ্রীমদনমোহন গোবর্দ্ধনের উপর হইতে স্বীয় চরণ চিহ্ন যুক্ত একখানি শিলা আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন—বাবা তুমি আজ থেকে এই শিলা পরিক্রমা করিবে

তাহাতেই তোমার গোবর্দ্ধন পরিক্রমা সিদ্ধ হইবে। এই শিলাখণ্ড উঠাইয়া শ্রীসনাতনের কুটীর সম্মুখে রাখিয়া বালক অন্তর্দ্ধান হইল। তখন শ্রীসনাতন বালককে না দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল ভাবে রোদন করিতে থাকিলে সেই কালে শ্রীমদনমোহন অত্যন্ত স্নেহ পরবশ হইয়া অদৃশ্যরূপে নিজ পরিচয় প্রদান করিলে শ্রীসনাতন অশ্রুনীরে বক্ষঃ প্লাবিত করিতে করিতে নানা প্রকার প্রলাপ করতঃ অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করিলেন এবং প্রতিদিন শ্রীচরণ চিহ্নিত শিলা পূজা ও পরিক্রমা করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে এই শ্রীচরণ চিহ্নিত শিলা এই মন্দিরে বিরাজমান। শ্রীজন্মাষ্টমীর দিনে এই শিলা অভিষেক উপলক্ষ্যে সর্ব্বসাধারণকে দর্শন করাইবার জন্য বাহির করা হয়। বর্ত্তমানে এই মন্দিরে শ্রীপাদ ভূগর্ভ গোস্বামীর সেবিত শ্রীবিগ্রহ শ্রীরাধা ছলচিকনীয়া এবং শ্রীজয়দেব গোস্বামীর সেবিত শ্রীরাধামাধবজীউ, তথা শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সেবিত শ্রীবিগ্রহ শ্রীরাধাবৃন্দাবন চন্দ্র বিরাজ করিতেছেন। এই মন্দিরের পশ্চাৎ ভাগের দক্ষিণে শ্রীপাদ জীব গোস্বামী ও শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সমাজ অবস্থিত এবং পশ্চাৎ ভাগের উত্তর দিশায় শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী এবং শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর সমাধি মন্দির অবস্থিত। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর সমাধি মন্দিরের সম্মুখে শ্রীরূপ গোস্বামীর একটি বৈঠক বিরাজমান। এইস্থানে আরও অনেক ভজনানন্দী মহাপুরুষের সমাধি দর্শনীয়।

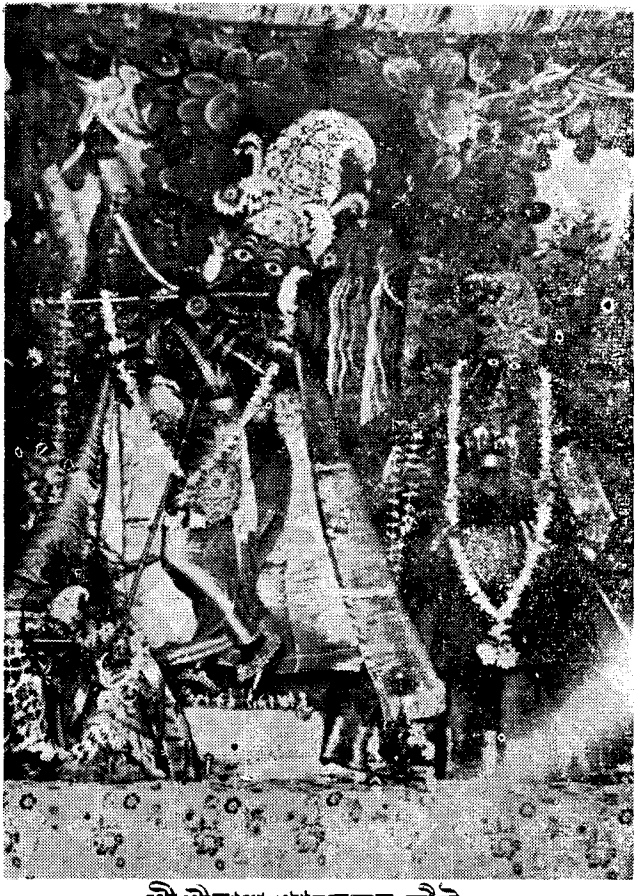

শ্রীশ্রীরাধা শ্যামসুন্দর জীউ।

শ্যামানন্দ হৃদানন্দং বৃন্দারণ্যপুরন্দরম্।
রাধাভূষিতবামাঙ্গং নমামি শ্যামসুন্দরম্ ॥

শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দরজীউ শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর প্রেমে বশীভূত হইয়া অপরূপ ললিত ত্রিভঙ্গরূপে প্রকটিত হইয়া তাঁহার সেবা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। এই মন্দির শ্রীদামোদর মন্দিরের দক্ষিণ ভাগে বর্ত্তমান লুই বাজারে অবস্থিত। শ্রীরাধা শ্যামসুন্দর সত্যই তাঁহার সুন্দরতায় শ্রীবৃন্দাবনকে আলোকিত করিতেছেন এবং দর্শকমাত্রকেই মুগ্ধ করেন। মন্দিরের সেবা পরিপাটী সুন্দরতাকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গারাদির পরিপাটীও দর্শকের চিত্তে চমৎকারিতা উৎপাদন করেন।

বিশেষতঃ অক্ষয় তৃতীয়ায় শ্রীশ্যামসুন্দরের চন্দন শিঙ্গার যাঁহারা একবার দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা মোহনিয়া শ্যাম-সুন্দরের মনোমুগ্ধকর রূপের কথা কখনও ভুলিতে পারিবেন না। সেই রূপের দর্শনে ভগবৎ ভক্তগণের হৃদয় অপার্থিব আনন্দে ভরপুর হইয়া যায়। এই মন্দিরের সন্নিকটেই শ্রীনিধুবন অবস্থিত। কথিত আছে—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু নিধুবন ঝাড়ু করিবার কালে শ্রীমতী বৃষভানু নন্দিনীর নূপুর প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই মন্দিরের সম্মুখে সমাজ বাড়ীতে নিধুবনের যে স্থানে নূপুর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই স্থানটি প্রস্তর ফলকে খচিত হইয়া নিত্য পুজিত হইতেছেন। ইহার পার্শ্বে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সমাজ অবস্থিত এবং ভজনানন্দী বহু বৈষ্ণবের সমাজ বিরাজমান দর্শনীয়। শ্রীশ্যাম

সুন্দর মন্দিরের পশ্চাৎ ভাগে শ্রীহরিরাম ব্যাসের ভজনস্থল শ্রীকিশোর বন অবস্থিত।

শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীউ— শ্রীপাদ হরিবংশ গোস্বামীর প্রতি কৃপা করিয়া শ্রীনিকুঞ্জবন নামান্তর সেবাকুঞ্জ হইতে প্রকট হইয়াছিলেন। এই মন্দির নূতন সীতানাথ মন্দিরের নৈঋত কোণে অবস্থিত। কালাপাহাড়ের উৎপাতকালে শ্রীবিগ্রহ স্থানান্তরিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছিল কিন্তু মন্দিরের সেবাইত বৃন্দের বলবতী অনিচ্ছায় তাহা সফল হয় নাই। শ্রীরাধা-বল্লভের সেবাইত বৃন্দকে রাধাবল্লভী গোঁসাই বলিয়া উল্লেখ করা হয়। শ্রীরাধাবল্লভের সেবা পরিপাটী সুন্দর। পরম প্রীতিভরে শ্রীরাধাবল্লভের সেবা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছেন। এই মন্দিরের উত্তরে শ্রীযুগল বিহারীর উচ্চ মন্দির চূড়া বিহীন অবস্থায় বিরাজ করিতেছেন। শ্রীরাধাবল্লভ মন্দিরের পার্শ্বে শ্রীপাদ হরিবংশ গোস্বামীর সমাজ অবস্থিত।

শ্রীশ্রীবঙ্কবিহারীজীউ— শ্রীপাদ হরিদাস স্বামীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া শ্রীবঙ্কবিহারী নিধুবন হইতে প্রকট হইয়াছিলেন। শ্রীহরিদাস স্বামী বিষয় ত্যাগী উদাসী বৈষ্ণব। ইনি বৃন্দাবনে আগমন করিয়া নিধুবনে অবস্থান করতঃ ভজন করিতেন। শ্রীবঙ্কবিহারী স্বামী হরিদাসের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আদেশ করিলেন যে আমি এই স্থানের মৃত্তিকা গর্ভে আবরিত আছি, তুমি আমাকে উত্তোলন করিয়া সেবা কর। শ্রীহরিদাস স্বামী

শ্রী শ্রী রাধাবল্লবিহারি জীউ।

মুরলীবাদনানন্দং রাধিকাচিত্তচন্দনম্ ।
কুঞ্জবিহারিণং নৌমি প্রতিকুঞ্জবিহারিণম্ ।।

মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে মৃত্তিকা গর্ভে মণিময় ভুবনমোহন অপরূপ শ্রীবঙ্কবিহারী জীউকে প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। এই মন্দির শ্রীমদনমোহন মন্দিরের পূর্ব্ব দিশায় অবস্থিত। মন্দিরের সেবা পরিপাটী সত্যই সুন্দর। পরম প্রীতির সহিত শ্রীবিহারীজীউর সেবা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। সর্ব্বদার জন্য শ্রীবিহারীজীউর চরণ দর্শন সম্ভব হয় না। কেবলমাত্র বৈশাখমাসের শুক্লা তৃতীয়ায় যুগল চরণ সর্ব্বসাধারণের দর্শন হইয়া থাকে। শ্রীবিহারী জীউর দর্শনে বড়ই কৌতুক আছে. শ্রীবিহারী জীউর সম্মুখের কাপড় পর্দ্দা বারংবার খুলিতে ও বন্ধ করিতে হয়।

শ্রীশ্রীগোপীশ্বর বা গোপেশ্বর মহাদেব—শ্রীবংশীবটের নৈঋতকোণে শ্রীগোপেশ্বর মহাদেব বাবা শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন, বংশীবট শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার প্রসিদ্ধ স্থল। শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার অভিনয়ে এই স্থানে দাঁড়াইয়া সুললিত মোহন বংশীধ্বনি করিয়া ব্রজসুন্দরীগণকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। লীলা পুরুষোত্তমের ব্রজলীলার এমনই আকর্ষণ যে দেবাদিদেব মহাদেবও এই লীলায় বিভোলা, তিনিও গোপী অনুগত্যে প্রেম ময়কে পাইবার লোভে গোপীরূপে প্রেমময়ের প্রেমরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। মহাদেব মহারাসে গোপীরূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত হইলে রাসেশ্বর তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া পরিহাস পূর্ব্বক গোপীশ্বর বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, এইহেতু তিনি

এইস্থানে গোপীশ্বর নামেই অভিহিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ ব্রজ গোপীগণ নিজ অভীষ্ট কামনায় শ্রীমহাদেবকে লিঙ্গরূপে স্থাপন করিয়া পূজা করিয়াছিলেন তদবধি ইনি গোপীশ্বর নামেই পূজিত হইতেছেন। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের নিকট ইনি গোপেশ্বর বলিয়া পরিচিত। শ্রীগোপীশ্বর মহাদেব দর্শক মাত্রেরই অবশ্যই দর্শনীয়। এই মন্দিরের সন্নিকটে সপ্ত সমুদ্র কূপ এবং নৈঋত কোণে শ্রীবলদেবজীউ দর্শনীয়।

শ্রীশ্রীবনখণ্ডী মহাদেব—শ্রীবঙ্কবিহারী যাইবার পথে সদর রাস্তায় ত্রিমোনীর উপরে শ্রীবনখণ্ডী মহাদেব মন্দির অবস্থিত। কথিত আছে—শ্রীসনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনে বাস করিবার কালে প্রত্যহ শ্রীগোপীশ্বর দর্শনে যাইতেন। কিন্তু তখন শ্রীবৃন্দাবন বন জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। এই হেতু শ্রীসনাতন প্রভুকে মধ্যে মধ্যে বহু ক্লেশ ভোগ করিতে হইত। শ্রীগোপীশ্বর জীউ শ্রীসনাতনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া একদিন স্বপ্নে আদেশ করলেন, সনাতন তোমাকে আমার জন্য আর অতদূর আসিতে হইবে না। আমি এখন তোমার নিকটে বনখণ্ডী নামে প্রকট হইলাম। অতএব তুমি প্রত্যহ এইস্থানে আমাকে দর্শন করিবে। সেই অবধি শ্রীসনাতন প্রভু প্রত্যহ এই স্থানে আসিয়া শ্রীবনখণ্ডী মহাদেব দর্শন করিতেন।

পিসিমার শ্রীনিতাইগৌর—বীরভূম জেলার অন্তর্গত ঘোড়াডাঙ্গা পারুলিয়া এবং কালীপুর কড্যা গ্রামের মধ্যস্থলে

একটি মনোরম উপবন ছিল। সেই উপবনের নিকটবর্ত্তী গ্রামস্থ লোকেরা গাভী বৎসাদি চারণ করিত। ক্ষেপা নামক জনৈক গোয়ালা গাভী চরাইতে চরাইতে একদিন দেখিল তাহার গোষ্ঠের একটি গাভী সেই উপবনের মধ্যস্থ একটি স্থানে দাঁড়াইয়া ভূমির উপর দুগ্ধ দান করিতেছে, ইহাতে তাঁহার মনে সন্দেহ হইলে তিনি স্থানটির উপর লক্ষ্য রাখিল। প্রতিদিন গাভীটি ঐরূপে দুগ্ধ দান করিতে থাকিলে ক্রমে ক্রমে কথাটি গ্রামে প্রকাশ হইয়া যায়। তখন ক্ষেপা গ্রামের লোক সাহায্যে স্থানটি খনন করিতে করিতে দেখিত পাইল একখানি পুরাতন কাষ্ঠ সিংহাসনোপরি শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ প্রভুদ্বয়ের দারুময় বালবিগ্রহ, শ্রীরাধাগোপীনাথ ও শ্রীধর শালগ্রাম বিগ্রহ চতুষ্টয় বিদ্যমান। শ্রীগৌর নিতাই শ্রীবিগ্রহের বহুদিন মৃত্তিকা গর্ভে প্রোথিত থাকায় অঙ্গরাগের কোন চিহ্ন ছিল না। কারণ পূর্ব্বে এই উপবনস্থ গ্রামের নিকট শ্রীমুরারী গুপ্তের বংশধরগণ বাস করিতেন, কিন্তু দৈবে মহা-মারীতে গ্রাম উৎসন্ন প্রায় হইলে সেই কালে তাঁহারা এই মহামারীতে কালকবলিত হওয়ায় শ্রীবিগ্রহ পতিত ভগ্ন মন্দিরের অভ্যন্তরে মৃত্তিকা প্রোথিত হইয়াছিলেন। অঙ্গরাগশূন্য এই শ্রীবিগ্রহকে ক্ষেপা ভক্ত গণের পরামর্শে শিউড়িতে আনয়ন করিলেন এবং ভক্তগণের ও ক্ষেপার ইচ্ছায় শ্রীবিগ্রহের অঙ্গ রাগাদি সংস্কার করিতে গিয়া দেখা গেল শ্রীগৌর নিতাই শ্রীবিগ্রহের শ্রীপাদপীঠের নিম্নে দাস মুরারী গুপ্ত এই নাম

খোদিত ছিল। অনন্তর অঙ্গরাগাদি কার্য্য সম্পন্ন করতঃ মহাসমারোহে অভিষেকাদিকার্য্য সম্পন্ন হইল। শ্রীগৌর নিতাইয়ের বিগ্রহদ্বয় বাৎসল্য রসের উপযোগী বালমূর্ত্তি, ভ্রাতৃদ্বয় ত্রিভঙ্গ ভাবে দাঁড়াইয়া শ্রীকর কমল ঈষৎ উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া যেন জগজ্জীবকে প্রেমদান করিতেছেন। শ্রীবদন চন্দ্রমার প্রতি কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিলে মনে হয় সেই কনক কেতকী সদৃশ সুন্দর ঢল ঢল নয়নে যেন নীরধারা বহিবার উপক্রম হইতেছে, জগদ্বাসীর দুঃখে যেন প্রভুর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে। করুণাপারাবার প্রভু শিউরি গ্রামস্থ ভক্তগণের সেবা গ্রহণে তাঁহাদিগকে আনন্দ প্রদান করিতেছিলেন, অনন্তর তাঁহার ভক্তের দুঃখ অপনোদনের নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া লুই বাজারের বনখণ্ডি মহল্লায় বর্ত্তমান শ্রীমন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। এখানে আসিয়াও নিত্য নূতন লীলা রহস্য প্রকাশ করিয়া ভক্তগণকে আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত করিতেছেন। পিসিমা গোস্বামিনীর সেবিত শ্রীনিতাই গৌর বিগ্রহ ৮।৯ বৎসর বালকের ন্যায় অতি সুন্দর বাৎসল্য বিভাবিত মূর্ত্তি। পিসিমা গৌর নিতাইকে স্নেহভরে পুত্রবৎ প্রতি পালন করিতেন, প্রভুদ্বয়ও তাঁহাকে মাতৃবৎ মান্য করিতেন ও ভালবাসিতেন। বাৎসল্য বিভাবিত এই শ্রীবিগ্রহদ্বয় অবশ্য দর্শনীয়। এই মন্দির বনখণ্ডী মহাদেব জীউর মন্দিরের উত্তর ভাগে অবস্থিত শ্রীমুরারী গুপ্তের প্রতিষ্ঠিত শ্রীপিসিমা মাতা গোস্বামিনীর শ্রীনিতাই গৌর মন্দির অবশ্য দর্শনীয়।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু—ইমলিতলায় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি দর্শনীয়। শ্রীমদনমোহন পুরাতন মন্দিরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দর্শনীয় শ্রীমূর্ত্তি বিরাজমান। শ্রীগোবিন্দ দেবের প্রাচীন মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু দর্শনীয়। শিঙ্গারবটে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মূর্ত্তি দর্শনীয়। ধীর সমীর শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কুঞ্জে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাটুয়া মূর্ত্তি দর্শনীয়। পাথরপুরা শ্রীশ্রীকাঙালী মহাপ্রভু দর্শনীয়। সারস্বত গৌড়ীয়মঠ ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয়মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মূর্ত্তি দর্শনীয়। শ্রীরাধারমণ মন্দিরের পশ্চাৎভাগে শ্রীশ্রীষড়ভুজ মহাপ্রভু দর্শনীয়। মহাত্মা শিশির বাবুর প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ বাজারে শ্রীশ্রীঅমিয় নিমাই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু পতিত পাবন নাম সার্থক অভিলাষে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে মোহনিয়া নাটুয়া মূর্ত্তি আজানুলম্বিত বাহু যুগল প্রসার পূর্ব্বক শ্রীমন্দির সমুজ্জ্বল করিয়া সকলের নয়ন গোচর হইতেছেন। ব্রহ্মকুণ্ড তীরে শ্রীশ্রীনিতাই গৌর সীতানাথ মন্দির দর্শনীয়। কেশী-ঘাটে শ্রীকুঞ্জদাস গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীপ্রাণগৌর নিত্যানন্দ প্রভুর অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শনীয়। বনখণ্ডীতে বাৎসল্যরসের সাধিকা পিসিমার নিতাই গৌর দর্শনীয় উল্লিখিত স্থানের শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বিশেষ প্রসিদ্ধ।

শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজী নামান্তর শেঠের মন্দির—

প্রাচীন গোবিন্দ মন্দিরের ঈশানে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিশায় এই মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের বিশালতা দর্শকের চিত্ত আকৃষ্ট

করে। মন্দিরের প্রাচীর সত্য সত্যই দূর্গের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। মন্দিরের সোনার তালগাছটি দর্শকের মনে বিস্ময় জাগাইয়া দেয়। লক্ষ্মীচাঁদ শেঠের ভ্রাতা শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস ও গোবিন্দ দাস এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। শ্রীরঙ্গনাথজীর বহু চিত্তাকর্ষক লীলাদির অনুষ্ঠান প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে বিশেষ কয়টির নামোল্লেখ করা হইতেছে—পৌষী শুক্লা একাদশী হইতে মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমী পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠোৎসব মেলা। চৈত্র কৃষ্ণা দ্বিতীয়া হইতে দ্বাদশী পর্য্যন্ত রথোৎসব মেলা। এই রথ পর্ব্বোপলক্ষ্যে শ্রীরঙ্গনাথ বর্হিদেশে বিজয় করিয়া সকল দর্শককে দর্শনদানে কৃতার্থ করেন। এই মন্দিরের গড়ের মধ্যে শ্রীগজরাজ কুণ্ডে শ্রাবণী পূর্ণিমায় শ্রীগজেন্দ্র মোক্ষণ লীলার অভিনয় হইয়া থাকে

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রজীউ নামান্তর লালাবাবুর মন্দির—

এই মন্দির ব্রহ্মকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। কলিকাতার প্রখ্যাত জমিদার লালাবাবু এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। লালাবাবু প্রাক্তন সংস্কার বশতঃ কোন দৈব প্রেরণায় উদ্বেলিত হইয়া সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীরাধা কৃষ্ণচন্দ্র জীউর মন্দির নির্ম্মাণ ও যাবতীয় সেবার সুবন্দোবস্ত করিয়া গোবর্দ্ধনে আসিয়া শ্রীভগবৎ ভজনানন্দে নিবিষ্ট হইয়া যান। মন্দিরের সেবা সৌষ্ঠব বড়ই মধুর। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দর্শক মাত্রকেই মুগ্ধ করেন। এই মন্দিরের সদর দরজার বামদিকে লালাবাবুর সমাজ অবস্থিত।

শ্রীশ্রীগোপালজীউ নামান্তর ব্রহ্মচারীর মন্দির—

এই মন্দির শ্রীগোপেশ্বর মহাদেবের অতি সন্নিকটে একই রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত। কথিত আছে ব্রহ্মচারী শ্রীগিরিধারী দাসজীর মনো অভিলাষ প্রপূর্ত্তির নিমিত্ত গোয়ালিয়ারের রাজা এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া শ্রীগোপালজীউকে প্রতিষ্ঠা করতঃ সেবাদির সুব্যবস্থা করিয়া প্রকৃত নরপতি নাম সার্থক করিয়াছেন। মন্দিরের বিশালতা মনকে আকৃষ্ট করে। সম্প্রতি এই মন্দিরের পূর্ব্বে এবং লালাবাবু মন্দিরের সংলগ্ন **গোদাবিহার** নামক একটি নূতন মন্দির নির্ম্মাণ হইয়াছে। ভারতীয় সমস্ত দেব-দেবী একত্র সমাবেশ বশতঃ এই মন্দির সর্ব্বপ্রকার দর্শকের চিত্তে চমৎকারিতা উৎপাদন করিবে। ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য সর্ব্ব সম্প্রদায়ের আচার্য্যবর্গ এই মন্দিরে যথাযোগ্য আসন পাইয়াছেন এবং সমস্ত দেবদেবীর এইরূপ একত্র সম্মিলন মন্দিরের অপূর্ব্বতা ও উৎকর্ষতাকে অনেক বাড়াইয়াছেন।

শাহাজী মন্দির—এই মন্দির নিধুবনের নিকটতম স্থানে অবস্থিত। মন্দিরের শ্রীবিগ্রহ শ্রীরাধারমণজীউ নামেই পরিচিত। লক্ষ্ণৌ নিবাসী শ্রীকুন্দনলালজী এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া শ্রীরাধারমণজীউকে প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবার সর্ব্ব প্রকার সুব্যবস্থা করিয়াছেন। মন্দিরের সেবা পরিপাটী সুন্দর। এই মন্দিরের মাঘী শুক্লা পঞ্চমীর বাসন্তী কামরা দর্শকের চিত্তে বিস্ময় জাগায়। শ্বেত প্রস্তরের খাম্বা সমূহ ভারতীয় শিল্প

নৈপুণ্যতার দ্যোতক। এই মন্দিরের সন্নিকটে শ্রীমীরাবাঈয়ের মন্দির দর্শনীয়। এই মন্দিরের বিশেষত্ব প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় শ্রীমীরার ও অন্যান্য মহাজনের পদাবলী কীর্ত্তন হইয়া থাকে। একটি প্রবাদ আছে এই মন্দিরে শ্রীরূপ গোস্বামীর একটি বৈঠক বিদ্যমান আছেন।

শ্রীজামাই বিনোদ— এই মন্দির বর্ত্তমান রামকৃষ্ণমিশনের সন্নিকটে অবস্থিত। তাড়াশ ভূম্যধিপতি বনমালী রায় বাহাদুর মহাশয় এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। মন্দিরের শ্রীবিগ্রহ জামাই বিনোদ নামে বিখ্যাত। মন্দিরের সেবা পরিপাটী অতীব অপূর্ব্ব। বিনোদজীউর সেবাদি জামাই উপচারেই সম্পন্ন হয়। কথিত আছে—রায়বাহাদুরের এক কন্যা ছিলেন লক্ষ্মী অংশ সম্ভূতা, বিনোদজীউ তাহার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন এই হেতু জামাই বিনোদ বলিয়া বিখ্যাত।

উপরি উক্ত মন্দির ভিন্ন শ্রীবৃন্দাবনে দর্শনীয় মন্দির বহু বিদ্যমান। কিন্তু সকলের পরিচয় ও নামোল্লেখ সম্ভব নয় বলিয়া কেবল গোস্বামীগণের তৎসমসাময়িক কালের ও কতিপয় নাতিপ্রামান্য শ্রীমন্দিরের নাম পরিচয় দিক্‌দর্শন করা হইল।

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে বিলসিত গোবিন্দ বৈকুণ্ঠ এইবন অতি নিবিড় বিশাল ও বিস্তৃত শ্রীরামকৃষ্ণ বৎস ও বৎসতরী সমূহের সহিত এবং সখাগণে পরিবৃত হইয়া নিত্যলীলারত, এই শ্রীবৃন্দাবনে মহামাধুর্যের ধ্বজা রূপে শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন

শোভায়মান এবং শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীশ্যামকুণ্ড, শ্রীনন্দীশ্বর প্রভৃতি লীলাস্থলী শ্রীবৃন্দাবনস্থ মুখ্য দ্বাদশবনের অন্তর্গত। এই দ্বাদশ বনেই শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের ও তদীয় প্রিয়তমা ব্রজসুন্দরী-গণের সম্পৎরূপা শোভার আস্পদ কুণ্ড, কুঞ্জ ও মন্দিরাদি বিবিধ কৌতুকের স্থান বিদ্যমান রহিয়াছেন, যাহা লক্ষ্মীদেবীর চিত্তেও ক্ষোভ জন্মাইয়া থাকে। শ্রীরাধাগোবিন্দের বিবিধ লীলাবলী বিবিধ সম্ভারে পরিপূর্ণ এই দ্বাদশবনের দর্শন ও পরিক্রমায় সম্পন্ন হয় শ্রীবৃন্দাবন দর্শনের পরিপূর্ণতা। এই হেতু পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ ও শাস্ত্রে দ্বাদশবন দর্শন ও পরি-ক্রমার বিধান দিয়া দর্শনাদির মহা মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায় আচার্য্য বর্য্য শ্রীসনাতন গোস্বামীর পদা-ঙ্কানুসরণে ভাদ্র কৃষ্ণ পক্ষীয় দ্বাদশীতে প্রতিবৎসর শ্রীমদন-মোহনের পুরাতন মন্দির হইতে শ্রীদ্বাদশবন দর্শন ও পরিক্রমা বাহির হইয়া থাকেন।

শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ও দর্শন নিম্নলিখিত পর্য্যায়ে বিধেয়।

শ্রীদ্বাদশ বন

(পদ্মপুরাণোক্ত)

ভদ্র শ্রী লোহ ভাণ্ডীর মহাতাল খদিরকাঃ।
বহুলা কুমুদ কাম্যং মধু বৃন্দাবনং তথা॥

দ্বাদশৈতান্যরণ্যানি কালিন্দ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে।
পূর্ব্বে পঞ্চবনং প্রোক্তং তত্রাস্তি গুহ্যমুত্তমম্॥
মধু তাল কুমুদ বহুলা কাম্য আর।
খদিরা শ্রীবৃন্দাবন যমুনা এ পার॥
শ্রীভদ্র ভাণ্ডীর বিল্ব লৌহ মহাবন।
যমুনা ওপার এই পঞ্চম কানন॥
পরিক্রমা বন্ধে কহি ব্রজের আখ্যান।
মধুবন আদি যার অন্ত্য বৃন্দাবন॥
উপবন মহাবন যতেক কানন।
সংক্ষেপে করিয়ে মাত্র দিক্ দরশন॥

শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার্থী যাত্রিকগণের জ্ঞাতব্য।

শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্য বিহার ভূমি দর্শনার্থী যাত্রিকগণ শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাবলী মনে ধ্যান রাখিয়া বনযাত্রা করিলে সর্ব্ববিধ কামনা পূর্ণ করিয়া শ্রীবিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। অপর বন যাত্রার কথা লোকে প্রচার করিলে তাহার সর্ব্বত্র বিজয় লাভ হয়। প্রদক্ষিণ কালে পথস্থিত বৃক্ষ, গুল্ম, গো ব্রাহ্মণাদি মূর্ত্তি, পাষাণ, তীর্থ ও শ্রীভগবৎ লীলাস্থল পরিত্যাগ করিতে নাই। যথাবিধি সম্মান পূর্ব্বক সকলের পূজা কর্ত্তব্য। তীর্থস্থানে স্নান, আচমন এবং বৃক্ষ ও দেবালয়ের যথাবিধি পূজা করতঃ বনযাত্রা বিধেয়। পরিক্রমা কালে পথে প্রাপ্ত বৃক্ষ, গো ও শ্রীভগবৎ মূর্ত্তি সমূহের অসম্মানে যাত্রা নিস্ফল হয়

এবং গুরুতর অভিশাপ প্রাপ্ত হইতে হয়। সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম করিতে করিতে পরিক্রমা করিতে হয় এবং বনযাত্রার সীমা লঙ্ঘন হইলে আচমন করিতে হয়। যেস্থান হইতে যাত্রা আরম্ভ হইবে তথায় শ্রীমহাদেবজীর পূজা করিয়া যাত্রা করনীয় এবং পুনরায় সেই স্থানে যাত্রা সমাপ্ত হইবে। ইহার অন্যথা হইলে যাত্রা নিষ্ফল হইবে। এবিষয়ে সরল, সদাচারী শাস্ত্রজ্ঞ বৈষ্ণব মহাত্মা অথবা তীর্থগুরু ব্রজবাসীগণের নিকট অবগত হইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করণীয়।

প্রদক্ষিণকালে নিত্য প্রয়োজনীয় পাথেয় দ্রব্যাদি সঙ্গে রাখা একান্ত বিধেয় এবং প্রতিদিন প্রতিস্থান হইতে রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই যাত্রা বাহির হয় ও মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই সেই দিকের গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইয়া আহারাদির ব্যবস্থা করিতে হয় ও তথায় তাঁবুতে রাত্রি যাপন। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আচার্য্যবর্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী তথা শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতি ভাদ্র কৃষ্ণ পক্ষের শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর অব্যবহিত পর দ্বাদশীতে শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে যাত্রা করিয়া ভূতেশ্বরে রাত্রিতে অবস্থান করতঃ ত্রয়োদশী হইতে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা শুভারম্ভ করেন। গোস্বামিগণের পদাঙ্কানুসরণে গৌড়ীয়বৈষ্ণববৃন্দ আজও সেই নিয়মের অনুবর্ত্তন করিয়া আসিতেছেন। তদনুসারে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার্থী যাত্রীগণ ভাদ্র কৃষ্ণ পক্ষীয় দ্বাদশীর অপরাহ্নে শ্রীরাধা মদনমোহনের দর্শন করতঃ তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা অনুমতিক্রমে শ্রীসনাতন

প্রভুর চরণে প্রণাম ও অনুমতি লইয়া যাত্রার শুভারম্ভ করতঃ এইদিন বৃন্দাবন হইতে মথুরায় আসিয়া ভূতেশ্বর মহাদেব বাবার চরণে অবস্থান করেন। কারণ ভূতেশ্বর বাবা মথুরামণ্ডলের ক্ষেত্রপাল, তাঁহার কৃপা লাভার্থে একরাত্রি তাঁহার চরণে অবস্থান ও তাঁহার অনুমতি অবশ্যই অপেক্ষণীয়। পাপীগণের মোক্ষপ্রদ ভূতেশ্বর মহাদেব ও শ্রীপাতালদেবী দর্শনীয়। ভূতেশ্বর হইতে মধুবন।

শ্রীমধুবন

প্রথমং মধুবনং প্রোক্তং দ্বাদশং বৃন্দিকাবনম্।
এতানি যে প্রপশ্যন্তি ন তে নরক ভোজিনঃ॥
রম্যং মধুবনং নাম বিষ্ণুস্থানমনুত্তমম্।
যদ্ দৃষ্ট্বা মনুজো দেবি! সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ॥

প্রথমতঃ মধুবন হইতে দ্বাদশবৃন্দাবন পর্য্যন্ত বন সমূহকে যাহারা কেবলমাত্র দর্শন করে, তাহাদের আর নরক যন্ত্রনা ভোগ করিতে হয় না। আর যে সকল মনুষ্য যথাক্রমে দ্বাদশ বন যাত্রা করিবে, তাহারা বিষ্ণুলোকে গমন করিবে। মধুবন দ্বাদশবনের অন্যতম এবং প্রথম। এই বনের বর্ত্তমান নাম মহলী, মথুরা শহর হইতে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে তিনমাইল দূরে অবস্থিত। ত্রয়োদশীর দিনে যাত্রা করিয়া এই বনে আগমন করেন, গ্রামের পূর্বে ধ্রুবটীলা অবস্থিত। এখানে ধ্রুবের প্রতিমূর্ত্তি দর্শনীয়, কেহ কেহ এই টীলাকে ধ্রুবের তপস্যাস্থল

বলিয়া উল্লেখ করেন। গ্রামের নৈঋতে মধুকুণ্ড অবস্থিত যমুনার তীরে অতি রমনীয় এই বন শ্রীরাম কৃষ্ণের গোচারণের অতি উত্তম স্থান। হরিভক্তগণের পুণ্যভূমি পাপীগণ এইস্থান লাভ করিয়া নিশ্চয় নিষ্পাপ হইবে। শ্রীহরি এই বনে মধুদৈত্যকে বিনাশ করিয়াছিলেন। সেই অবধি এই বনের নাম মধুবন বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই বন যাহারা দর্শন করিয়াছেন এবং নাম শ্রবণ করিয়াছে কিম্বা সেবা করিয়াছে অথবা মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছে পৃথিবীতে তাহারাই ধন্য। শ্রীহরির প্রিয় এই মধু বনে কিছুই দুর্লভ নহে। যাহারা এই বনে আগমন করিয়াছে, তাহাদের সকল অভীষ্ট অচিরেই লাভ হইয়া থাকে। এই বনের পর তালবন।

শ্রীতালবন

বনং তালবনাখ্যঞ্চ দ্বিতীয়ং বনমুত্তমম্।
যত্র স্নাত্বা নরো দেবি! কৃতকৃত্যোঽভিজায়তে॥

তালবন নামক এই দ্বিতীয় বন অতি উত্তম বন। এই বনের বর্ত্তমান নাম তাড়সি। ইহা মধুবনের দুইমাইল নৈঋত কোণে অবস্থিত। শ্রীবলদেব এইস্থানে ধেনুকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। একদিন সখাগণ সমভিব্যাহারে শ্রীরামকৃষ্ণ গোচারণ রঙ্গে তাল বনের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলে শ্রীদামাদি সখাগণ পক্ক তালের সুগন্ধি পাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের মুখপানে চাইয়া বলিতে লাগিলেন—হে রাম! হে প্রাণসখা

কৃষ্ণ! ঘনবৃক্ষ পরিবেষ্টিত অদূরে ঐ তালবনের তালবৃক্ষে বহু তাল আছে এবং ভূমিতেও বহু তাল পড়িয়া আছে। কিন্তু কিন্তু ওখানে এক ভয় আছে, কংসের আদেশে সপরিকর ধেনুক নামক অসুর তালবন রক্ষা করিতেছে। তার ভয়ে কেহ সেখানে যাইতে পারে না। অত্যন্ত সৌগন্ধি সেই তালফল খাইবার জন্য আমাদের সকলের ইচ্ছা। ইহা শুনিতেই শ্রীবলরাম লম্ফ প্রদান করিয়া হুঙ্কার করতঃ সসখা শ্রীকৃষ্ণের সহিত শিঙ্গা বেণু বাজাইতে বাজাইতে তালবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। মত্তগজপ্রায় তেজ প্রকাশিয়া শ্রীবলরাম হস্তদ্বয়ে তাল বৃক্ষ কাঁপাইয়া বহু তাল ভূমিতে পাতিত করিলেন। তাল-পতন শব্দে খলস্বভাব মহাবলবান ধেনুক ছুটিয়া আসিয়া পশ্চাৎ ভাগের পাদ-দ্বয় দ্বারা শ্রীবলরামের বক্ষে পদাঘাত করিল। পুনরায় সম্মুখে আসিয়া পশ্চাৎ পাদদ্বয় প্রসার করিবামাত্র শ্রীবলরাম বামহস্তে পদদ্বয় ধরিয়া উর্দ্ধে ভ্রমণ করাইতে করাইতে বৃক্ষোপরি নিক্ষেপ করিলে তাহাতে তাহার প্রাণ বহির্গত হইল এবং তাহার দেহভারে বহু বৃক্ষের পতন ঘটিল। গর্দ্দভরূপী অসুরের দেহ ভূমিতে পতিত দেখিয়া সখাগণের মনে পরম আনন্দ হইল। এদিকে ধেনুকের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া তার জ্ঞাতিগণ কুৎসিত শব্দ করিতে করিতে তালবনে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে মারিতে উদ্যত হইলে পূর্ব্বের ন্যায় পদদ্বয় ধরিয়া বৃক্ষোপরি নিক্ষেপে সকলেই প্রাণ ত্যাগ করিল। শ্রীরাম-কৃষ্ণের এই অত্যদ্ভুত লীলা দেখিয়া দেবতাগণ পুষ্প বর্ষণ

করিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দে সখাগণকে বলিলেন যে যত পার ইচ্ছা মত তালফল ভক্ষণ কর। সখাগণ শ্রীরামকৃষ্ণের সহ তাল ভক্ষণ করিয়া অপরাহ্ন সমাগত দেখিয়া গোধন লইয়া রামের প্রশংসা করিতে করিতে ব্রজে গমন করিলেন। এই তালবনের পশ্চিমে স্বচ্ছজলেপূর্ণ পদ্মশোভিত একটি কুণ্ড শোভা পাইতেছে, এই কুণ্ডে স্নান করিলে মানব কৃত কৃতার্থ হয়। কেবল এই কুণ্ডে নয়, তালবন স্থিত যে কোন জলে স্নান করিলে মানব দেহান্তে শ্রীকৃষ্ণ চরণ প্রাপ্ত হয়। এই কুণ্ডের পূর্ব্বতীরে শ্রীবলদেবজীউ দর্শনীয়। এই বনের পশ্চিমভাগে শ্রীকুমুদবন।

শ্রীকুমুদবন

বনং কুমুদবনাখ্যঞ্চ তৃতীয়মুত্তমং পরম্।
তত্র গত্বা নরো দেবি! মমলোকে মহীয়তে॥

পরম উৎকৃষ্ট কুমুদ নামক এই তৃতীয় বন, ইহা তালবনের দুই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এই বনের বর্ত্তমান মান কদর বন। ইহা শ্রীকৃষ্ণের বিহার স্থান। এই বনে এক মনোহর সরোবর শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। প্রস্ফুটিত কুমুদে তাহা সতত সুশোভিত। ভ্রমর ভ্রমরী সেই কুমুদের মধুপানে নিয়ত নিরত। নানা বর্ণের বৃক্ষে সরোবরের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত। সখাগণের সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে সতত বিহার করিয়া থাকেন। মানবগণ এই স্থানে আগমন করিলে বিষ্ণু লোকে পুজিত হয়,

এই স্থানে শ্রীকপিলদেব দর্শনীয়। এই বনের ঈশানে শান্তনুকুণ্ড।

শান্তনুকুণ্ড বা সাঁতোয়া—ইহা কুমুদবন হইতে ছয় মাইল ঈশান কোণে অবস্থিত এবং মথুরা হইতে আড়াই মাইল পশ্চিমে। কুমুদবন হইতে শান্তনুকুণ্ড যাইবার সময় ওস্পার মানা কোনগ্রাম এবং লগায়ো নামক তিনটি গ্রাম হইয়া যাইতে হয়। শ্রীশান্তনু মহারাজ পুত্র কামনায় এইস্থানে শ্রীসূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। এই গ্রামের দুই মাইল ঈশানকোণে গণেশা গ্রাম। এই গ্রামের বায়ুকোণে গন্ধেশ্বরা কুণ্ড অবস্থিত। এখানে শ্রীকৃষ্ণ গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিয়াছিলেন। সেই অবধি এই কুণ্ডের নাম গন্ধেশ্বরা বলিয়া বিখ্যাত। এই কুণ্ডের উত্তরাংশে বহুলাবন।

শ্রীবহুলাবন

পঞ্চমং বহুলবনং বনানাং বনমুত্তমম্।
তত্র গত্বা নরো দেবি! অগ্নিস্থানং স গচ্ছতি॥

সর্ব্বোত্তম বহুলাবনই পঞ্চমবন। এই বনের বর্ত্তমান নাম বাটী। ইহা শান্তনুকুণ্ডের চারি মাইল উত্তর ভাগে অবস্থিত। পুষ্পোদ্যানাদিতে পরম সমৃদ্ধিশালী অতীব শোভায়মান এই বন শ্রীকৃষ্ণ বিহারের অতি যোগ্য স্থান। এই স্থানে আগমন করিলে মানব অগ্নিলোক বাসী হয়। শ্রীবিষ্ণুপত্নী শ্রীবহুলাদেবী সর্ব্বদা এই বনে নিবাস করেন। কথিত আছে কোন কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণের একটি গাভী চরিতে চরিতে বহুলাবনে আসিলে

একটি ব্যাঘ্র তাহাকে আক্রমন করে। গাভী তাহার ক্ষুধার্ত্ত বৎসকে দুগ্ধপান করাইয়া অতি শীঘ্রই প্রত্যবর্ত্তন করিবে বলিয়া ব্যাঘ্রের নিকট প্রতিশ্রুত হয়। গাভী বৎসের নিকট গিয়া বলিল বৎস! তোমার যত ইচ্ছা দুগ্ধ পান কর এই তোমার শেষ দুগ্ধ পান, কারণ আমি ব্যাঘ্রের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছি। ইহা শুনিয়া বৎস বলিল—তুমি যেরূপ ব্যাঘ্রের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছ আমিও সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে তোমাকে না বাঁচাইতে পারিলে আমিও একবিন্দু দুগ্ধ খাইব না। ব্রাহ্মণ গাভী ও বৎসের সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া গাভী ও বৎসকে লইয়া ব্যাঘ্রের নিকট গমন করিলে ব্যাঘ্র গাভী বৎস ও ব্রহ্মণকে উপস্থিত দেখিয়া বলিল আমি এক জনকেই খাইব বলিয়াছি, তিন জনকে খাইব বলি নাই। বৎস ও ব্রাহ্মণ বলিল বহুলা গাভীকে আমাদের নিকট হইতে বিদায় দিলে আমরাও তোমার নিকট আত্মোৎসর্গ করিব। এদিকে ব্রাহ্মণের কৃষ্ণ সেবার গাভীর এই প্রকার সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কথা জানিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ তথায় শ্রীনারদকে পাঠাইলেন। নারদ শ্রীকৃষ্ণের নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলে শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে গমন করত ব্যাঘ্রকে নিধন করিয়া গাভী প্রভৃতিকে রক্ষা করিয়াছিলেন। গ্রামের উত্তরে শ্রীবহুলা কুণ্ড অবস্থিত। এই কুণ্ডের উত্তরাংশে একটি কুণ্ড শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। এই কুণ্ডকে সকলে কৃষ্ণকুণ্ড বলিয়া উল্লেখ করেন। কুণ্ডের উত্তরে শ্রীবল্লভাচার্য্যের উপবেশন স্থান। কুণ্ডের দক্ষিণে

শ্রীবহুলা নামক গাভীর স্থান। গ্রামের পূর্ব্বে শ্রীসঙ্কর্ষণকুণ্ড গ্রামের এক মাইল দক্ষিণে মান সরোবর। বর্ত্তমান ইহা খড়িয়া বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে ব্যাক্তি চৈত্রমাসে এই স্থানে স্নান করে, সেই ব্যাক্তি শ্রীলক্ষ্মীর সহিত শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া থাকে। গ্রাম হইতে সরোবরে যাইবার সময় নিম্ববৃক্ষের নিকট অতি প্রাচীন পঞ্চানন মহাদেব দর্শনীয়। গ্রামের মধ্যভাগে শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ মন্দির বিরাজমান দর্শনীয়। ইহার বায়ুকোণে রাল। এই গ্রাম বহুলা বনের দুই মাইল বায়ুকোণে, গ্রামের পশ্চিমে শ্রীবলরামকুণ্ড অবস্থিত। ইহার কিয়ৎ পশ্চিমে শ্রীবলদেবজীউ দর্শনীয়। ইহার পর মঘেরা।

মঘেরা—এই গ্রাম রালের দেড় মাইল ঈশানকোণে এবং বহুলাবন হইতে দুইমাইল উত্তরে অবস্থিত। অক্রুর মহাশয় যখন শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে ব্রজ হইতে মথুরায় লইয়া যান, তখন তাঁহাদের অদর্শনে ব্রজবাসীগণ এই স্থানে মূর্চ্ছা হইয়াছিলেন। ইহার পর ঈশানে জৈতগ্রাম।

জৈতগ্রাম—ইহা মঘেরার সওয়া মাইল ঈশানকোণে অবস্থিত। অঘাসুর বধ করিবার পর দেবতাগণ এখানে জয়ধ্বনি করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের উপরি পুষ্প বর্ষণ করিয়াছিলেন। ইহরাপর অগ্নিকোণে সটিকরা গ্রাম।

শ্রীসটীকরা—এই গ্রাম জৈতের দেড় মাইল অগ্নিকোণে এবং বহুলাবন হইতে দুই মাইল পূর্ব্ব ভাগে এবং মথুরার চারি মাইল বায়ুকোণে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের যমলার্জ্জুন ভঞ্জনের পর

শ্রীব্রজরাজনন্দ মহাবন পরিত্যাগ করিয়া এখানে কয়েক বৎসর যাবৎ নিবাস করিয়াছিলেন। এই স্থানে নিবাসকালে একদিন শ্রীকৃষ্ণ জননীর নিকট গোচারণের অভিলাষ প্রকাশ করিলে মাতা অতিশয় আনন্দিত হইয়া শাস্ত্রানুসারে শুভদিন নির্ণয় করতঃ মার্গশীর্ষের শুক্লাষ্টমীর দিনে শ্রীকৃষ্ণের দুই বৎসর তিন-মাস বয়ঃক্রমে শ্রীযশোদা ও শ্রীরোহিণী মাতা সানন্দে শ্রীরাম-কৃষ্ণকে অতি সযত্নে বেশভূষায় রাখাল বেশ করিয়া দিলে দুই ভাই আনন্দে শ্রীনন্দ বাবার রাজ সভায় আগমন করিলেন। শ্রীনন্দবাবা দুই ভাইকে ক্রোড়ে লইয়া গণ্ডে চুম্বন করিয়া সোল্লাসভরে রামকৃষ্ণের হস্তে পাঁচনি তুলিয়া দিলে এমন সময় ব্রজের অন্যান্য শিশুরা শিঙ্গা বেণু বাজাইতে বাজাইতে তথায় আসিয়া মিলিত হইল। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ দুইভাই বৎসের পুচ্ছ ধরিয়া নাচিয়া নাচিয়া চলিতে লাগিলেন। শ্রীনন্দবাবাও মাতৃগণ সাশ্রুনয়নে শিশু রামকৃষ্ণের পিছনে পিছনে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের বৎসচারণ লীলা আরম্ভ হইলে ব্রজবাসীগণ সকলে তদ্দর্শনে পরমানন্দিত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ গোষ্ঠে আসিয়া সমবয়স্ক শিশু সঙ্গে শিঙ্গা বেণু শিক্ষা করেন, আবার কাহারও সহিত হাতাহাতি, কাহারও সহিত ঠেলাঠেলি আবার কাহারও সহিত মাথামাথি প্রভৃতি বালক সুলভ বাল্যচাপল্যে তাঁহাদের দিন কাটিতেছিল, এমন সময় রামকৃষ্ণের নিধনের নিমিত্ত এক অসুর বৎসরূপ ধারণ করিয়া বৎসগণের মধ্যে প্রবেশ

করিলে তখন বলরাম শ্রীকৃষ্ণকে ইঙ্গিতে জানাইলে শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে বৎসরূপী অসুরের নিকট অগ্রসর হইয়া পুচ্ছের সহিত দুই পদে ধরিয়া সেই বৎসাসুরকে কপিত্থ বৃক্ষের উপর নিক্ষেপ করিলে অসুর বিশাল শরীর ধারণ করতঃ ভূমিতলে পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। সঙ্গীয় শিশুগণ তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং সাধু সাধু বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রশংসা করিতে লাগিল। দেবগণও স্বর্গ হইতে পুষ্পবর্ষণ করিল। এইরূপ অন্য একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ গোষ্ঠে শিশু বৎস নিয়া প্রাতঃকালোচিত ভোজন সমাপিয়া জলপানের নিমিত্ত জলাশয় যমুনার নিকট আগমন করিয়া প্রথমে নিজনিজ বৎসকে জল পান করাইয়া তদন্তে সকল শিশুগণ জলপান করিয়া বিশাল কায় বকাকৃতি এক অসুরকে দেখিয়া অত্যন্ত ভীত ও বিস্মিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া শিশুগণকে পিছনে রাখিয়া বীরদর্পে মহা বলবান সেই অসুরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলে বকাসুর শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। শিশুগণ শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে বিকল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। শ্রীকৃষ্ণ বকাসুরের উদরে প্রবেশ করিয়া অগ্নিসম তেজ প্রকাশ করিলে বকাসুর সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণকে উদ্‌গার করিয়া ফেলিল এবং তাঁহাকে অক্ষত দেখিয়া বকাসুর পুনরায় সক্রোধে তুণ্ডাঘাত করিতে আসিল। শিশুগণও শ্রীকৃষ্ণকে বাহিরে দর্শন করিয়া চেতনা ফিরিয়া পাইল। কংসসখা বকাসুর যেমন দুই তুণ্ড (ঠোঁট) প্রসার করিয়া আঘাত করিতে আসিল

অমনি শ্রীকৃষ্ণ বকাসুরের দুই তুণ্ড ধরিয়া বেনা পত্রের ন্যায় চিরিয়া ফেলিলেন। দেবতাগণ শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা দর্শন করিয়া অন্তরীক্ষ হইতে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল। সময় জানিয়া সখাগণও আনন্দে বৎসগণ লইয়া নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। শ্রীরামকৃষ্ণের সটিকরায় অবস্থানকালে তাঁহাদের হস্তে বৎসাসুর ও বকাসুর নিধন হইয়াছিল। ইহার পরে শ্রীনন্দ-বাবা শ্রীনন্দীশ্বরে গমন করিয়াছিলেন। এই সটিকরা গ্রামের উত্তরদিকে শ্রীগরুড় গোবিন্দ।

শ্রীগরুড় গোবিন্দ—ইহা সটিকরা গ্রামের উত্তরে অবস্থিত। কথিত আছে শ্রীরাম অবতারে ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক শ্রীরামচন্দ্র নাগ পাশে বদ্ধ হইলে শ্রীগরুড় শ্রীরামের বন্ধন মোচন করিয়াছিলেন। তদবধি শ্রীরামচন্দ্রের ভগবত্তা সম্বন্ধে গরুড়ের কিছু সন্দেহ হয়। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ অবতারে গরুড় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়া ব্রজময় শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি দর্শন করিতে লাগিলেন, ইহাতে গরুড় নিতান্ত বিস্মিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মায়া জানিতে পারিয়া অতি আর্ত্তনাদে তাঁহার শরণ গ্রহণ করেন এবং বিবিধ স্তুতিতে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ গরুড়কে আশ্বাস প্রদান করতঃ তাহার স্কন্ধে আরোহন করিয়া বলিলেন আজ হইতে তোমার নাম আমার নামের অগ্রে উচ্চারিত হইবে এবং আমাদের এই বিগ্রহের নাম শ্রীগরুড়গোবিন্দ বলিয়া সর্ব্বসাধারণে বিদিত হইবে। অপর অন্যত্র কথিত আছে—কোন এক দিন শ্রীদাম

শ্রীগরুড়ের রূপ ধারণ করিয়া খেলা করিতেছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপ প্রকাশ করিয়া তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়াছিলেন, এই হেতু শ্রীগরুড় গোবিন্দ নাম প্রকাশ হইল। ইহার পর মরো গ্রাম।

ময়ূরগ্রাম—ইহা বহুলা বনের দুই মাইল নৈঋতকোণে অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান নাম মোর। একদা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সহিত মিলিত হইলে তাঁহাদের চারিদিক বেষ্টন করিয়া ময়ূরগণ আনন্দে পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছিল। সেই অবধি এই গ্রামের নাম ময়ূর গ্রাম। বহুলা বন হইতে ময়ূর গ্রামে যাইবার সময় ছাকনা গ্রাম হইয়া যাইতে হয়। এই মোর গ্রামের অগ্নিকোণে দতিহা।

দতিহা—নামান্তর দন্তবক্রবধের স্থান ইহা—মোর গ্রামের সওয়া মাইল অগ্নিকোণে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে দন্তবক্রকে বধ করিয়া যমুনার পরপারে গরুই নামক স্থানে পিতা শ্রীনন্দের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। শ্রীমহাবনের চারি মাইল ঈশানকোণে এবং লৌহবনের পাঁচ মাইল ঈশান কোণে খেড়ী নামে একটি গণ্ড গ্রাম, এই প্রাচীন গ্রামই গরুড়। এই গ্রামের অর্দ্ধ মাইল উত্তরে আলিপুর নামে যে গণ্ডগ্রাম আছে সেই গ্রামই প্রাচীন আয়রে গ্রাম।

আয়রে—শ্রীকৃষ্ণ দন্তবক্রকে বধ করিয়া আগমন করিলে সমস্ত ব্রজবাসী প্রেমে আয়রে আয়রে বলিয়া এই স্থানে মিলিত হইয়াছিলেন। গরুই ও আয়রে গ্রামের সওয়া মাইল পূর্ব্বে

কৃষ্ণপুর। কেহ কেহ এই গ্রামকে গোপালপুর বলিয়াও উল্লেখ করেন। দীর্ঘ বিরহের পর ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে এই স্থানে লাভ করিয়া নানা প্রকারে ব্রজকে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। ইহার পশ্চিমে আরিং গ্রাম।

আরিং—দতিহার পাঁচ মাইল পশ্চিমে এবং শ্রীগোবর্দ্ধনের চারি মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। এই গ্রাম শ্রীবলদেবজীউর বিলাসস্থল। গ্রামের উত্তর পশ্চিম কোণে কিল্লোল কুণ্ড অবস্থিত। এই কুণ্ডের পূর্ব্বদিকের কিছু দূরে এবং গ্রামের উত্তর ভাগে শ্রীবলদেব বিগ্রহ দর্শনীয়। শ্রীবল্লভ আচার্য্যের মতে এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ জোরাবরি পূর্ব্বক গোপিকাগণের নিকট হইতে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পরই মাধুরী কুণ্ড

মাধুরী কুণ্ড—ইহা আরিঙ্গের দুই মাইল অগ্নিকোণে অবস্থিত।

জখীন গাঁও—ইহা আরিঙ্গের আড়াই মাইল উত্তরে কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব দিশা। এই গ্রাম বসতি গ্রামের দেড় মাইল অগ্নিকোণে অবস্থিত। শ্রীশ্রীরেবতী ও বলদেব তথা বলভদ্র কুণ্ড ও রেণুক কুণ্ড দর্শনীয়। এই গ্রামকে কেহ কেহ দক্ষিণ গ্রাম বলিয়াও উল্লেখ করেন। এখানে শ্রীরাধিকা দাক্ষিণ্য ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন।

তোষ—ইহা জখীন গ্রামের দুই মাইল ঈশানকোণে অবস্থিত। এই গ্রাম শ্রীকৃষ্ণ বলরামের তোষস্থল। এখানে তোষণ কুণ্ড দর্শনীয়। তোষের দুই মাইল বায়ুকোণে জনতী

গ্রাম অবস্থিত। ইহার পশ্চিমে বসতী গ্রাম অবস্থিত।

বসতী—এই গ্রাম জনতী গ্রামের সওয়া মাইল পশ্চিমে শ্রীব্রজরাজনন্দ মহাবন ত্যাগ করিয়া সট্টিখরায় বাস করিলে শ্রীবৃষভানু মহারাজ রাভেল হইতে আসিয়া এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। এই গ্রাম হইতে সট্টিখরা ছয় মাইল পূর্ব্ব-ভাগে অবস্থিত। পরে শ্রীব্রজরাজ নন্দীশ্বরে এবং শ্রীবৃষভানু মহারাজ বর্ষাণে নিবাস করিয়াছিলেন।

মুখরাই ইহা বসতীর দুই মাইল নৈঋতকোণে এবং শ্রীরাধাকুণ্ডের সওয়া মাইল পুর্ব্ব দক্ষিণাংশে অবস্থিত। শ্রীরাধিকার মাতামহী শ্রীমুখরার নামানুসারে এই গ্রামের নাম মুখরাই বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানে শ্রীকৃষ্ণকুণ্ড ও বাদ্যশীলা দর্শনীয়। ইহার উত্তরে আরিট গ্রাম নামান্তর শ্রীরাধাকুণ্ড।

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড

রাধৈব কুণ্ডং দ্রবতাং গতাভূৎ
কৃষ্ণেক্ষণানন্দ ভরেণ মন্যে।
কৃষ্ণোঽপি রাধেক্ষণ মোদভারা-
ত্তেনৈব তন্নামগুণা দ্বিকুণ্ডী॥

মুখরাই গ্রামের সওয়া মাইল উত্তরে শ্রীরাধাকুণ্ড অবস্থিত। অরিষ্ট বৃষরূপ ধারণ করিয়া ব্রজে উৎপাত আরম্ভ করিলে শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে ঐ অসুরকে বধ করেন। কংসচর দুষ্টমতি অরিষ্টাসুর বৃষের আকার ধরিরা ব্রজে নানাবিধ উৎপাত

আরম্ভ করিলে ব্রজবাসীগণ তাহাতে অস্থির হইয়া উঠিল। সেই দুরাত্মা কখনও উর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া শিঙ্গদ্বারা পৃথিবী বিদারণ, অল্প অল্প মল মূত্র ত্যাগ কখনও বা আরক্ত নয়নে ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার সেই কর্কশ গর্জ্জন শ্রবণে গর্ভবতী গাভীর গর্ভপাত আরম্ভ হইল। তাহার তীক্ষ্ণশিঙ্গ ও কর্কশ গর্জ্জন শ্রবণে অন্যান্য পশুগণও বন ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিল এবং ব্রজবাসীগণ ভয়ে শ্রীহরির শরণাপন্ন হইলে শ্রীগোবিন্দ তাঁহাদিগকে অভয় প্রদান করিয়া বৃষাসুরের নিকট গমন করতঃ তাহাকে আহ্ববান করিয়া বলিলেন ওরে অসত্তম! তোর ন্যায় যত দুরাত্মা আছে তাহাদের আমি শাসনকর্ত্তা, শ্রীগোবিন্দ এইরূপ আস্ফালন ও হাতে তালি দিতে দিতে তাহাকে অবহেলা করত শ্রীদামের স্কন্ধে হস্তারোপণ করিয়া অরিষ্ঠাসুরের দিকে অনিমেখ নয়নে তাকাইয়া রইলেন। ইহা দেখিয়া কুপিত অরিষ্ঠাসুর মেঘ সন্নিধানে পুচ্ছ বিস্তার করিয়া সজোরে মহী খনন করিতে করিতে এবং ইন্দ্রের মুক্ত বজ্রজেরন্যায় অগ্রে শিঙ্গ ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকে ছুটিয়া আসিল। শ্রীকৃষ্ণ তখন অরিষ্ঠের দুই শৃঙ্গ ধরিয়া অষ্টাদশ পদ দূরে নিক্ষেপ করিলেন। শ্রীভগবান সর্ব্বশক্তিমান, অসুরও অতি বলবান্ উভয়ে তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে ধরিয়া পৃথিবীর উপর সজোরে নিক্ষেপ করিলে সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ বিচূর্ণ বৃষাসুর রক্ত বমন করিতে করিতে মৃত্যুবরণ করিল। এইদিন সন্ধ্যাকালে শ্রীকৃষ্ণ অরিষ্টাসুরকে নিধন করিয়াছিলেন এইদিন

রজনীতে ব্রজবালাগণের কেলি কৌতুহল হইতে শ্রীকুণ্ডযুগল প্রকট হইয়াছিলেন। এইদিন রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার প্রার্থনা করিলে গোপীগণ সহাস্যে বলিলেন—হে বৃষাসুর মর্দ্দন! আজ আমাদিগকে স্পর্শ করিও না, আজ তুমি বৃষ হত্যা করিয়া তোমার গোবিন্দ নামে কালিমা লেপন করিয়াছ। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে সুন্দরীগণ! সে তো বৃষ নয় ভয়ঙ্কর অসুর। গোপীগণ বলিলেন—শোন, বৃত্রাসুরের ব্রাহ্মণ শরীর হওয়ায় তাহাকে বধের নিমিত্ত ইন্দ্রকে ব্রহ্ম হত্যার পাপ স্পর্শ করিয়াছিল, তদ্রূপ ইহার তো বৃষের রূপ ছিল। গোপীগণের যুক্তিপূর্ণ বচন শ্রবণ করিয়া গোবিন্দ বলিলেন—হে প্রিয়ে! আমি তাহা হইলে কিরূপে এখন মুক্তি লাভ করিব? তদুত্তর হে প্রিয়তম! তুমি যদি ত্রিভুবনের সমস্ত তীর্থে অবগাহন করিতে পার তবেই পাপ মুক্ত হইবে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—আমি ব্রজভূমি ত্যাগ করিয়া ত্রিভুবনের তীর্থ স্নানে কোথায় যাইব? আমি এখানেই ত্রিভুবনের সমস্ত তীর্থ আহ্বান করিয়া তোমাদের সম্মুখে স্নান করিব। এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ঐ স্থানে সজোরে চরণের পাষ্ণি দিয়া আঘাত করিলে সঙ্গে সঙ্গে পাতাল হইতে ভোগবতী গঙ্গা ও সমস্ত তীর্থ আসিয়া উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—তোমরা আমার কুণ্ডে বিরাজমান হও, শ্রীকৃষ্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত তীর্থ কুণ্ড মধ্যে উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে প্রিয়ে! দেখ সমস্ত তীর্থ উপস্থিত। গোপীগণ বলিলেন—হে হরে!

তোমার কথাতে আমরা বিশ্বাস করি না। এই বলিলে তখন সমস্ত তীর্থ নিজ নিজ মূর্ত্তি ধারণ করতঃ হাত জোড় করিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছেন—আমি লবণ সমুদ্র, আমি ক্ষীর সমুদ্র ইত্যাদি সমস্ত তীর্থের জল পৃথক্ পৃথক্ দর্শন করুন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সেই তীর্থে স্নান করিয়া পবিত্র হইয়া দাম্ভিকতা প্রকাশ করতঃ বলিলেন আমি সর্ব্বতীর্থময় এই কুণ্ড প্রকাশ করিলাম। তোমরা সকলে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম পুণ্য কর নাই এখন এই কুণ্ডে স্নান করিয়া সর্ব্বতীর্থের মাহাত্ম্য অর্জ্জন কর। ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধিকা সখীগণকে বলিলেন—হে সখিগণ! এখন আমরাও এই প্রকার এক কুণ্ড নির্ম্মাণ করিব।

স্বামিনীর আজ্ঞায় সখীগণ শ্রীকুণ্ডের পশ্চিমে ঘৃষাসুরের খুরের গহ্বরের নরম মৃত্তিকায় এক মনোরম কুণ্ড নির্ম্মাণ করিলেন কিন্তু শ্রীরাধা যেকুণ্ড নির্ম্মাণ করেন তাহা সর্ব্বদা জলাবৃত থাকায় সর্ব্বসাধরণের অদৃশ্য। এই কুণ্ড কঙ্কণ কুণ্ড নামে অভিহিত। শ্রীমতী ভানুনন্দিনী নিজের হস্তস্থিত কঙ্কণ দ্বারা এই কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই শ্রীকুণ্ড যদিও সর্ব্বদা অদৃশ্য তথাপি শ্রীকুণ্ডের সংস্কার কালে ভাগ্যবানের দৃশ্য হইয়া থাকেন শ্রীকৃষ্ণ সেই কুণ্ড দেখিয়া শ্রীরাধিকাকে বলিলেন—প্রিয়ে! তোমার কুণ্ড সত্যই সুন্দর, কিন্তু জল তো নাই, সুতরাং তোমার সখীগণকে লইয়া আমার কুণ্ড হইতে জল লইয়া তোমার কুণ্ড পূর্ণ কর। তদুত্তরে শ্রীরাধিকা বলিলেন—না, কদাপি নয়।

তোমার অবগাহনে ঐ জল গোবধ পাতকযুক্ত, অতএব মানস গঙ্গার পবিত্র জলে আমার এই কুণ্ড পূর্ণ করিব। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার অভিপ্রায় অবগত হইয়া মৃদুমন্দ হাঁসিতে হাঁসিতে তীর্থ গণকে ইঙ্গিত করিলে তীর্থগণ শ্রীশ্যাম কুণ্ডের বাহিরে আসিয়া শ্রীভানুনন্দিনীর চরণ যুগলে প্রণাম করতঃ করজোড়ে বলিলেন —দেবি! ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনার মহিমা জানিতে অক্ষম, অতএব আপনি আমাদের প্রতি কৃপা পূর্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করন।

তীর্থগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীভানুনন্দিনী বলিলেন —কি তোমাদের অভিলাষ? তীর্থগণ বলিলেন—আমরা আপনার কুণ্ডে যাইব। তখন শ্রীরাধিকা সখীগণের সম্মুখে স্বীয় প্রাণবল্লভের বদন কমলে স্বীয় নয়নপ্রান্ত সংলগ্ন করতঃ হাঁসিতে হাঁসিতে বলিলেন—হে তীর্থগণ! তোমরা আমার কুণ্ডে আগমন কর। তখন তীর্থগণ উভয় কুণ্ডের মধ্যস্থলের আবরণ সজোরে ভেদ করতঃ নিজেদের জলে কুণ্ড পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে প্রিয়তমে। জগতে আমার কুণ্ড অপেক্ষা তোমার কুণ্ডের মহিমা সমধিক-রূপে খ্যাতি লাভ করিবে এবং আমিও প্রতিদিন তোমার কুণ্ডে স্নান ও জল বিহার করিব। কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণাষ্টমীর মধ্যরাত্রে এই কুণ্ডযুগলের আবির্ভাব হইয়াছিল। শ্রীকুণ্ডযুগ-লের আবির্ভাব হেতু "এহ হয়" বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ দর্শনানন্দে শ্রীরাধা দ্রবীভূতা হইয়াই শ্রীরাধাকুণ্ড এবং শ্রীরাধা দর্শন

আনন্দে শ্রীকৃষ্ণ দ্রবীভূত হইয়াই শ্রীশ্যামকুণ্ড জীবগণের প্রতি যোগ্য অযোগ্য বিচার গন্ধ শূন্য হইয়া কারুণ্যাতিশয্য প্রদর্শনের নিমিত্ত এবং জীবগণকে স্বকীয় মাধুর্য্য পরাকাষ্ঠা অনুভব করাইবার জন্য শ্রীরাধাগোবিন্দ যেন দ্রবীভূত হইয়া সরসীদ্বয় রূপে পরিণত হইয়াছেন। এই হেতু এই কুণ্ডদ্বয়কে শ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রেমের কুণ্ড বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই কুণ্ডে যাঁহারা নিমগ্ন হন তাঁহারাই ধন্য।

যুগল কিশোরের মধুর রসই কুণ্ডরূপে বিরাজ করিতেছেন এই কুণ্ডে যাঁহারা স্নান করেন তাঁহারা প্রেমে অভিষিক্ত হইয়া থাকেন। এই কুণ্ডের চারিদিকেই সখীগণের ভ্রমর গুঞ্জিত নিকুঞ্জ পুঞ্জ শোভায়মান। সম্প্রতি প্রাকৃতিক দৃশ্য অনুসারে শ্রীরাধা শ্যামকুণ্ডের শোভা বর্ণিত হইতেছেন—শ্রীরাধাকুণ্ডের অগ্নিকোণে শ্রীশ্যামকুণ্ড বিরাজমান। শ্রীশ্যামকুণ্ডের পূর্ব্বে প্রায় তিনদিক্ বেষ্টন করিয়া শ্রীললিতাদি অষ্টসখীর কুণ্ড বিরাজমান। তিন কুণ্ডেই জল নির্গমনের জন্য পরস্পর সঙ্গম বা সেঁতু রহিয়াছে। শ্রীশ্যামকুণ্ডের দক্ষিণতীরে তমালতলায় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর উপবেশন স্থান বিরাজমান। ইহার পশ্চিমে শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক প্রাচীন ছোক্‌রা বৃক্ষের নীচে অবস্থিত। তাহার পশ্চিমে শ্রীশ্যামকুণ্ডের নৈঋতকোণে শ্রীরাধা মদনমোহন জীউর মন্দির, এই মন্দিরের পার্শ্বে সঙ্গমে যাইবার বাম পার্শ্বে শ্রীশ্রীনিতাই গৌর মন্দির শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। ইহার পশ্চিমে ধর্ম্মশালা, তৎপশ্চিমে ও শ্রীরাধা-

কুণ্ডের দক্ষিণতীরে শ্রীরাসমণ্ডলবেদী বর্ত্তমান যাহা রাসবাড়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ। তদ্দক্ষিণে শ্রীরাধা গোপীনাথজীউর শ্রীমন্দির। তাহার বায়ুকোণে শ্রীহনুমানজীর মন্দির তাহার দক্ষিণ শ্রীরাধা-গোকুলানন্দের মন্দির, তাহার দক্ষিণে মণিপুর মহারাজের প্রাচীন মন্দিরে শ্রীগৌরগোপালজীউ শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। শ্রীহনুমানজীর সম্মুখে বাজার ও শ্রীরাধাকুণ্ডের গ্রাম আরম্ভ হইয়া শ্রীকুণ্ডের পশ্চিম দিক্ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। শ্রীহনুমানজীর বায়ুকোণে ও শ্রীরাধাকুণ্ডের নৈঋতকোণে শ্রীকুণ্ডেশ্বর মহাদেব বিরাজমান। শ্রীকুণ্ডেশ্বর মহাদেবের কিছু উত্তরে ও শ্রীরাধাকুণ্ডের পশ্চিম তীরে প্রাচীন বটবৃক্ষ অবস্থিত। এই বৃক্ষের পশ্চিমের নৈঋতকোণে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রাচীন মন্দির, কথিত আছে—শ্রীরাধাকুণ্ডের পঙ্ক উদ্ধার কালে এই শ্রীবিগ্রহ কুণ্ড হইতে প্রকট হইয়াছিলেন। শ্রীপাদ দাস গোস্বামী এই শ্রীবিগ্রহের সেবা ভার ব্রজবাসীর হস্তে সমর্পণ করেন। পরে কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি শ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং বহুকালে উহার জীর্ণতা প্রাপ্ত হইলে রাণা-ঘাটের কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি ঐ মন্দির সংস্কার করিয়া দিয়াছিলেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে মনিপুর মহারাজ শ্রীচূড়াচাঁদ সিংহের অর্থানুকূল্যে শ্রীকুণ্ড পরিক্রমা রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছিল। এই বট বৃক্ষের পশ্চিমে মনিপুর যুবরাজ কুঞ্জ অবস্থিত। বট বৃক্ষের উত্তরে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শ্রীরাধাশ্যামসুন্দর মন্দির

বিরাজমান, তাহার উত্তরে শ্রীশ্রীরাধাদামোদর মন্দির, তাহার উত্তরে শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর স্থান। এখানে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নাটুয়া মূর্ত্তি শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন এবং শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরের পূর্ব্বে ও শ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তরে শ্রীশ্রীজাহ্নবামাতার উপবেশন স্থান ও শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথজীউর মন্দির। তাহার পূর্ব্বে শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ঘেরা ও সমাধি অবস্থিত। ইহার উত্তরদিকে ব্রজানন্দঘেরা অবস্থিত। শ্রীরাধাকুণ্ডের পূর্ব্বতীরে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর ভজন কুটীর, তদ্দক্ষিণে শ্রীরাধাশ্যামকুণ্ডদ্বয়ের সঙ্গমস্থল। শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর পূর্ব্বদিকে ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের উত্তরতীরে শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর ভজন কুটীর। তাহার নৈঋতকোণে শ্রীরঘুনাথভট্ট গোস্বামী, শ্রীদাস গোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর চিতা সমাজ একত্রে অবস্থিত। কথিত আছে—শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরাজেন্দ্র শ্রীকুণ্ডের তীরে মাথুর লীলা শ্রবণ করিয়া এইরূপ অধৈর্য্য হইলেন যে তিনি অবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণকে মথুরা হইতে আনিবার জন্য দ্রুতবেগে উন্মত্তের ন্যায় বাহির হন এবং শ্রীরাধাকুণ্ডের গ্রামের দক্ষিণে অল্পদূর যাইয়াই মানব লীলা সম্বরণ করেন। তথায় জঙ্গল মধ্যে তাঁহার সমাধি অবস্থিত। শ্রীপাদ দাস গোস্বামীর ভজন কুটীরের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভজন কুটীর, তাহার ঈশাণকোণে শ্রীগদাধর চৈতন্য মন্দির, তাহার বায়ুকোণে শ্রীরাধাগোবিন্দজীউ মন্দির, এই মন্দিরের পশ্চিমে বা শ্রীরাধা-

কুণ্ডের ঈশানকোণে একটি রাসবেদী বিরাজমান। শ্রীগোবিন্দ মন্দিরের পার্শ্বে শ্রীগোবর্দ্ধন শীলা যাহা শ্রীগোবর্দ্ধনের জিহ্বা বলিয়া বিখ্যাত।

শ্রীপাদ দাস গোস্বামী সাধারণ কার্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত শ্রীশ্যামকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে একটি কূপ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে যাহা গোপকূয়া বলিয়া পরিচিত। এই গোপ-কূয়া হইতে এই শিলাখণ্ড উত্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীদাস গোস্বামীজীকে এই শিলাখণ্ড শ্রীগোবর্দ্ধনের জিহ্বা বলিয়া স্বপ্নে আদেশ করিলে এই শিলাখণ্ড মহা সমারোহে শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে আনীত হন, পরে মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে একটি ছত্রী প্রস্তুত করিয়া স্থাপন করা হয়। গোপকূয়া হইতে শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা উত্থিত হওয়ায় এই কূয়ার জল সাধারণ কাজে ব্যবহার করা যুক্তি সঙ্গত নহে মনে করিয়া শ্রীদাস গোস্বামী শ্রীললিতা কুণ্ডের পূর্ব্বতীরে একটি কূয়া করাইয়া সেই কূয়ার জল ব্যবহার করিতেন। শ্রীগোবিন্দ মন্দিরের নৈঋতকোণে পঞ্চায়েৎ ঘেরা এবং বায়ুকোণে শ্রীরাধারমণ ও শ্রীরেবতী বলদেবের মন্দির, তাহার উত্তরে নূতন ঘেরা, শ্রীগোবিন্দ মন্দিরের ঈশানকোণে শ্রীজগন্নাথজীউ মন্দির, তাহার দক্ষিণে শ্রীব্রজমোহন জীউর মন্দির, তদ্দক্ষিণে শ্রীরাধা-বল্লভ মন্দির, তাহার অগ্নিকোণে শ্রীমহাদেব বিরাজমান। শ্রীরাধাবল্লভ ও শ্রীকালাচাঁদ মন্দিরের পূর্ব্বভাগে তাড়াশ ভূম্যধিপতির শ্রীরাধাবিনোদ জীউর মন্দির। তাহার অগ্নি-

কোণে নন্দিনী ঘেরা। তাহার অগ্নিকোণে শ্রীজীব গোস্বামীর ভজন কুটীর ও ঘেরা, তাহার অগ্নিকোণে শ্রীললিতা বিহারীর মন্দির, তৎদক্ষিণে ঘন মাধব ঘেরা এবং সম্মুখস্থ আঙ্গিনায় একটি রাসমণ্ডল অবস্থিত, ললিত বিহারী মন্দিরের নৈঋতে মনিপুর রাজার কুঞ্জ ও শ্রীগোবিন্দ মন্দির, পশ্চিমে শ্রীরাধাবিনোদ মন্দির, তাহার নৈঋতে শ্রীগোপকূয়া, তাহার পশ্চিমে ধর্ম্মশালা, তাহার দক্ষিণে শ্রীসীতানাথ মন্দির, সামনে শ্রীললিতাদি অষ্টসখীর কুঞ্জ, তাহার ঈশানে ব্যাসঘেরা, শ্রীসীতানাথের দক্ষিণে শ্রীরাধামাধব মন্দির, তাহার দক্ষিণে শ্রীবনখণ্ডী মহাদেব বিরাজমান। বনখণ্ডী মহাদেবের দক্ষিণ দিক্ পর্য্যন্ত শ্রীললিতা কুণ্ডের সীমা। শ্রীবনখণ্ডী মহাদেবের বায়ুকোণে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দির, ইনিই শ্রীতমালতলার মহাপ্রভু বলিয়া প্রসিদ্ধ।

শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে প্রসিদ্ধ ঘাট যথা—

শ্রীগোবিন্দ ঘাট—ইহা রাধাকুণ্ডের পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী এই ঘাটে স্নান করিবার সময় শ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনলীলা দর্শন করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামীকৃত চাটু পুষ্পাঞ্জলীর "বেণীব্যালাঙ্গনা ফণা" এই শ্লোকের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। এই ঘাট শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর ভজন কুটীর ও শ্রীবঙ্কবিহারী মন্দিরের মধ্যভাগের

পশ্চিম দিশায় অবস্থিত। শ্রীকুণ্ড সংস্কার করাইবার কালে লালাবাবু এই ঘাটের সীমা নিরূপণ করিয়া তিনদিক্ কিঞ্চিৎ উঁচু করিয়া রাখিয়াছেন। যাত্রীকগণের পক্ষে এই ঘাটে স্নান অবশ্য বিধেয়।

শ্রীমানস পাবন ঘাট—এই ঘাট শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর অতিশয় প্রিয় বলিয়া কথিত ইহা শ্রীশ্যামকুণ্ডের বায়ুকোণে অবস্থিত।

শ্রীপঞ্চপাণ্ডব ঘাট—ইহা শ্রীশ্যামকুণ্ডের উত্তরে এবং মানস পাবন ঘাটের পূর্ব্ব সংলগ্ন। এই ঘাটের উপরিস্থ পাঁচটি বৃক্ষ শ্রীদাস গোস্বামীকে পঞ্চপাণ্ডব বলিয়া তাঁহাদের পরিচয় দিয়াছিলেন। কথিত আছে—শ্রীবদ্রীনাথের কৃপাদেশ লাভ করিয়া জনৈক শেঠ শ্রীকুণ্ড যুগলের সংস্কার কার্য্যে নিযুক্ত হইলে, সেই সময় শ্রীশ্যামকুণ্ডের ন্যায় চতুঃকোণ সমান করিবেন, এইরূপ নিশ্চয় করিলে সেই রাত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বপ্নে শ্রীদাস গোস্বামীকে বলিলেন—মহারাজ বৃক্ষরূপে আমরা পাঁচ ভাই শ্রীশ্যামকুণ্ডেরতীরে বাস করিতেছি, আপনি প্রাতঃকালে এই ঘাটে আসিয়া আমাদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন। গোঁসাইজী প্রাতঃকালে তথায় উপনীত হইয়া ক্রমপূর্ব্বক বর্দ্ধমান পাঁচটি বৃক্ষকে অবলোকন করিয়া বৃক্ষ পাঁচটিকে কাটিতে নিষেধ করিলেন। এই পঞ্চ পাণ্ডব ঘাটের উত্তরেই শ্রীপাদ দাস গোস্বামী ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামীদ্বয়ের ভজন কুটীর। শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর ভজন কুটীরের পূর্ব্বভাগে

একটি প্রাচীন ছোক্‌রা বৃক্ষ অবস্থিত ইনি শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীকে কাশী বাসী ব্রাহ্মণ বলিয়া আপন পরিচয় দিয়াছিলেন। এই বৃক্ষ শ্রীগদাধর চৈতন্য মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় রাস্তার উপরি ভাগেই অবস্থিত। কিন্তু মাদৃশজীবের দূরদৃষ্ট বশতঃ বর্ত্তমান সময়ে বহুল বৃক্ষ সাধারণের অদৃশ্য হইতে চলিয়াছেন। পঞ্চপাণ্ডব বৃক্ষের মধ্যে কেবলমাত্র শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজের দর্শন পাওয়া যায়।

শ্রীরাধাবল্লভ ঘাট – ইহা পঞ্চপাণ্ডব ঘাটের পূর্ব্বে ও শ্রীগদাধর চৈতন্য মন্দিরের অগ্নিকোণে অবস্থিত। এই ঘাটের উপরেই শ্রীপাদ হরিবংশ গোস্বামীর উপবেশন স্থান অবস্থিত। তদুত্তরে প্রাচীন শ্রীরাসমণ্ডল অবস্থিত।

শ্রীরাধাবিনোদ ঘাট শ্রীরাধাবল্লভ ঘাটের পূর্ব্বে শ্রীশ্যামকুণ্ডের উত্তরভাগে অবস্থিত। এই ঘাটের উপরে শ্রীমহাদেব বিরাজমান্; তদুত্তরে শ্রীরাধাবিনোদ মন্দির শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন।

নন্দিনীঘেরা ঘাট – শ্রীরাধাবিনোদ ঘাটের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। ঘাটের উত্তরে নন্দিনীঘেরা অবস্থিত। এই ঘেরায় কোন মহাত্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি রাসমণ্ডল বিরাজমান।

শ্রীজীবগোস্বামীর ঘাট নন্দিনী ঘেরার অগ্নিকোণে অবস্থিত। ঘাটের পূর্ব্বদিকে শ্রীজীব গোস্বামীর ভজন কুটীর ও ঘেরা বিরাজমান! এই ঘাট ললিতাকুণ্ড সঙ্গমের উত্তর সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

শ্রীঘনমাধব ঘেরার ঘাট—শ্রীজীব গোস্বামী ঘাটের পূর্ব্ব কোণে এবং গয়া ঘাটের পূর্ব্ব সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই ঘাটের পূর্ব্বভাগে ঘনমাধব ঘেরা বিরাজমান। এই ঘাট ললিতা কুণ্ডের সঙ্গমের পূর্ব্বে অবস্থিত।

শ্রীগয়া ঘাট—নামান্তর মনিপুর রাজার ঘাট। শ্রীশ্যাম কুণ্ডের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। গোপকূয়া হইতে কুণ্ডে যাইবার সময় এই ঘাট পাওয়া যায়, এই ঘাটের উপরেই শ্রীপাদ হরিরাম ব্যাসের ঘেরা। শ্রীগোপকূয়ার পশ্চিমে একটি চবুতরা আছে। কথিত আছে ঐ স্থানে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী আসিয়া উপবেশন করিয়াছিলেন।

শ্রীঅষ্টসখীর ঘাট— গয়া ঘাট ও শ্রীমন্মহাপ্রভু উপবেশন ঘাটের মধ্যভাগে অবস্থিত। এই ঘাট শ্রীশ্যামকুণ্ডের পূর্ব্বে অবস্থিত।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপবেশন ঘাট—শ্রীশ্যামকুণ্ডের দক্ষিণতীরে অবস্থিত। এই ঘাটের উপরিস্থিত তমাল বৃক্ষের তলায় উপবেশন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর আরিট গ্রামবাসী লোকদিগকে কুণ্ডযুগলের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময় কুণ্ডদ্বয় লুপ্ত থাকায় কেহই সন্ধান বলিতে পরিলেন না। অবশেষে শ্রীগৌরসুন্দর নিকটবর্ত্তী দুইটি ধান্য-ক্ষেত্রের অল্পজলে স্নান করিয়া প্রেমপুলকিত অঙ্গে কুণ্ড-যুগলের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন কিছুকাল পরে শ্রীমদ্দাসগোস্বামীর যখন শ্রীকুণ্ডযুগলের সংস্কার করাইবার

বাসনা হইল, তখন শ্রীশ্যামকুণ্ডের চতুর্দিকস্থ প্রাচীন বৃক্ষ সকল স্বপ্নযোগে আপনাদের পরিচয় ও কুণ্ডের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে লাগিলেন। সেই নির্দ্দেশানুসারে যখন শ্রীশ্যাম-কুণ্ডের রজ উঠাইতে আরম্ভ হইল তখন দেখা গেল যেন শ্রীশ্যামকুণ্ডের আকৃতি শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ চরণাকৃতির অনুরূপ প্রকাশ পাইতেছেন। তদ্দৃষ্টে শ্রীদাস গোস্বামী ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতির মনে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের তরঙ্গ উছলিয়া উঠিল। এদিকে অন্যান্য লোক শ্রীকুণ্ডযুগলের স্থান নির্দ্দেশ লইয়া পরস্পর তর্ক বিতর্ক করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সন্দেহ আর অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারিল না। কারণ কুণ্ডের রজ উঠাইবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপ-বেশন স্থানের সম্মুখেই শ্রীবজ্রনাভ কৃত পাঁচ হাজার বৎসরের প্রাচীন কুণ্ড প্রকট হইয়া পড়িলেন। শ্রীবজ্রনাভ মথুরার সিংহাসনে উপবেশন করিয়া গালব্য মুনিকে সঙ্গে লইয়া যখন পিতামহ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ব্রজমণ্ডলের লীলাস্থল গুলির সংস্কার কল্পে ব্রতী হইয়াছিলেন, তখন তিনি এই আরিট গ্রামে আসিয়া অরিষ্টাসুর বধের স্থানের উপর আপন নামা-নুসারে একটি কুণ্ড নির্ম্মাণ করেন। সম্প্রতি শ্রীশ্যামকুণ্ডের মধ্যভাগে শ্রীবজ্রনাভ কুণ্ড বলিয়া এই কুণ্ড প্রসিদ্ধ। যখন শ্রীবজ্রকুণ্ড প্রকট হইলেন, তখন শ্রীকুণ্ড যুগলের স্থান নির্দ্দেশ লইয়া আর কাহারও কোন সন্দেহ রহিল না। তখনই নানা দিক্ দেশ হইতে অসংখ্য যাত্রীক আসিয়া কুণ্ড যুগলে স্নান

করিয়া কৃতার্থ হইতে লাগিলেন।

শ্রীপাশাখেলা ঘাট ইহা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু উপবেশন ঘাটের পশ্চিম এবং শ্রীশ্যামকুণ্ডের দক্ষিণতীরে অবস্থিত। বর্ত্তমানে শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক এই ঘাটে অবস্থিত। এখানে শ্রীচিন্তাহরণ মহাদেব বিরাজমান আছেন। যাহারা শ্রীকুণ্ডে স্নান করতঃ শ্রীচিন্তাহরণ বাবাকে দর্শন করে তাহাদের সকল চিন্তা দূর হয়। এই ঘাটের উপরে একটি প্রাচীন ছোক্‌রা বৃক্ষ আছে। এই ঘাটের ও শ্রীমদনমোহন মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটি গোঘাট অবস্থিত।

শ্রীমদনমোহন ঘাট – শ্রীশ্যামকুণ্ডের নৈঋতকোণে এবং শ্রীরাধাকুণ্ডের দক্ষিণপূর্ব্বতীরে এই ঘাট অবস্থিত। ঘাটের দক্ষিণ তীরে শ্রীমদনমোহন মন্দির বিরাজমান।

শ্রীযুগল সঙ্গম ঘাট – শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের সন্ধিস্থলে অবস্থিত। প্রথমে শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান করিয়া তদনন্তর শ্রীশ্যামকুণ্ডে স্নান করিতে হয়। এই সঙ্গম ঘাটের উপরিস্থ প্রাচীন তমালবৃক্ষ শ্রীকুণ্ড সংস্কারের সময় লালাবাবুকে স্বপ্নযোগে অগস্ত্য ঋষি বলিয়া আপন পরিচয় দিয়াছিলেন।

শ্রীরাসবাড়ী ঘাট—শ্রীরাধাকুণ্ডের দক্ষিণতীরে অবস্থিত, এই ঘাটের দক্ষিণভাগে প্রাচীন শ্রীরাসমণ্ডল অবস্থিত। এই রাস বেদীর নামানুসারে রাসবাড়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইস্থানে অভিজ্ঞ রসজ্ঞ ভজনবিজ্ঞ মহাপুরুষ শ্রীপাদ তিন কড়ি গোস্বামী মহোদয় কিছুদিন ভজন করিয়াছিলেন। অদ্যাপিও তাঁহার ভজন

স্থলটি তাঁহার চরণানুচর সেবক বৃন্দ সুরক্ষিত রাখিয়াছেন। মহানুভব গোস্বামী জীব এই ভজনস্থল দর্শনীয়। রাসবাড়ী ও শ্রীহনুমানজী মন্দিরের মধ্যভাগে একটি গোঘাট অবস্থিত।

শ্রীঝুলন বটের ঘাট—শ্রীরাধাকুণ্ডের পশ্চিমতীরে অবস্থিত। এই ঘাটের উপরিভাগে অতি প্রাচীন বটবৃক্ষ বিরাজমান। প্রতিবৎসর জলকেলি উৎসবের পরদিন এই বৃক্ষের ডালে গ্রামস্থ ব্রজগোপীগণ মহাসমারোহে ঝুলনলীলার অভিনয় করিয়া থাকেন। এই ঘাটের অপর নাম শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের ঘাট বলিয়া কথিত।

শ্রীজাহ্নবা ঘাট- ইহা শ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তরে অবস্থিত। শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবা মাতা শ্রীকুণ্ড দর্শন করিতে আসিয়া এই স্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন এবং শ্রীকুণ্ডের যে স্থানে স্নান করিয়াছিলেন সেই অবধি এই ঘাট শ্রীজাহ্নবা ঘাট বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঘাটের উপরেই শ্রীজাহ্নবা মাতার বৈঠক এবং ঘাটেরউপরিস্থ শ্রীমন্দিরে শ্রীগোপীনাথের বামপার্শ্বে বিরাজ মানা থাকিয়া শোভা বিস্তার করিতেছেন। মন্দিরের পশ্চিমে গোঘাট।

শ্রীবজ্রনাভ কুণ্ড- ইহা শ্রীশ্যামকুণ্ডের মধ্যভাগে অব-স্থিত। শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র শ্রীবজ্রনাভ অরিষ্টাসুরের বধের স্থানে আপন নামানুসারে য কুণ্ড নির্ম্মান করিয়াছিলেন, সেই কুণ্ড বজ্রনাভ কুণ্ড বলিয়া প্রসিদ্ধ

শ্রীভানুখোর—শ্রীরাধাকুণ্ড গ্রামের উত্তরে অবস্থিত।

শ্রীগোবর্দ্ধন উৎসবের সময় এই স্থানে শ্রীবৃষভানু মহারাজ শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার দক্ষিণে একটি রাসমণ্ডল শোভা পাইতেছেন।

শ্রীবলরাম কুণ্ড—ইহা ভানুখোরের ঈশানকোণে অবস্থিত, শঙ্খচূড় বধের দিবসে শ্রীপৌর্ণমাসী দেবীর আদেশ ক্রমে বিজয়াদি সখাগণের সহিত শ্রীবলরাম এখানে অবস্থান করিতেছিলেন, কুণ্ডের দক্ষিণ তীরে দুইটি মনোরম কদম্ববৃক্ষ বিরাজমান।

শ্রীললিতা কুণ্ড—শ্রীবলরাম কুণ্ডের দক্ষিণ এবং শ্রীশ্যাম কুণ্ডের উত্তরভাগে অবস্থিত। এই কুণ্ডের মধ্যে অষ্টসখীর কুণ্ড বিরাজমান। এই অষ্টকুণ্ড একত্রে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে শ্রীশ্যাম-কুণ্ডের তিনদিকে অবস্থিত

শ্রীলগমোহনকুণ্ড- শ্রীরাধাকুণ্ডের একমাইল পূর্ব্বে এই কুণ্ড বিরাজিত। এই কুণ্ডের চতুর্দিকে কদম্ববৃক্ষের কানন উত্তর দিক অভিমুখে বিস্তৃত অবস্থায় শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। সর্ব্বসাধারণ এই কাননকে শ্রীরাধাবাগ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। কথিত আছে—এই কুণ্ডের পশ্চিম তীর হইতে শঙ্খ চূড় শ্রীরাধাকে হরণ করিয়া উত্তর দিক অভিমুখে পলায়ন করিতেছিল ও অনতি বিলম্বে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বিনাশ হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খচূড়ের মস্তকমণি অগ্রজ শ্রীবলরামকে অর্পণ করিলে শ্রীবলরাম মধুমঙ্গলের দ্বারা উহা শ্রীরাধিকাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। কুণ্ডের পশ্চিম তীরে এখনও একটি মৃত্তিকাস্তূপ

রহিয়াছে; যাহার উপরে কোন তৃণাদি উৎপন্ন হয় না। সেই স্তূপের উপর শ্রীরাধিকা উপবেশন করিয়াছিলেন। কুণ্ডের পূর্ব্বভাগে আরও একটি উচ্চ স্তূপ রহিয়াছে শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামী উহার উপরে বসিয়া ভজন করিতেন। অবশেষে শ্রীসনাতন গোস্বামীর আদেশে শ্রীকুণ্ডের ভজন কুটীরে আসিয়া বাস করেন।

শিবাখোর—শ্রীরাধাকুণ্ড এবং গ্রামের পশ্চিমভাগে ইহা অবস্থিত; কথিত আছে—এক সময়ে এক শৃগাল জলপান করিবার জন্য এখানে উপনীত হইলে ব্রজবাসী বালকগণ খেলিতে খেলিতে তাহাকে যষ্টিদ্বারা প্রহার করিতে থাকিলে শৃগালী প্রাণ রক্ষার জন্য চারিদিকে ছুটিতে ছুটিতে এই শিবা খোরের একটি গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিল। বালকগণ তাহা দেখিতে পাইয়া কাষ্ঠ তৃণাদি আনিয়া গহ্বরের মুখে আগুন লাগাইয়া দিলে শৃগালী নিরুপায় হইয়া অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত হইয়া বাহিরে আসিতেই মৃত্যুবরণ করিল। সেইকালে শ্রীভানুনন্দিনী সখীগণের সহিত মধ্যাহ্ন লীলায় সূর্য্যপূজার নিমিত্ত শ্রীরাধাকুণ্ডে আসিতেছেন। কোন সখী শৃগালীর ঐ প্রকার দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রাণেশ্বরীর নিকট নিবেদন করিলেন শুনিবা মাত্রই স্বামিনীর হৃদয় করুণায় বিগলিত হইল, তিনি গদ্‌গদস্বরে বলিলেন—"অহো! আমার কুণ্ডের নিকট শৃগালী এতদুঃখে মরণ বরণ করিতেছে তাহাকে শীঘ্রই আমার নিকট নিয়ে এস"। সখীগণ তখন শৃগালীকে সেবাযোগ্য সখীস্বরূপ

দান করিয়া স্বামিনীর নিকট আনিলেন, তিনি স্বামিনীকে দর্শন করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে লুণ্ঠিত হইয়া ব্যাকুলভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীস্বামিনীজীউ অতি প্রীতির সহিত তাঁহার মস্তকে কর কমল অর্পণ করতঃ সুমধুর বাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া স্বীয় সেবা প্রদানে কৃতার্থ করিলেন। সেই অবধি শ্রীরাধাকুণ্ডের যে কোন জনের মৃত্যু হইলে এইস্থানে লইয়া চিতায় উঠান হয়। কুণ্ডের উত্তরে শ্রীমহাদেব বিরাজমান।

মাল্যহার নামান্তর মালীহারী কুণ্ড—ইহা শিবাখোরের উত্তরে অবস্থিত। দীপাবলী পর্ব্ব উপলক্ষ্যে শ্রীরাধিকা এই স্থানে উপবেশন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত মুক্তাহার রচনা করিয়াছিলেন। সেই হেতু এই কুণ্ডের নাম মাল্যহার কুণ্ড। এই কুণ্ডের পশ্চিমে শ্রীমহিমেশ্বর মহাদেব বিরাজমান।

শ্রীকুসুম সরোবর—ইহা শ্রীরাধাকুণ্ডের দেড়মাইল দক্ষিণ কিঞ্চিৎ পশ্চিমে অবস্থিত জলজ ও স্থলজ কুসুম সমূহের আকর স্বরূপ এই হেতু কুসুমসরোবর নাম। কুসুম চয়ন ছলে শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্য মিলন স্থল। এই সরোবরে শ্রীনারদ ঋষি স্নানমাত্র গোপীস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সরোবরের পশ্চিম তীরে শ্রীবলদেবজীউর দুইটি মন্দির উত্তর এবং দক্ষিণ ভাবে অবস্থিত। সরোবরের নৈঋতকোণে শ্রীউদ্ধবজীর মন্দির বিরাজমান। এই মন্দিরের বায়ুকোণে এবং সরোবরের পশ্চিম ভাগে শ্রীউদ্ধব কুণ্ড অবস্থিত। এইস্থানে উদ্ধব মহাশয় শ্রীবজ্রনাভ ও দ্বারকা মহিষীগণকে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন

করাইয়াছিলেন কথিত আছে—শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধানের পর দ্বারকা মহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণ বিরহে ব্যাকুল হইয়া মথুরায় আগমন করতঃ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়া যমুনাকে আনন্দোৎফুল্লা দেখিয়া মৎসরতা বশতঃ বলিল হে কালিন্দি! আমরা যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া তেমন তুমিও তাঁহার প্রিয়া, তাঁহার বিরহে আমরা যেরূপ ব্যথিতা, কিন্তু তুমিতো তদ্রূপ ব্যথিতা নও, ইহার কারণ কি আমাদিগকে বল? তখন কালিন্দী হাঁসিতে হাঁসিতে বলিল আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের আত্মা শ্রীরাধিকা আমি তাঁহার দাসী, তাঁহারই দাস্য প্রভাবে বিরহ বেদনা আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তোমাদের তাঁহার সহিত কখনও বিচ্ছেদ নাই, কিন্তু ব্যাকুলতা বশতঃ তাহা তোমাদের অজ্ঞাত। অক্রুরের আগমনে গোপীগণের এইরূপ বিরহ দেখাদিয়াছিল কিন্তু উদ্ধবের সান্ত্বনায় তাঁহাদের তাহা প্রশমিত হইয়াছিল। উদ্ধবের সহিত যদি তোমাদের কোনরূপে সাক্ষাৎ হয়, তবে নিঃসন্দেহে প্রাণকান্তের সহিত নিত্য বিহার লাভ করিবে। তৎশ্রবণে মহিষীগণ বলিল সখি! তুমিই ধন্যা, কেননা প্রিয়তমের সহিত তোমার কখনও বিচ্ছেদ নাই তবে যাহা হইতে তোমার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে আমরাও সেই ভানুনন্দিনীর দাসী হইব। অতএব এক্ষণে উদ্ধবের দর্শন কিরূপে হইবে, আমাদিগকে সেই উপায় বলিয়া দাও। কালিন্দী বলিল—এক্ষণে উদ্ধব গোপীগণের চরণরজ লাভ কামনায় গুল্মলতার রূপ ধরিয়া গোবর্দ্ধনের সন্নিকটে নিবাস করিতেছে। সুতরাং তোমরা বজ্রনাভকে সঙ্গে লইয়া কুসুম

সরোবরে গমন কর এবং বীণা বেণু মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যাদি সহকারে কৃষ্ণ ভক্ত গণের দ্বারা তথায় উৎসব আরম্ভ করিলে ঐ উৎসবে নিশ্চয় উদ্ধবের সাক্ষাৎকার হইবে। ইহা শুনিয়া মহিষীগণ কালিন্দীকে অভিবাদন করিয়া বজ্রনাভ ও পরীক্ষিতের নিকট গমন করিয়া শ্রুত বৃতান্ত বর্ণন করিলে মহারাজ পরীক্ষিত আনন্দে তাঁহাদের সহিত গোবর্দ্ধনের অনতিদূরে সখীস্থলীর নিকট আগমন করিলেন এবং সঙ্কীর্ত্তনোৎসব আরম্ভ করিলেন। সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে সকলে উদ্ধব দর্শনের নিমিত্ত সাতিশয় তন্ময়তা লাভ করিল, তখন সকলের সমক্ষে তৃণগুল্মলতা হইতে পীতাম্বরধারী বনমালায় বিভূষিত শ্যামকান্তি শ্রীমদুদ্ধব মহাশয় আবির্ভূত হইয়া গোপীজন বল্লভের গুণগান করিতে করিতে সংকীর্ত্তনের নিকট গমনে সঙ্কীর্ত্তনোৎসব পরম শোভিত হইল। তখন স্ফুটিক-মণিতে চন্দ্রকিরণ সম্পাতে যেরূপ শোভা ধারণ করে, তদ্রূপ উদ্ধবের আগমনে সকলে আনন্দে নিমগ্ন হইয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলেন। অল্পক্ষণে সংজ্ঞা লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সদৃশ রূপবান উদ্ধবকে দর্শন করিয়া তাঁহার পূজাবিধানে সকলের মনোরথ পূর্ণ হইল। শ্রীউদ্ধব তাঁহাদের সকলকে যথাযোগ্য সৎকার ও আলিঙ্গনাদি করিয়া পরীক্ষিতকে বলিলেন হে রাজন্! তুমি ধন্য, শ্রীকৃষ্ণভক্তিতে তুমি পূর্ণ মনোরথ, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনে তোমার চিত্ত সবিশেষ নিমজ্জিত এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়া ও শ্রীবজ্রনাভের প্রতি তোমার যে অতুলনীয়া প্রীতি

ইহাও অতি সৌভাগ্যের বিষয়! হে তাত। ইহা তোমার উচিতই হইয়াছে, কারণ শ্রীকৃষ্ণই তোমার এই অঙ্গবৈভব প্রদান করিয়াছিলেন। অপর দ্বারকা মহিষীগণের মধ্যে ইঁহারাই ধন্যা, শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাদিগকে ব্রজ বাসের জন্য অর্জ্জুনকে আদেশ করিয়াছিলেন। ষোড়শকলা পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ হইতে সহস্র সহস্র চিন্ময় কিরণ কণা চতুর্দ্দিকে বিস্ফুরিত হইতেছে, ষোড়শ কলান্বিত পূর্ণচন্দ্র স্বরূপে তিনি ব্রজভূমিকে সতত উদ্ভাষিত করিতেছেন। হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ চরণে বজ্রনাভের স্থান, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া প্রভাবে নিজ নিজ স্বরূপ ভুলিয়া দুঃখানুভব করিতেছেন। হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ ব্যতীত স্বরূপের অনুভূতি হয় না, শ্রীভগবান্ অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে যখন নিজ মায়া অপসারিত করিবেন, তখন সকলে তাঁহার দর্শন লাভ করিবে। কিন্তু সম্প্রতি সেই সময় অতীত হইয়াছে, অতএব অন্য উপায় শ্রবণ কর, শ্রীভগবানের অপ্রকটকালে শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ হইবে, ভক্তগণ যখন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ বা শ্রবণ করেন তথায় শ্রীভগবান্ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। যেস্থানে শ্রীমদ্ভাগবতের একটি অথবা অর্দ্ধশ্লোক পাঠ হয়, তথায় শ্রীভগবান্ নিজ প্রেয়সীগণের সহিত বিরাজ করেন। ভারতভূমিতে জন্মলাভ করিয়া যাহারা শ্রীভাগবত শ্রবণ না করে, তাহারা নিজ হস্তে নিজেকে হত্যা করে, আর যিনি প্রতিদিন শ্রীভাগবত শ্রবণ করেন, তিনি পিতা, মাতা ও পত্নীর কুলকে উদ্ধার

করিয়া থাকেন। শ্রীভাগবত শ্রবণ ও পাঠে ব্রাহ্মণের বিদ্যার প্রকাশ, ক্ষত্রিয়ের শত্রু জয়, বৈশ্যের ধন লাভ, শূদ্রের আরোগ্য লাভ এবং স্ত্রী ও অন্ত্য জজাতির সর্ব্বাভিলাষ পূর্ণ হয়, অতএব ভাগ্যবান্ কোন্ ব্যক্তি নিত্য শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা না করিবে বহু জন্মের সাধনে সিদ্ধ দশায় মানব শ্রীমদ্ভাগবত লাভ করেন, শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ভগবদ্ভক্তি এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ হইয়া থাকেন। পুরাকালে সাংখ্যায়ন ঋষির কৃপায় বৃহস্পতি প্রথমে আমাকে শ্রীমদ্ভাগবত দিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া বৈষ্ণবীয় রীতি অনুসারে একমাস যাবৎ শ্রীমদ্ভাগবত আস্বাদন করি তার ফলে আমি কৃষ্ণের প্রিয়তম সখা হইয়াছি। তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমাকে ব্রজ-মণ্ডলে বিরহ সন্তপ্তা গোপীগণের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। গোপীগণ শ্রীমদ্ভাগবত কথা স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে ধারণ করিয়া বিরহ বেদনা বিমুক্ত হইয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাকে শ্রীমদ্ভাগবত রহস্য প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ উপদেশে বদরিকাশ্রমে গমন করিয়া সিদ্ধিলাভ করতঃ আমি ব্রজের এই লতাসমূহে বাস করিতেছি হে রাজন্! শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ভক্তগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ হইয়া থাকে, অতএব আমি ইহাঁদের নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিব, কিন্তু একার্য্যে তোমার সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। তখন পরীক্ষিত মহারাজ উদ্ধবকে প্রণাম করিয়া বলিল—হে হরিদাস আপনি নিশ্চিন্তমনে শ্রীভাগবতী কথা কীর্ত্তন করুন এবং

আমাকে আজ্ঞা করুন আমি আপনার সাহায্য করিব। উদ্ধব বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ ধরাধাম পরিত্যাগ করায় বলবান কলি শুভকার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে সুতরাং তুমি দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া কলির নিগ্রহ কর, আর আমি বৈষ্ণবীয় রীতিতে একমাসে শ্রীভাগবতরস আস্বাদন করাইয়া ইঁহাদিগকে প্রভুর নিত্যধাম প্রাপ্তি করাইব। ইহা শুনিয়া শ্রীপরীক্ষিত ব্যাকুল হইয়া নিজ অভিলাষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন হে তাত! আপনার আজ্ঞানুসারে আমি অবশ্যই কলি নিগ্রহ করিব, কিন্তু আমার ভাগ্যে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ কি প্রকারে সম্ভব হইবে? উদ্ধব বলিলেন হে রাজন্! এবিষয়ে তোমার চিন্তার কোন প্রয়োজন নাই। কেননা শ্রীমদ্ভাগবতী কথা শ্রবণে তুমিই একমাত্র অধিকারী। তোমাকে শ্রীশুকদেব শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করাইবেন। তোমা হইতেই পৃথিবীতে শ্রীভাগবতী কথা প্রচার হইবে। অতএব হে রাজন্! তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া কলি নিগ্রহের আয়োজন কর। উদ্ধবের বাক্যে পরীক্ষিত মহারাজ তাঁহাকে পরিক্রমা ও প্রণামাদি করিয়া কলি নিগ্রহে বহির্গত হইলেন। এদিকে শ্রীবজ্রনাভ স্বীয়পুত্র প্রতি বাহুকে মথুরার রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া মাতৃগণের সমভিব্যহারে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের অভিলাষে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর উদ্ধব মহাশয় এইস্থানে একমাস যাবৎ শ্রীমদ্ভাগবতী কথার রস আস্বাদন করাইলেন এবং কথারসাস্বাদন সময়ে সর্ব্বত্র শ্রীভগবানের লীলা প্রকাশ হইতে লাগিল এবং শ্রীকৃষ্ণ

তথায় আবির্ভূত হইলেন। তখন শ্রোতৃবৃন্দ সকলে নিজ স্বরূপকে শ্রীভগবল্লীলার মধ্যে দেখিতে পাইলেন। শ্রীবজ্রনাভও নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণচরণে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিরহ বিমুক্ত হইলেন এবং মাতৃগণও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কলা ও প্রভারূপে আপনাদিগকে অবস্থিতা দেখিয়া বিস্মৃত ও প্রিয়তমের বিরহ-ব্যাধি মুক্ত হইয়া নিত্যধাম প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তথায় অন্য যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারাও সকলে তৎক্ষণাৎ ব্যবহারিক লোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন অর্থাৎ নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্যই বৃন্দারণ্যে পরমানন্দে বিহার পরায়ণ হইলেন। এইস্থানেই শ্রীউদ্ধব মহাশয় পুরমহিষীগণের নিকট শ্রীব্রজমণ্ডলের মহিমা কীর্ত্তন এবং শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব বাল্যচরিত বর্ণনে তাঁহাদিগকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিলেন তাহাবর্ণিত হইল

শ্রীনারদ কুণ্ড—ইহা কুসুম সরোবরের অগ্নিকোণে অবস্থিত। শ্রীবৃন্দাদেবীর উপদেশ ক্রমে শ্রীনারদজী এখানে তপস্যা করিয়া সপরিকর শ্রীরাধাগোবিন্দের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে—একদা শ্রীনারদ শ্রীরাধাগোবিন্দের মানসী সেবা লাভের অভিলাষে শ্রীমহাদেবের সমীপে গমন করিয়া স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ করিলে শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে দেবর্ষে! শ্রীগোবিন্দের অষ্টকালীয় লীলাবলী আমিও সবিস্তার জানি না। শ্রীকেশী তীর্থের সন্নিধানে সতত শ্রীকৃষ্ণের দাসী অভিমানে নিত্য সখীসঙ্গে অবস্থিতা শ্রীবৃন্দাদেবীই সবিস্তার অবগত আছেন। অতএব তুমি তাঁহার নিকট গমন

করিলে তিনিই তোমাকে বিস্তার রূপে জানাইবেন। শ্রীমহাদেবের আদেশে দেবর্ষি নারদ শ্রীবৃন্দাদেবীর নিকটে আগমন করিয়া নিবেদন করিলে শ্রীবৃন্দাদেবী বলিলেন—হে দেবর্ষে! এই লীলা কেশশেষাদিরও অগম্য অতি গোপনীয়, আপনি কিন্তু এই লীলা সর্ব্বত্র প্রচার করিবেন না। শ্রীবৃন্দাদেবীর নিকট হইতে শ্রীগোবিন্দের নিশান্ত হইতে নক্তলীলা পর্য্যন্ত শ্রবণে কৃতার্থ হইয়া নারদ বলিলেন—দেবি! আপনি কৃপা করিয়া বলুন এই লীলার দর্শন লাভ কিরূপে হইবে? শ্রীবৃন্দাদেবী বলিলেন—হে দেবর্ষে! যদি কোন ভাগ্যবান্ রাগানুমার্গে গোপী আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণ সুখৈক তাৎপর্য্যময়ী সেবালালসায় দিবারাত্র প্রার্থনায় নিমগ্ন হন তিনি অতি শীঘ্র সেবাযোগ্য স্বরূপ লাভ করিয়া সেবা রসে নিমগ্ন হইতে পারেন! শ্রীবৃন্দাদেবীর শ্রীমুখের আদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রণামাদি করিয়া সানন্দে ব্রজে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীগোবর্দ্ধনে আসিয়া উপনীত হইলে মনে বিচার করিলেন—শ্রীহরিদাস বর্য্য এই শ্রীগোবর্দ্ধনের শ্রীচরণ আশ্রয় ব্যতীত সাধন করিলেও তাহা অতি শীঘ্র ফলবতী হইবে না। অতএব আমি এই নির্জ্জন কুণ্ডতীরে নিবাস করিয়া আমার অভীষ্ট সাধন করিব। তখন শ্রীনারদ দর্শনোৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হইয়া হে নন্দনন্দন! হে ভক্ত চন্দন! ইত্যাদি নামাবলীর উচ্চস্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে অতি অল্পদিনেই সেবাযোগ্য স্বরূপ লাভ করিয়া সপরিকর শ্রীগোবিন্দের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিলেন। এই

কুণ্ডের পশ্চিম তীরে শ্রীনারদজীর প্রতিমূর্ত্তি দর্শনীয়।

শ্রীরত্নসিংহাসন—ইহা কুসুমসরোবরের সম্মুখে অবস্থিত, এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ মণির সহিত শঙ্খচূড়ের প্রাণ অপহরণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে—একদিন হোলীর সময় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সহিত গিরিরাজ তটে রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিয়া সখীগণের সহিত বিবিধ হাস্য পরিহাস করিতেছিলেন। এমন সময় শ্রীমুখরা নিজ নাতনী শ্রীরাধিকাকে খুঁজিতে খুঁজিতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ এক নিবিড় কুঞ্জ মধ্যে লুকাইয়া গেলেন। সেইকালে কংসপ্রেরিত এক যক্ষ শ্রীকৃষ্ণ বিনাশ অভিপ্রায়ে গিরিরাজ তটে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া প্রতিহিংসা চরিতার্থের নিমিত্ত ললিতাদির দ্বারা রত্নসিংহাসনে সেবিত শ্রীরাধিকাকে সিংহাসনের সহিত মস্তকে লইয়া মথুরার মার্গে সজোরে ছুটিতে থাকিলে শ্রীললিতা, কুন্দলতা, প্রভৃতি সকলে ব্যাকুল হইয়া হে কৃষ্ণ! তুমি কোথায় শীঘ্র আমাদিগকে রক্ষা কর, তাহাদের এই হাহাকার রব শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মুখরাদি সকলকে আশ্বাস প্রদাদ করিয়া বলিলেন আর্য্যে! কোন চিন্তা নাই, আমি এখনই কিশোরীজীউকে আনিতেছি, মুখরা বলিলেন হে চন্দ্রমুখ! তোমার সর্ব্বদা জয় হোক। তখন শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খচূড়কে লক্ষ্য করিয়া সগর্ব্বে বলিলেন—রে দুষ্ট! ক্ষণেক তিষ্ঠ, এই বলিয়া সবেগে তাহার নিকটে উপস্থিত হইলে তখন শঙ্খচূড় পলাইতে না পারিয়া সসিংহাসন শ্রীরাধিকাকে নামাইয়া

শ্রীকৃষ্ণের সহিত তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। দূর হইতে এই দৃশ্য অবলোকন করিয়া অনিষ্ট শঙ্কিনী বন্ধু হৃদয়া সখীগণের নানা প্রকার শঙ্কার উদয় হইল; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দেখিতে দেখিতে এক মুষ্টি প্রহারে শঙ্খচূড়ের মণি সহ প্রাণ অপহরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মণিকে বলদেবের হস্তে প্রদান করিলে তিনি মধুমঙ্গলের দ্বারা শ্রীরাধিকার নিমিত্ত পাঠাইয়া দিলেন। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ আনন্দিত হইয়া বলিলেন কৌস্তুভের কুটুম্ব তথা মণি সমূহের শ্রেষ্ঠ অত্যুজ্জ্বল এই মণি শ্রীরাধিকারই ধারণ করিবার যোগ্য। তখন শ্রীললিতাদি সখীগণ স্বামিনীজীউর কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন সকলে সেই শোভা দর্শন করিয়া অনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

গোয়াল পুকুর বা গোয়াল কুণ্ড—ইহার বর্ত্তমান নাম গোয়াল পোখরা—ইহা রত্ন সিংহাসনের দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে মধুমঙ্গলের নিকট হইতে সখাগণ সূর্য্য পূজার নৈবেদ্য লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। একদিন অপরাহ্নে শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গল ও সুবল সূর্য্যকুণ্ড হইতে সূর্য্যপূজা শেষ করিয়া সখাগণের নিকট গোবর্দ্ধন আগমন করিলে, সখাগণ তৃষিত চাতকের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করিল কেহ বা আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন ভাই কানাই! তুই এত দেরি করলি! আমরা যে তোর বিয়োগ সহিতে নারি। আমরা তোমাকে খুঁজিবার জন্য গমনোদ্যত হয়েছি ভাগ্য আমাদের, তুমি ক্ষণার্দ্ধের মধ্যে আমাদের ভিতরে উপস্থিত হয়েছ। এইরূপ বলিতে বলিতে কেহ শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন, কেহ প্রহেলী, কেহবা রহস্য, প্রভৃতি দ্বারা

শ্রীরাম ও শ্রীকৃকে হাঁসাইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে চুরির ধন যেমন অতি গোপনে রাখা হয় তদ্রূপ মধুমঙ্গল স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্রে সূর্য্যপূজার নৈবেদ্য গোপন করিতে থাকিলে শ্রীবলদেব মধুমঙ্গলকে কহিলেন ওহে! বটো! তোমার উত্তরীয় বস্ত্রে কি বাঁধা আছে। বটু—সূর্য্য নারায়ণের নৈবেদ্য। শ্রীবলদেব—কোথায় পাইলে? বটু—যজমানের নিকট, সমস্ত ব্রজবাসীর আজ সূর্য্যপূজার দিন ছিল। বলদেব—ইহাতে কি আছে অল্প একটু খুলে দেখাও। বটু—না, হবে না। তুমি ও তোমার সখাগণ মহা লোভী, বলদেব—সখাদের অল্প অল্প ভাগ করে দেও এবং তুমিও কিছু খাও। বটু—আমার কাহাকেও দিতে ইচ্ছা নাই, নিজেও খাইবার ইচ্ছা নাই। বলদেব—তুমি যদি আমার সখাগণকে না দাও তাহালে জোর করিয়া তোমার কাছ থেকে কাড়িয়া খাইব বটু—তোমার সখাগণকে আমি তৃণ তুল্যও মনে করি না, তোমাকেও তৃণ তুল্য মানি না। এই কথা বলিতে বালকগণ বলদেবের ইঙ্গিতে বিনয় ভাবে প্রার্থনা করিলে বটু মৌনভাবে নিজ কক্ষের মধ্যে নৈবেদ্য গোপন করিতে থাকিলে মধুমঙ্গলের পিছন হইতে এক সখা চক্ষুদ্বয় বন্ধ করিল, তখন অপর কোন সখা নৈবেদ্য কাড়িয়া নিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। অপর এক সখা মধুমঙ্গলের কাপড় খুলিয়া দিল, সম্মুখে আসিয়া আর এক সখা কাপড় ধরিয়া টানিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া বটু দৌড়াইতে লাগিলে তখন সখাগণ নিকটে গিয়া কেহ পাগড়ি, কেহ বেণু, কেহ বা

যষ্টি লইয়া গেল। তখন মধুমঙ্গল নিরুপায় হইয়া রোদনের সহিত উচ্চ হাস্য করিয়া ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে তাহাদিগকে তিরস্কার ও অভিশাপ দিতে লাগিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের হাত হইতে যষ্টি নিয়া সকলকে তাড়াইতে লাগিল, কাহার সহিত লাঠালাঠি ও হইল।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে আলিঙ্গন করিয়া সমস্ত সখাগণকে নিবারণ করিলেন ও উত্তরীয়, যষ্টি, বস্ত্র, বেণু, পাগড়ি প্রভৃতি মধুমঙ্গলকে পরাইয়া দিলেন। কিন্তু নিজ উত্তরীয়ে রক্ষিত স্বর্ণাঙ্গুরী না দেখিতে পাইয়া ক্রোধের সহিত অভিশাপ দিতে দিতে বলিলেন—ওরে চঞ্চল বালকগণ! তোরা জোর করিয়া নৈবেদ্য লুঠ করিয়াছিস আর আমার স্বর্ণাঙ্গুরীও চুরি করিয়াছিস, ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিবার জন্য তোরা সর্ব্বদা অপবিত্র। মহাপাপী, তবে সাবধান আজ হইতে তোরা আমাকে স্পর্শ করবি না। আমি তাড়াতাড়ি ব্রজে যাইয়া ব্রজরাজের সভায় বিচার করিয়া তোদের সকলের প্রায়শ্চিত্ত করাইব তারপর তোদের জল গ্রহণ করিব। এই বলিয়া সজোরে চলিতে থাকিলে শ্রীবলদেব পিছন থেকে নিবারণ করিলে বলদেবকে বলিলেন, এই ব্রহ্মস্ব অপহরণের তুমিই কর্ত্তা, অতএব তুমিও যত সময় এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করিবে তত সময় তোমার সহিতও আমার বাক্যালাপ নাই। তখন শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে প্রীতিভরে কাপড় পরাইয়া দিয়া বলিলেন—সখে! সখাদের মধ্যে এইরূপ একটু হইয়াই থাকে, রাগ করিও না। ইতি।

এই গোয়াল পোখরের ঈশানকোণে শ্রীগোবর্দ্ধন শিলাতে শ্রীবলরামের চরণ চিহ্ন ছিল। কিন্তু কিছুদিন হইল জনৈক সাধু ঐ চরণ চিহ্ন স্থানান্তরিত করিয়াছেন।

শ্রীযুগল কুণ্ড—ইহা গোয়াল পোখরার অগ্নিকোণে অবস্থিত। এখানে শ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাস সংঘটিত হইয়া থাকে।

কিল্লল কুণ্ড—ইহা যুগলকুণ্ডের দক্ষিণ কিঞ্চিৎপূর্ব্ব-ভাগে অবস্থিত। কুণ্ডের নিকটবর্ত্তী বনকে খেলন বলা হয়। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ সখাগণের সহিত গেন্দ খেলা করিয়া থাকেন

শ্রীমানসী গঙ্গা—ইহা কুসুম সরোবরের দেড় মাইল দক্ষিণ কিঞ্চিৎ পশ্চিম অংশে অবস্থিত। এই মানস গঙ্গায় শ্রীরাধাগোবিন্দ প্রায়ই নৌকা বিহার করিয়া থকেন। শ্রীগিরি-রাজ গোবর্দ্ধনের উপরি ভাগেই শ্রীমানসীগঙ্গা বিরাজমান কথিত আছে—শ্রীনন্দমহারাজ প্রভৃতি গোপগণ শ্রীযশোদা মাতা প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া একদিন গঙ্গা স্নানের নিমিত্ত যাত্রা করিয়া রাত্রিতে শ্রীগোবর্দ্ধনের উপকণ্ঠে বাস করিতে ছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বিচার করিতেছিলেন—এই ব্রজে সমস্ত তীর্থ বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু ব্রজবাসীগণ এসম্বন্ধে কিছুই অবগত নহে। যাহা হউক আমাকে ইহার সমাধান করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিবামাত্র শ্রীগঙ্গাদেবী মকরবাহিনীরূপে সর্ব্বলোকের নয়ন গোচর

হইলেন। শ্রীগঙ্গাদেবীকে দেখিয়া ব্রজবাসীগণ বিস্মিতভাবে পরস্পর তর্ক বিতর্ক করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসী গণকে বলিতে লাগিলেন এইব্রজে সমস্ত তীর্থই বিরাজমান থাকিয়া ব্রজ মণ্ডলের সেবা করিয়া থাকেন। আপনারা ব্রজের বাহিরে যাইয়া গঙ্গা স্নান করিতে মনস্থ করিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া গঙ্গাদেবী অদ্য আপনাদের সম্মুখেই প্রকট হইয়াছেন। অতএব আপনারা অবিলম্বে গঙ্গাস্নান কার্য্য সম্পাদন করুন। আজ হইতে এই তীর্থ শ্রীমানসী গঙ্গা বলিয়া সর্ব্বসাধারণ সর্ব্বত্র বিদিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণের মন হইতে প্রকট হইয়াছিলেন এই হেতু মানসী গঙ্গা বলিয়া প্রসিদ্ধ। কার্ত্তিকমাসের অমাবশ্যায় এই তীর্থ প্রকট হইয়াছিলেন, এই হেতু প্রতি দীপাবলী পর্ব্বোপলক্ষে মানসী গঙ্গা স্নান ও গোবর্দ্ধন পরিক্রমা মহা আড়ম্বরে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

এই মানসীগঙ্গায় শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণ সঙ্গে নৌকা বিলাস লীলা করিয়াছিলেন। মথুরা নিবাসী বিপ্রগণ গোবিন্দ কুণ্ডে যজ্ঞ আরম্ভ করিলে পৌর্ণমাসী দেবী ব্রজের সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়াছিলেন যে এই যজ্ঞে যাহারা হব্যাদি লইয়া যাইবে, তাহাদের পতি চিরজীবী এবং অসংখ্য গোধন বৃদ্ধি হইবে। তৎশ্রবণে ব্রজের বরীয়সীগণ নিজ নিজ বধূদ্বারা যজ্ঞে হব্যাদি পঠাইয়া দিলেন। এই সুযোগে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন লালসায় শ্রীরাধিকা সখীসঙ্গে গোরস লইয়া যজ্ঞে চলিলেন, এদিকে শ্রীকৃষ্ণ নৌকা লইয়া গঙ্গাতীরের যে ঘাটে নাবিকরূপে অবস্থান

করিতেছেন, গোপীগণ সঙ্গোপনে রাধিকাকে নিয়া সেইঘাটে আসিয়া উপনীতা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ সসখী রাধাকে দেখিয়া সোল্লাসভরে বলিলেন-এস এস রাই ! আমি তোমার জন্য নৌকা কুলে রাখিয়াছি। সসখী শ্রীরাধা হাঁসিতে হাঁসিতে সেই নৌকায় উঠিলে এবং তরীখানি জীর্ণ দেখিয়া বলিল ওহে নাবিক তুমিতো পরম যুবা, কিন্তু তোমার তরনীর এই জীর্ণদশা কেন ? কারণ অযোগ্য বস্তু দেখিলে অন্তরে দুঃখ হয়, আর যোগ্য দেখিলে মনে আনন্দ হয়, তুমি যদি বল তোমার দুঃখ হইলে তাহাতে আমার কি ? তুমি ইহা বলিতে পার, এবং ইহা সত্যই, যাক সে কথা তুমি সত্বর আমাদের পার করে দেও। আমরা যজ্ঞে যাইব, গোপীগণের বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ বলিল তোমাদের কথা অতি সত্য, আমি কেবল যোগ্যের নিমিত্ত আযোগ্য নিয়ে আছি যোগ্য পেলেই এখনই অযোগ্য ত্যাগ করিব। সুতরাং তোমরা যদি দয়াকরে আমাকে যোগ্য তরুণী দেও, তাহলে আমি তাই নিয়েই থাকিব। গোপীগণ হাঁসিতে হাঁসতে শ্রীকৃষ্ণকে বলিল, সকলে তরণী দিয়া পারের কার্য্য করে, আর তুমি তরুণী নিয়ে সেই কার্য্য করিবে ? এমত আশ্চর্য্য কথাতো আমরা কোথাও শুনি নাই, তখন শ্রীকৃষ্ণ হাস্যসহ বলিল শোন ইহা অসম্ভব নয়, কারণ দুজনারই পার করিবার সামর্থ্য আছে, তোমরা আমার কথায় বিচার করিয়া দেখ, তরণী নদীকে পার করে, আর তরুণী সমুদ্রকে পার করিতে পারে, সুতরাং তরণী হইতে তরুণীর শক্তি বহু উর্দ্ধে। শ্রীকৃষ্ণ বাক্যে

গোপীগণ হাঁসিতে হাঁসিতে বলিল গোবিন্দ তুমি অনেক চাতুরীই জান, আর আমরা অবলা গোপবালা তোমার কথা কিছুই বুঝি না, এখন আমাদের পার করে দেও। শ্রীগোবিন্দ গোপীগণ সঙ্গে কৌতুক রসে ক্ষিপ্র গতিতে কেনিপাত করিতে থাকিলে জীর্ণ তরী টলমল করিতে লাগিল। কিয়দন্তর শ্রীগোবিন্দ বৈঠাও ছাড়িয়া দিলেন, নৌকা তখন মাঝপথে বায়ুতে ঘুরিতে থাকিলে ঝলকে ঝলকে নৌকায় জল উঠিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া কম্পিতাঙ্গ গোপীগণ ভয়ে অম্বর সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইল, তৎফলে বক্ষঃস্থলের বসনও বিগলিত হইল। তখন ভীতা গোপীগণ অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে—বলিল গোবিন্দ ! আমাদের গোরস নষ্ট হয় হোক, প্রাণ যায় তাতেও কোন দুঃখ নাই, কিন্তু যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণ কর্ণধার, সেইখানে নৌকাডুবি। ইহা যদি লোকে প্রচার হয় তাহলে ব্রজপুরে তোমার চিরদিনই অখ্যাতি থাকিবে এই বলিয়া সকলে শ্রীগোবিন্দের বদন কমল দেখিতে লাগিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ মন্দ মন্দ হাঁসিতে হাঁসিতে বলিল তোমরা মনে কোন প্রকার চিন্তা করিও না, তোমাদের গব্যাদি অপচয় হইবে না। আমার বহুদিনের বাঞ্ছা যে একত্রে বসিয়া সকলের সর্ব্বাঙ্গ দর্শন করিব, কিন্তু বায়ুরূপ বিধি তোমাদের অম্বর খুলিয়া আজ তাহা অনুকূল করিয়াছে। গোপীগণও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বাক্যালাপে এবং কৌতুক রসের তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে জানিয়া তখন যোগমায়া গঙ্গামধ্যে যুগল কিশোরের বিলাসোচিত

পরম মনোহর স্থান আবির্ভাবিত করিলে অকস্মাৎ নৌকা তথায় গিয়া লাগিল। তাহা দেখিয়া গোপীগণ আনন্দে হাঁসিতে হাঁসিতে অবতরণ করতঃ কুঞ্জে প্রবেশ করিল। তখন শ্রীকৃষ্ণের যাহা মনেছিল তাহা পূর্ণ করিবার অভিলাষে গোপীগণের মধ্য হইতে শ্রীরাধিকার বসন আকর্ষণ করিলে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ স্পর্শে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পূর্ণ হইল, এবং অনন্দাতিশয্যে সাত্ত্বিক ভাবে অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, সময় জানিয়া সখীগণ সঙ্গোপনে থাকিয়া যুগল কিশোরের বিলাস মাধুরী দর্শনে নয়ন মনঃসফল করিলেন। কিয়দন্তর সখীগণ যুগল কিশোরের নিকট আসিয়া নানাবিধ হাসপরিহাস করিতে করিতে নৌকা পার হইলেন।

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন

যৎ পাণিনা পালয়দীশ এব য পালয়ত্তৎ পরিবারমেব।
ক্রীড়ত্যজস্রং স্বয়মেব যত্র স কেন বর্ণ্যো হরিদাসবর্য্যঃ॥

গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের আকৃতি ময়ূরের ন্যায়, শ্রীগোবিন্দ কুণ্ডের দক্ষিণাংশই ইঁহার পুচ্ছ এবং প্রসিদ্ধ মানস গঙ্গাই ইহার গণ্ডস্থলী। শ্রীকুসুম সরোবর যাঁহার মুখস্বরূপ এবং শ্রীরাধা গোবিন্দের প্রেমপূর্ণ প্রসিদ্ধ শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড যাঁহার নয়নদ্বয় স্বরূপ। দান নিবর্ত্তন কুণ্ড, সঙ্কর্ষণ কুণ্ড ও দানঘাটী প্রভৃতি লীলাস্থলী যাঁহার চতুর্দ্দিকে শোভায়মান। স্বয়ং ভগবান নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে বামকরে সপ্তাহকাল

ধারণ করতঃ ইন্দ্রকৃত অতি বৃষ্টি হইতে পরিবার বর্গকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং স্বয়ংও যথায় নিরন্তর ক্রীড়া করিয়া থাকেন। সেই হরিদাসবর্য্য গোবর্দ্ধনের মহিমা কে বর্ণন করিতে সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণ লীলাস্থলীর মধ্যে শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন বিশেষ প্রসিদ্ধ। শ্রীব্রজ মণ্ডলে তিনটি পর্ব্বত প্রসিদ্ধ যথা—শ্রীবর্ষাণ, শ্রীনন্দীশ্বর ও শ্রীগোবর্দ্ধন ইহারা যথাক্রমে শ্রীব্রহ্মা, শ্রীরুদ্র, ও শ্রীবিষ্ণুর অভিন্ন স্বরূপ বলিয়া সবিশেষ পূজিত! তন্মধ্যে শ্রীগিরাজ গোবর্দ্ধন সর্ব্ব প্রকার ভক্তের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবৎ প্রেরণায় শ্রীগিরিরাজ ভারতবর্ষের পশ্চিমে শাল্মলী দ্বীপান্তর্গত দ্রোণাচল পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলে দেবতাগণ পরমানন্দে পুষ্পবর্ষণ করিল এবং তাঁহার প্রদক্ষিণ করিয়া স্তুতি করিয়াছিল। একদা মুনিশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্য তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে শাল্মলী দ্বীপে মনোহর মাধুর্য্য মণ্ডিত, দ্রোণাচল পুত্র শ্রীগিরিরাজজীকেদর্শন করিয়া লুব্ধচিত্ত হইয়া শ্রীগোবর্দ্ধন কামনায় দ্রোণাচলের নিকট গমন করিলে দ্রোনাচল ঋষিকে দর্শন করিয়া সসম্মানে পূজাদি করিলেন। তদনন্তর পুলস্ত্য বলিল হে দ্রোণ! তুমি পর্ব্বত গণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বদেবের পূজিত, এবং বিবিধ ঔষধাবলীতে পূর্ণ হইয়া জীবের জীবন প্রদান করিতেছ, হে দ্রোণ! আমি কাশীবাসী মহামুনি তোমার নিকট প্রার্থীরূপে সমুপস্থিত হইয়াছি, আমার অন্য কোন বস্তুর প্রয়োজন নাই, তবে তোমার পুত্র গোবর্দ্ধনকে

আমার দাস কর। দেবদেব বিশ্বেশ্বরের কাশীনামে এক মহাপুরী আছে, তথায় কোন পাপীরও প্রাণান্ত হইলে সে তৎক্ষণাৎ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়, সেখানে পতিত পাবনীগঙ্গা ও সাক্ষাৎ শ্রীবিশ্বেশ্বর বিরাজমান, সেখানে কোন পর্ব্বত নাই, তোমার পুত্র গোবর্দ্ধনকে আমি তথায় স্থাপন করিব এবং বৃক্ষলতা সমাকুল গোবর্দ্ধনের গোফায় বসিয়া আমি তপস্যা করিব, ইহাই আমার একান্ত বাসনা। পুলস্ত্য ঋষির বাক্য শুনিয়া পুত্র স্নেহে বিহ্বল দ্রোণাচল নয়নজলে মুখমণ্ডল প্লাবিত করিতে করিতে বলিল হে মুনি শ্রেষ্ঠ! আমি পুত্রস্নেহে অন্ধ, বিশেষতঃ এই পুত্রই আমার অতি প্রিয়, ঋষিবর! আপনার অভিসম্পাতের ভয়ে আমি ভীত হইয়া পুত্রকে আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতেছি, এই বলিয়া দ্রোণাচল গোবর্দ্ধনকে বলিল হে পুত্র! ভারতবর্ষ পূণ্যভূমি এবং কর্ম্মক্ষেত্র, তথায় মানবগণ ত্রিবর্গ ও সদ্যমুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব এই মুনিবরের সহিত তুমি ভারতবর্ষে যাও, পিতার আদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীগোবর্দ্ধন ঋষিকে বলিল হে মুনে! আমার দৈর্ঘ্য আট যোজন, প্রস্ত পাঁচ যোজন এবং উচ্চতা দুই যোজন, আপনি আমার এই বিশাল দেহ অন্যত্র কিরূপে লইয়া যাইবেন, মুনি বলিল হে পুত্র। তুমি আমার হস্তের উপর উপবেশন করিয়া সানন্দে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইবে, তোমাকে হস্তে বসাইয়া আমি কাশীপুর পর্যন্ত লইয়া যাইব। তখন গোবর্দ্ধন বলিল হে মুনে! আপনি হস্তে লইয়া গমন করিলে পথে

ভারীবোধে যেখানে আমাকে রাখিয়া দিবেন আমি সেখানেই থাকিব আর অন্যত্র যাইব না, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা স্মরণ রাখিবেন। তখন ঋষিবর সাতিশয় আগ্রহে সগর্ব্বে বলিল আমি এই শাল্মলী দ্বীপ হইতে কোশল দেশ পর্য্যন্ত কোথাও তোমাকে নামাইব না আমারও ইহাই প্রতিজ্ঞা। তখন গোবর্দ্ধন মাতাপিতার চরণে প্রণাম করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে হস্তে উপবেশন করিলেন। পুলস্ত্যও নিজ তেজরাশি প্রকাশ করতঃ স্বীয় দক্ষিণহস্তে ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে ব্রজমণ্ডলে পৌঁছাইলে পর জাতিস্মর গোবর্দ্ধন চিন্তা করিয়া মনে মনে বিচার করিলেন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি পূর্ণতম সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ব্রজমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া গোপবালাদির সহিত বাল্যলীলা, কৈশোরলীলা, দানলীলা ইত্যাদি বহুবিধ লীলা করিবেন। অতএব যমুনাতীরস্থ পরম পাবন এই ব্রজভূমিকে আমি কখনও ত্যাগ করিব না। প্রভু শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সহিত গোলোক হইতে ব্রজভূমিতে অবতরণ করিলে তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া আমি কৃত কৃতার্থ হইব। গোবর্দ্ধন এইরূপ চিন্তা করিয়া ঋষির হস্তে কিঞ্চিৎ ভার প্রদান করিলে ঋষি পরিশ্রান্ত হইয়া এবং অত্যন্তভার বোধে ব্যাকুল বশতঃ পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া গোবর্দ্ধনকে ব্রজে স্থাপন করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ব্যবহারিক শৌচাদি ক্রিয়ার নিমিত্ত গমন করিলেন। ঋষি শৌচাদি হইতে নিবৃত্ত হইয়া স্নান ধ্যান ও জপাদি সমাপন করিয়া গোবর্দ্ধনের নিকট

আসিয়া বলিলেন বৎস। তুমি পূর্ব্ববৎ আমার হস্তোপরি উপবেশন কর কিন্তু গোবর্দ্ধন আর উঠিল না, তখন ঋষি নিজের তেজে দুই বাহু দ্বারা উঠাইবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু গোবর্দ্ধন ঋষির চেষ্টা ও বিনীত বচনে এক অঙ্গুলিও বিচলিত হইলেন না, তখন ঋষি বলিল হে গোবর্দ্ধন। বৎস! উঠ উঠ আর বৃথা ভার বাড়াইও না, আমি বুঝিয়াছি তুমি রুষ্ট হইয়াছ, তোমার অভিপ্রায় আমাকে প্রকাশ করিয়া বল। গোবর্দ্ধন বলিল হে মুনে! আমার কোন দোষ নাই, আপনি আমাকে যেখানে রাখিবেন আমি সেখান হইতে আর চলিব না, ইহা তো আমি প্রথমেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। নিজ উদ্যম বিফল হইতে দেখিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্যের সর্ব্বেন্দ্রিয় ক্রোধে বিচলিত হইল এবং অধরোষ্ঠ কম্পিত করিয়া গোবর্দ্ধনকে অভিশাপ দিতে দিতে বলিল হে গোবর্দ্ধন! ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া আমার মনোবাসনায় বিঘ্নোৎপাদন করিলে, অতএব আজ হইতে তুমি প্রতিদিন তিল তিল পরিমাণে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। ঋষিবর এই রূপ বাগ্‌বজ্র বিসর্জ্জন করিয়া ভগ্ন মনোরথে কাশীধামে গমন করিলেন। এইদিন হইতে শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বত প্রতিদিন এক তিল ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছেন।

প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্র দর্প-চূর্ণ করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রের পূজা ভঙ্গ করিয়া শ্রীগিরিরাজের পূজা প্রবর্ত্তন কালে শ্রীগিরিরাজ স্বীয় স্বরূপ প্রকট করিয়া ব্রজবাসীগণের প্রত্যক্ষ হইয়া পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীগিরিরাজকে দর্শন করিয়া সকলে

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই নিরূপণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীগিরিরাজকে "কৃষ্ণস্তুন্যতমরূপ" বলিয়া কথিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ—শ্রীগোবর্দ্ধনের তটে শ্রীরাধামাধবের দান, মান, জলকেলী, রাস এবং নিকুঞ্জ বিলাসাদি প্রভৃতি লীলাবলী তথা সখাগণ সমভিব্যাহারে গোচারণাদি লীলা সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু পুরাণ প্রসিদ্ধ শ্রীগোবর্দ্ধনের বহুতীর্থ মাদৃশ-জীবের দুর্ভাগ্যবশতঃ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছেন। কার্ত্তিকমাসের অমাবস্যায় দীপাবলী পর্ব্বোপলক্ষ্যে এবং আষাঢ়ী পৌর্ণমাসীতে অর্থাৎ যাহা মুড়িয়া পূর্ণিমা বলিয়া প্রসিদ্ধ সেই পূর্ণিমায় শ্রীসনাতন গোস্বামীর স্মৃতি রক্ষা কল্পে ব্রজবাসীগণ তথা বহু-দিক্‌দেশীয় ভক্তগণ শ্রীগিরিরাজ পরিক্রমা ও দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়া থাকেন। মুড়িয়া পর্ব্বোপলক্ষ্যে শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় সঙ্কীর্ত্তন সহ শ্রীমানসী গঙ্গার পরিক্রমা হইয়া থাকেন। গিরিরাজ পরিক্রমার পর্য্যায়ানুসারে দর্শনীয় যথা—শ্রীহরিদেবজীউ গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু গোবর্দ্ধনে আগমন করিয়া শ্রীহরিদেব-জীউর সম্মুখে উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন করতঃ নিশি যাপন করিয়া-ছিলেন। এই মন্দিরের বায়ুকোণে শ্রীব্রহ্মকুণ্ড অবস্থিত। এই কুণ্ডে স্নান করিয়া ব্রহ্মাজী শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। এই কুণ্ডতীরে শ্রীমনসাদেবীর মন্দির বিরাজমান এবং মানসী-গঙ্গার উত্তরতীরে শ্রীচক্রেশ্বর নামান্তর চাকলেশ্বর মহাদেব, তাঁহার সম্মুখে শ্রীসনাতন প্রভুর ভজন কুটীর, তাহার পার্শ্বেই

শ্রীবল্লভাচার্য্যের উপবেশন স্থান এবং শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ মন্দির গোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। প্রবাদ আছে—এই স্থানে পূর্ব্বে মশার বড়ই উপদ্রব ছিল, তজ্জন্য শ্রীসনাতন প্রভু এইস্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবার মনস্থ করিলে শ্রীচক্রেশ্বর মহাদেব তাঁহাকে আশ্বাসন দান করিয়া কুটীরে বাস করিবার আদেশ করিয়াছিলেন, সেই অবধি এই স্থানে মশার উপদ্রব ছিল না। এক সময় এইস্থানে ছদ্মবেশী শ্রীমদনমোহন ব্রজশিশুরূপে শ্রীসনাতন প্রভুকে গোবর্দ্ধনের উপরি ভাগ হইতে চরণচিহ্নযুক্ত শ্রীশিলা আনিয়া প্রত্যহ পরিক্রমার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীমানসী গঙ্গার পূর্ব্বাংশের মধ্যে শ্রীগিরিরাজের যে অংশ দৃশ্য হইতেছেন তথায় শ্রীকৃষ্ণের মুকুট চিহ্ন বিরাজ করিতেছেন।

ইন্দ্রধ্বজ বেদী—গোবর্দ্ধন গ্রামের পূর্ব্বে এই মনোরম উচ্চবেদী অবস্থিত। শ্রীনন্দমহারাজ প্রতিবৎসর ভাদ্রমাসের ইন্দ্র দ্বাদশীতে ব্রজের শস্যাদি বৃদ্ধির নিমিত্ত ইন্দ্র পূজা করিতেন। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের কথায় তাহা গিরিরাজ পূজায় পরিণত হয়, শ্রীনন্দমহারাজ প্রতিবৎসরের ন্যায় ভাদ্র ইন্দ্র দ্বাদশীতে ইন্দ্রপূজার নিমিত্ত এবারও মহা সমারোহে সামগ্রী আয়োজন করিতেছেন, সপ্তম বয়স্ক শিশু কৃষ্ণ তাহা দেখিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ! আপনারা এই দ্রব্যে কি করিবেন? আমাকে তাহা বলুন। কৃষ্ণের বাক্যে শ্রীনন্দ হাঁসিতে হাঁসিতে বলিলেন, শোন বাপু! আমাদের গোপকুলে

জন্ম গবাদির পালন আমাদের স্বধর্ম্ম, যদি তৃণাদি উৎপন্ন না হয় তবে গবাদি পালন হইবে না, একারণ আমরা দেবরাজ ইন্দ্রের পূজা করি। পিতার বাক্যে কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্যে শ্রীউপানন্দাদি গোপগণের প্রতি বলিলেন—আপনারা আমার কথা শুনুন, মানুষ জন্মার্জ্জিত কর্ম্মানুসারে তাহার ফল ভোগ করে, ইন্দ্র কি আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে? ইন্দ্রাদি দেবতা যাঁহার ভৃত্য সেই নারায়ণই পরম কারণ। তিনি যাহাকে যাহা আদেশ করেন ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তাহাই পালন, করে অতএব এই ইন্দ্রযজ্ঞের প্রয়োজন নাই। আমরা বনবাসী, শৈল সন্নিধানে বাস করি, গো ব্রাহ্মণ, গোবর্দ্ধনই আমাদের পূজ্য। অতএব অন্য দেবাশ্রয় না করিয়া ঈশ্বর স্বরূপ পরম কারণ, ব্রজবাসীর হিতকর্ত্তা আপনারা এই গোবর্দ্ধনের পূজা করুন। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে শ্রীনন্দমহারাজ আনন্দে দধি দুগ্ধ ও ঘৃত প্রভৃতি শকটে লইয়া এবং গোপ, গোপী, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া পর্ব্বতোপরি গমন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে রন্ধনের নিমিত্ত আদেশ করিলেন। অনন্তর বিবিধ উপচারে পরমানন্দ মনে গোবর্দ্ধনের পূজা করিয়া সকলে জোড় হস্তে গিরিরাজের স্তব করিতে থাকিলে ব্রজরমণীগণও মধুরস্বরে মঙ্গল গীত আরম্ভ করিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ রূপান্তর ধারণ করিয়া গোবর্দ্ধনোপরি অবস্থানে পূজার সমস্ত সামগ্রী আনন্দে ভোজন করিতেছেন, আর এক মূর্ত্তিতে গোপগণকে বলিতেছেন—ঈশ্বর গোবর্দ্ধন স্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আপনাদের ভক্তিদত্ত সমস্ত দ্রব্য

ভোজন করিতেছেন আপনারা দর্শন করুন। শ্রীনন্দাদি গোপগণ মূর্ত্তিমান্ সাক্ষাৎ যজ্ঞভোক্তা শ্রীগিরিরাজজীকে ভোজন করিতে দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলেন এবং গো ও ব্রহ্মণাদিকে অগ্রে লইয়া গিরিরাজের পরিক্রমা প্রণামাদি ও প্রার্থনা করিয়া নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন।

এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার বাৎসরিক পূজা না পাইয়া অত্যন্ত ক্রোধভরে মেঘগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—ব্রজের গোপগণ নন্দ গোপের পুত্র বাচাল কৃষ্ণের কথায় আমার পূজা না করিয়া গোবর্দ্ধনের পূজা করিয়াছে, আমি আজই ব্রজভূমিকে বিনাশ করিব। দেখি কি করিয়া কৃষ্ণ তাহাদিগকে রক্ষা করে। এই বলিয়া ঊনপঞ্চাশ পবন সহ ইন্দ্র মেঘগণকে সঙ্গে লইয়া ব্রজে আগমন করিয়া প্রথমে প্রবল ঝড় আরম্ভ করিল, তারপর মেঘগণকে বর্ষণ করিতে বলিলে তাহারাও প্রবলভাবে নিরন্তর জল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল তাহাতে দশদিক্ অন্ধকার হইয়া গেল এবং ইন্দ্রও সক্রোধে পুনঃ পুনঃ ব্রজাঘাত করিতে লাগিল। তখন ব্রজের গোপগোপী ও ব্রজবাসীগণকে ভীত ও খিন্ন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিতে ব্রজবাসীগণকে বলিলেন—আপনাদের কোন চিন্তা নাই, গোবর্দ্ধন রক্ষা করিবেন এই বলিয়া মত্ত সিংহের ন্যায় পরাক্রমে অবলীলা ক্রমে নানা জীবজন্তু পূর্ণ গোবর্দ্ধনকে বামহস্তে ধারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিলে বাৎসল্য প্রেমবিভাবিত মাতা শ্রীযশোদা সত্বর শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিলে

তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—মাতঃ ! তোমার পুত্র বর্ত্তমান থাকিতে কেন এত দুঃখ করিতেছ, তোমার কোন চিন্তা নাই। এমন সময় সমস্ত গোপগোপী তথায় আসিয়া উপনীত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে বলিলেন তোমাদের উপসর্গ নষ্ট হইল, অতএব তোমরা ভুল বুঝিও না এখন তোমাদের বিপ্লব দূর হইল, আর ভয়ের কোন কারণ নাই। এই দেখ গোবর্দ্ধন নিম্নে অতি মনোহর ও পরিসর শৈলশালা রহিয়াছে সত্বর হইার মধ্যে আনন্দে প্রবেশ কর। এই বলিয়া গোপ-গোপীগণকে ডাকিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আহ্বানে সকলে ধেনু বৎস লইয়া ঝড়-বৃষ্টি স্পর্শ শূন্য পরম মনোহর গিরি গহ্বরে প্রবেশ করিয়া আনন্দে কৃষ্ণ গুণগান করিতে লাগিলেন। ব্রজরামাগণও অপ-রূপ কৃষ্ণরূপ দর্শনে আনন্দসাগরে মজ্জিত হইলেন। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া বিষাদে বিশাখাকে বলিতেছেন—দেখ তোমার সখা সুকোমল হস্তে অতি ভারী গিরিরাজ ধারণ করিয়াছে, ইহাতে আমার চিত্ত বিদীর্ণ হইতেছে বল সখি। কি উপায় করি ! প্রেমের স্বভাবে শ্রীরাধিকা সখীগণের নিকট আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন ব্রজে কি কোন কঠোরাঙ্গ দণ্ড স্বরূপ গোপ নাই। শ্রীরাধিকার স্বাভাবিক প্রেমে কোন ভাবা-ন্তর নাই, সেই আবেশে গোবর্দ্ধনকে স্তব করিতে করিতে বলি-তেছেন—হে তাত ! তুমি লঘু হও, যেন কৃষ্ণ তোমাকে হস্তে রাখিতে পারেন, মঙ্গলাত্মা তোমাকে আমার নমস্কার। পুন-রায় শ্রীরাধা বিশাখাকে বলিলেন বিশাখে অশেষ চিত্ত লোভা অপূর্ব্ব নয়নদ্বয় কপোল পর্য্যন্ত চূর্ণ কুন্তলে শোভিত শ্রীকৃষ্ণের

মুখমণ্ডল শোভা দর্শন কর। শ্রীরাধিকার বাক্যামৃত পানে শ্রীকৃষ্ণ মধুপানমত্ত ভ্রমরের ন্যায় অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইলেন।

এদিকে বাৎসল্য প্রেমের মূর্ত্তিমতী শ্রীযশোদা ব্যাকুল হইয়া শ্রীব্রজরাজ প্রতি বলিলেন, আমার গোপাল অতি শিশু কিছু খায় নাই কিরূপে গিরি ধরিবে? হে ব্রজরাজ! শীঘ্র শিশু মুখে দুধ খণ্ডসার অর্পণ কর এবং বলরামকে বলিলেন হে নীলাম্বর বৎস! তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অত্যন্ত পীড়া পাইতেছে, তুমি অতি সাহসী একটু অবলম্বন দেও। এই সময় সমস্ত গোপগণ অনুভব করিতেছেন, সাত বৎসরের দুগ্ধপোষ্য শিশু কৈলাশ সম গিরি ধারণ করিয়াছে এ প্রভাব কোথা হইতে আসিল। দিক্‌গজের শুণ্ডে পৃথিবী যেরূপ শোভা পায় তদ্রূপ শোভা পাইতেছে। এইরূপ মনে করতঃ সকলেই কৃষ্ণের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধিকার প্রতি দৃষ্টি হওয়ায় আনন্দে অঙ্গ কম্পিত হওয়ায় গোবর্দ্ধনও কম্পিত হইল। তখন সমস্ত গোপগণ সম্ভাল সম্ভাল বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সখাগণ তখন বেত্র আগে দিয়া গোবর্দ্ধন ধরিয়া বলিলেন কোন চিন্তা নাই কোন চিন্তা নাই। সকলের কোলাহলে কৃষ্ণ সুস্থির হইয়া হাঁসিতে থাকিলে তাঁহার হাস্য বদন দর্শনে সকলে নিশ্চিত হইলেন।

এইদিকে দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপে সপ্তাহকাল নানা উৎপীড়ন করিল। কিন্তু ব্রজের কিছুই নষ্ট হয় নাই দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল এবং তাহাতে তাহার সমস্ত অভিমান চূর্ণ হইল।

তখন সখেদে ইন্দ্র বলিল স্বয়ং ভগবান্ ব্রজে প্রকটিত তাঁহাকে না জানিয়া কত কত অপমান করিলাম। আমার এই অপরাধের নিস্তার নাই, এইরূপ চিন্তা করিয়া সমস্ত উৎপাত দূর করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ব্রজবাসীগণকে বলিলেন এইবার আপনারা নিজ নিজ স্থানে গমন করুন,তাহারা গৃহে গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণও সখাগণ সঙ্গে গোচারণে প্রবৃত্ত হইলে সেই অবসরে দেবরাজ ইন্দ্র গলে বস্ত্র বাঁধিয়া শ্রীকৃষ্ণ চরণ তলে পতিত হইয়া বলিল—আমার সম অজ্ঞ ত্রিভুবনে আর কেউ নাই, আমাকে রক্ষা করুন, স্বয়ং ভগবান্ আপনার তত্ত্ব না জানিয়া গর্ব্বে মত্ত হইয়া এই অপরাধ করিয়াছি, শরণাপন্ন আমাকে ক্ষমা করুন। ইন্দ্রের স্তুতিতে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। যাহাদিগকে দর্শনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ উৎকণ্ঠিত ছিলেন, ইন্দ্রের উৎপাত কালে তাঁহাদের সকলকে একত্র সপ্তদিন দর্শনরূপ নিজ কার্য্যে সাধনে ইন্দ্রের সেই অপরাধ গণনা না করিয়া আলিঙ্গনে ধন্য করিলেন এবং ইন্দ্রকে বহু আশ্বাস দিয়া বিদায় করিলেন।

শ্রীপাপনাশন কুণ্ড—ইহা ইন্দ্রধ্বজ বেদীর নৈঋতকোণে অবস্থিত। এই কুণ্ডকে কেহ কেহ দান নিবর্ত্তন কুণ্ড বলিয়া উল্লেখ করেন। এই কুণ্ডের বর্ত্তমান নাম নিবারী কুণ্ড। এই কুণ্ড পরাশৌলী গ্রামে যাইবার রাস্তার সংলগ্ন। এই কুণ্ডের পার্শ্বে ধর্ম্মরোচন ও গোরোচন নামে আরও দুইটি কুণ্ডের নাম পাওয়া যায়।

শ্রীদানঘাটী—ইহা দাননিবর্ত্তন কুণ্ডের পশ্চিমে অল্প ব্যবধান শ্রীগোবর্দ্ধনের উপরে অবস্থিত। এখানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সহিত দানলীলা অর্থাৎ শুল্ক আদায় লীলাছলে প্রেমকন্দল করিয়াছিলেন। দান ঘাটীতে শ্রীকৃষ্ণের উপবেশন স্থানের উত্তরে শ্রীমন্দির শোভা বিস্তার করিতেছেন। দানঘাটীর দক্ষিণে শ্রীগিরি রাজের উপরিভাগে শ্রীদানীরায়ের মন্দির অবস্থিত। তথায় ললিত ত্রিভঙ্গ বেশে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ দানী-রায় নামে বিরাজ করিতেছেন। দান নিবর্ত্তন কুণ্ডের পার্শ্বে না আসা পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে তুমুল কন্দল চলিতেছিল। শ্রীরূপ গোস্বামী এই দানলীলা অবলম্বন করিয়াই শ্রীদান-কেলি কৌমুদী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। যমুনাও ত নামান্তর যমুনান্ত গ্রাম ইহা গোবর্দ্ধন গ্রামের দুই মাইল পূর্ব্বে মথুরা রাস্তার নিকটে অবস্থিত। ইহা শ্রীরামকৃষ্ণের বিলাসস্থল। এখানে শ্রীযমুনা ঘাট দর্শনীয়।

শ্রীপরাশোলী—ইহার বর্ত্তমান নাম মহম্মদ পুর, ইহা যমুনান্ত গ্রামের এক মাইল নৈঋতকোণে এবং গোবর্দ্ধন গ্রামের সওয়া মাইল অগ্নিকোণে অবস্থিত এই, স্থানে শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত কালীন বসন্ত রাসোৎসব লীলা সংঘটিত হইয়াছিল। গ্রামের নৈঋতে পাপমোচন কুণ্ডের অনতিদূরে স্বচ্ছ অগাদজলে পরি-পূর্ণ বিকসিত কমল কুমুদাদি জলজ পুষ্পে সুশোভিত চন্দ্র সরোবর নামে এক রমণীয় সরোবর সতত শোভাবর্দ্ধন করিতে-ছেন। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাস লীলার কালে চন্দ্র এস্থনে অমৃত বর্ষণ

করিয়াছিলেন। সরোবরের তীরস্থ মন্দিরে শ্রীদাউজী ও শ্রীচন্দ্র বিহারী দর্শনীয়। এখানে শ্রীচন্দ্রাবলী বৈঠক, শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক, শ্রীবিট্টলনাথজীর বৈঠক এবং শ্রীগোকুল নাথজীর বৈঠক তথা বৈষ্ণব পদকর্ত্তা শ্রীসুরদাসজীর ভজন কুটীর বিরাজিত আছেন।

বাজনী শিলা—অর্থাৎ বাজাইলে সুমধুর শব্দ হয় এরূপ একটি বাজনী শিলা রহিয়াছেন। এই শ্রীচন্দ্রসরোবরে শ্রীকৃষ্ণ রাস রসাবেশে উপবেশন করিয়াছিলেন এবং স্বহস্তে শ্রীরাধিকার বেশ রচনা করিয়াছিলেন। সরোবরের নৈঋতকোণে শিঙ্গার মন্দির এবং অগ্নিকোণে শ্রীরাসমণ্ডল বিরাজমান্ রহিয়াছেন তথা শ্রীবলভদ্র কর্ত্তৃক প্রকটিত শ্রীসঙ্কর্ষণ নামে এক কুণ্ড বিরাজ করিতেছেন। এই কুণ্ডে স্নান করিলে পূর্ব্বকৃত গোহত্যাদি জনিত মহাপাতকরাশি দূরে পলায়ন করে। চন্দ্র সরোবরের নৈঋতকোণে জীবের মুক্তি প্রদানকারী গন্ধর্ব্ব কুণ্ড নামে এক কুণ্ড শোভা বিস্তার করিতেছেন। এখানে ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক কালে গন্ধর্ব্বগণ সমবেত রূপে স্তুতি করিয়াছিলেন।

পেটো—ইহা পরাসৌলী গ্রামের দুই মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। রাসে অন্তর্দ্ধানের পর শ্রীকৃষ্ণ এখানে চতুর্ভুজ হইয়া গোপীকাগণের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু মাদনাখ্য মহাভাববতী শ্রীরাধিকা উপস্থিত হওয়া মাত্র সর্ব্ব সমর্থ শ্রীগোবিন্দ নানা যত্ন করা সত্ত্বেও তাঁহার দুই হস্ত রাখিতে সমর্থ হন নাই। কথিত আছে—শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের উপদ্রব হইতে

ব্রজবাসীগণকে রক্ষা করিবার জন্য এখানে সখাগণ সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের নিকট গোবর্দ্ধন ধারণ করিবার কথা প্রকাশ করিলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল শরীর দ্বারা এই গুরুতর কার্য্য সম্পাদন হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব জ্ঞানে এই কার্য্য হইতে বিরত হইবার পরামর্শ দেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে সম্মত হইলেন না। অনন্তর সম্মুখে একটি কদম্ববৃক্ষ দেখিয়া সখাগণ বলিলেন—যদি তুমি এই বৃক্ষকে ধরিয়া মুচড়াইতে পার, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস হইবে, তবেই আমরা তোমাক গোবর্দ্ধন ধারণের অনুমতি দিতে পারি। ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দে সেই বৃক্ষকে ধরিয়া মুচড়াইয়া ফেলিলেন। তদ্দৃষ্টে সখাগণ সন্তুষ্ট চিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া মল্লবেশ রচনা দ্বারা কোমরে পেটি বদ্ধ পরাইয়া দিলেন। যে বৃক্ষকে শ্রীকৃষ্ণ মুচড়াইয়া বক্র করিয়াছিলেন সেই প্রাচীন বৃক্ষই এঠাকদম্ব নামে সর্ব্বসাধারণে পরিচিত এবং তদবধি এই স্থানের নাম "পেটো" বলিয়া বিখ্যাত। গ্রামের বায়ুকোণে শ্রীনারায়ণ সরোবর। ইহার তীরে শ্রীনারায়ণ ও এঠা কদম্ব দর্শনীয়।

শ্রীবৎসবন নামান্তর বচ্‌গাঁও—ইহা পেটার তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা শ্রীকৃষ্ণের বিহার স্থল। শ্রীবল্লভ আচার্য্য সম্প্রদায়ীগণ এখান পর্য্যন্ত শ্রীব্রজমণ্ডলের স্থান বলিয়া নিরূপণ করেন।

শ্রীগৌরী তীর্থ নামান্তর গৌরীকুণ্ড—ইহা আনোর

বা অন্নকুট গ্রামের পূর্ব্বভাগে অল্প ব্যবধান, সঙ্কর্ষণ কুণ্ডের অগ্নিকোণে অবস্থিত। এখানে শ্রীচন্দ্রাবলী প্রত্যহ শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া গৌরী পূজার ছলে আগমন করিয়া প্রাণবল্লভের সহিত মিলিত হইতেন। এই কুণ্ডের পশ্চিমে নীপ কুণ্ড নামে এক কুণ্ড বিরাজিত। এই কুণ্ডের স্নানে স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। এই কুণ্ডের তীরে দোনার ন্যায় পত্র যুক্ত কদম্ববৃক্ষ আছে, এই বৃক্ষ হইতে দোনা লইয়া পার্শ্ব বর্ত্তী স্থানে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সহিত দধি ভোজন করিয়াছিলেন। সেই হেতু এই পবিত্র ক্ষেত্রের নাম গর্গ সংহিতায় দ্রোণ-ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত। এই স্থানে দধি দান ও দোনাতে দধি ভোজন করতঃ এই ক্ষেত্রকে নমস্কার করিলে মানবগণ নিঃসন্দেহে গোলোকে গমন করিবে।

শ্রীআনোর বা অন্নকুট গ্রাম—ইহা গোবর্দ্ধন গ্রামের দুই মাইল দক্ষিণে শ্রীগিরিরাজ সংলগ্ন। দাননিবর্ত্তন কুণ্ডের পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসীগণের ভক্তি নিবেদিত চব্য চোষ্য লেয্য পেয় চতুর্বিধ ষড়রস সমূহে অন্নকুট ভোগ গ্রহনের নিমিত্ত শ্রীগিরিরাজ কৃপা করিয়া উচ্চস্বরে "আনো আনো" এইরূপ বারম্বার বলিয়াছিলেন। সেই হইতে এই গ্রাম আনোর বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। এই গ্রামে শ্রীসদ্দু পাণ্ডের গৃহে শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যের বৈঠক বিরাজিত। ইহার সম্মুখে কটোরা ও অঞ্চনী শিলা, বাজনী শিলা দর্শনীয়। এখানকার শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপর শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী

গোস্বামীর গোপালের মন্দির বিরাজমান। সাধারণজন এই মন্দিরকে শ্রীনাথজীউর মন্দির বলিয়া উল্লেখ করেন, সম্প্রতি শ্রীগোপালদেব শ্রীনাথজীউ নামে প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান সময়ে উদয়-পুর রাজধানীর অন্তর্গত শ্রীনাথদ্বারা নামক গ্রামে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর প্রাণবল্লভ শ্রীগোপালজীউ বিরাজমান। তিনিই এক স্বরূপে শ্রীবৃন্দাবনে নিত্যবিহার সম্পাদনের নিমিত্ত শ্রীগো-বিন্দ কুণ্ডের নৈঋতকোণে অবস্থিত গোঘাটের উপর প্রাচীনমন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। এই গ্রামের দক্ষিণে শ্রীশ্রীগিরিরাজ তটে শ্রীনাথজীউর প্রকট স্থান। তৎপার্শ্বেই শ্রীঅন্নকুট স্থান এবং যে শিলার নিকটে রাশি রাশি অন্নভোগের নিমিত্ত ব্রজ-রাজ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল সেই শিলার উপরেই একটি ছত্রি বিরাজ করিতেছেন। এই স্থান অবশ্য দর্শনীয়!

শ্রীগোবিন্দ কুণ্ড--আনোরের দক্ষিণে শ্রীগিরিরাজের সন্নিকটে অবস্থিত। শ্রীব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে ইন্দ্র পূজা না করিয়া গিরিরাজ গোবর্দ্ধন পূজার অনুষ্ঠান করিয়াছেন শুনিয়া দেবরাজ আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত বিবেচনায় সমস্ত ব্রজবাসীগণকে ধ্বংস করিবার অভিপ্রায়ে ক্রমে সপ্তাহ পরিমিত সময় মুষলধারে প্রলয়কালীন শিলাবৃষ্টি ও নানাবিধ শক্তি প্রয়োগ করিয়া যখন অকৃতকার্য্য হইলেন, তখন ইন্দ্রের দিব্যজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইল। সেই বলে শ্রীকৃষ্ণকে আপনার প্রভু ও ভগবান্ বলিয়া প্রতীতি হইল। অতএব কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করিয়া স্বীয় অপরাধ হইতে বিমুক্ত হইবেন,

এইরূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে সুরভীর উপদেশ বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণাপন্ন হন এবং এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণকে নানা তীর্থের জলে অভিষিক্ত করিয়া শ্রীগোবিন্দ নাম প্রদান করিয়াছিলেন। কুণ্ডের পূর্ব্বতীরে শ্রীগোবিন্দ মন্দির, দক্ষিণতীরে শ্রীনাথজীউর মন্দির ও শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র-পুরী গোস্বামীর উপবেশন স্থান। এখানে শ্রীগোপাল দুগ্ধ দান করিবার ছলে এক ব্রজবাসী শিশুর রূপ পরিগ্রহ করিয়া শ্রীপুরী গোস্বামীকে দর্শন দিয়াছিলেন। পরে স্বপ্নযোগে আপন পরিচয় দিয়া কুঞ্জ হইতে উঠাইবার আদেশ দানে প্রকটিত হইয়া ছিলেন। বর্ত্তমানে এই গোপালজীউ নাথদ্বারে শোভিত আছেন। পুরী গোস্বামীর উপবেশন স্থানের নিকটেই শ্রীবল্লভাচার্য্যের উপবেশন স্থান। এই কুণ্ডের তীরে বহু ভজনানন্দী সাধু ভজনানন্দে কালক্ষেপণ করিতেছেন। কুণ্ডের পশ্চিমে শ্রীগোবর্দ্ধন শিলার উপরে শ্রীকৃষ্ণের হস্তাক্ষর শোভিত ও ছড়ির চিহ্ন শোভা পাইতেছেন। ইহার সন্নিকটে শ্রীগোবিন্দের শিঙ্গার স্থল। অর্থাৎ ইন্দ্র এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণকে গোবিন্দ পদে অভিষিক্ত করিবার জন্য নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়াছিলেন। কুণ্ডের নৈঋতে আকাশগঙ্গা নামে এক পরিখা রহিয়াছে, তদ্দক্ষিণে স্বর্গ দলা শোভা পাইতেছে।

শক্রকুণ্ড—ইহা গোবিন্দ কুণ্ডের দক্ষিণে অবস্থিত। ইন্দ্র এখানে স্বীয় অপরাধ ক্ষমাপনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে বহুশঃ স্তুতি করিয়াছিলেন। একটি কিম্বদন্তী আছে—যে ইন্দ্রের

অনুতাপ জনিত অশ্রুধারা প্রবাহের দ্বারা এই কুণ্ডটি পরিপূর্ণ হইয়াছিল। বর্ত্তমানে কুণ্ডটি লুপ্ত প্রায় অবস্থায় দর্শকের নয়নগোচর হইতেছেন। এইকুণ্ডে স্নান ও তর্পণ করিলে শত-যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। এই কুণ্ডের পূর্ব্বভাগেই নীপ-কুণ্ড বিরাজিত।

পুছরী—শ্রীগোবিন্দ কুণ্ডের দেড়মাইল দক্ষিণ কিঞ্চিৎ পশ্চিম গিরিরাজের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। এই গ্রামের উত্তরে ময়ূর আকৃতি শ্রীগিরিরাজের পুচ্ছদেশে পুচ্ছ নামক এক কুণ্ড শোভিত। এই কুণ্ডের স্নানে মানুষ বিশেষ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। এই কুণ্ডকে সাধারণ জন নবল কুণ্ড বলিয়া থাকেন। এই স্থানে অপ্সরা নামে আরও একটি কুণ্ড বিরাজিত রহিয়াছে। কুণ্ডের ঈশানকোণে টীলার উপরে শ্রীনৃ-সিংহদেবের প্রাচীন মন্দির। কুণ্ডের উত্তরে শ্রীগিরিরাজের প্রান্তভাগে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের গোফা। গোফার সম্মুখে শ্রীগিরি-রাজের উপরে শ্রীকৃষ্ণের মুকুট চিহ্ন বিরাজমান। কুণ্ডের পার্শ্বে শ্রীগঙ্গাজী ও নবলবিহারীর মন্দির দর্শনীয়।

পুছরী লোটা—নবল কুণ্ডের পশ্চিমে পরিক্রমার পার্শ্বে অবস্থিত। যিনি শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ব্যাকুল হইয়া অন্ন জল পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান করিতেছেন, তিনি যদু-পতি শ্রীকৃষ্ণের এক সখা ইনিই লোঠা নামে বিখ্যাত! যখন শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গিয়াছিলেন, তখন তিনি লোঠাকেও সঙ্গে নিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তদুত্তরে লোঠা

বলিলেন—ভাই আমি ত ব্রজের বাহিরে যাইব না, আর যত-দিন পর্য্যন্ত তুমি দ্বারকা হইতে ফিরিয়া না আসিবে আমি ততদিন অন্ন জল কিছুই গ্রহণ করিব না। সেই দিন হইতে লোঠাজী এই পুছরীতে অন্নাদি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগোবিন্দের আগমন প্রতীক্ষায় ভজন করিতেছেন।

শ্যাম ঢাক—ইহা লোঠাজীর পশ্চিমে অর্দ্ধক্রোশ দূরে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণ এই শান্তিপ্রদ বনভূমিতে নিবাস করেন। শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সহিত এই বনস্থিত বৃক্ষের পত্র চয়ন করিয়া তদ্দ্বারা দোনা প্রস্তুত করিয়া বন ভোজনাদি করিতেন। বিশেষতঃ পলাশ অর্থাৎ ঢাক এই নামে পরিচিত ও বিবিধ বৃক্ষাবলী দ্বারা এই বনভূমি শ্যামবর্ণে ভূষিত হওয়ায় ইহা শ্যামঢাক নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থানে শ্রীবিঠ্‌টল নাথজীর বৈঠক এবং গোপসাগর, জলঘরা, শ্রীমন্দির এবং গোপ তলাইয়া নামে এককুণ্ড এবং শ্রীবল্লভাচার্য্যের মতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রথম ঝুলন স্থল। ইহার নিকটে সুগন্ধি শিলা শোভা পাইতেছেন।

শ্রীরাঘব গোফা—নবল কুণ্ডের উত্তরে পরিক্রমা রাস্তার দক্ষিণে শ্রীগিরিরাজের পার্শ্বস্থ স্থানে বহু বৃক্ষ পরিবেষ্টিত কুঞ্জ সমূহে বিমণ্ডিত শ্রীপাদ রাঘব পণ্ডিতের ভজন কুটী নামক একটি মনোহর গোফা শোভা পাইতেছে। এই গোভার অভ্যন্তরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল নিরন্তর বিহার করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সেবকবৃন্দ এই গোফার সন্নিকটে সর্ব্বদা ভজনানন্দে

নিমগ্ন আছেন।

শ্রীদাউজী মন্দির—পুছড়ীর এক মাইল উত্তরে শ্রীগিরিরাজের উপরে অবস্থিত। মন্দিরে যাইবার সময় শৃঙ্গার শিলা দর্শনীয়। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের সপ্তম বৎসর বয়সের চরণ-চিহ্ন বিরাজমান। তাহার নিকটে সুরভী ঐরাবত ও ঘোড়ার পদ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের ভিতরে অঞ্জনশিলা বিরাজমান্। প্রবাদ আছে এই মন্দিরের নিম্নদেশে দাঁড়াইয়া কৃষ্ণ শ্রীগোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন। মন্দিরের মধ্যভাগে একটি গভীর গহ্বর আছে, যাহার অভ্যন্তরে এখনও কেহ প্রবেশ করিতে সাহসী হন না এই মন্দিরের পার্শ্বে আসিয়া স্বীয় অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণাম করিয়াছিলেন।

শ্রীসুরভী কুণ্ড—ইহা দাউজী মন্দিরের বায়ুকোণে অবস্থিত। ইন্দ্র কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে গোবিন্দ পদে অভিষিক্ত করার পরে এই স্থানে সুরভী আপন দুগ্ধ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করিয়াছিলেন।

শ্রীঐরাবত কুণ্ড—ইহা সুরভী কুণ্ডের উত্তরে অবস্থিত। ঐরাবত শ্রীকৃষ্ণকে অভিষেক করিবার জন্য এইস্থানে দাঁড়াইয়া শুণ্ড দ্বারা আকাশ গঙ্গার জল আনিয়াছিলেন। কুণ্ডের তীরে কদমখণ্ডী শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস স্থল। এই কদমখণ্ডীকে কেহ কেহ গোবিন্দ স্বামীর কদমখণ্ডী বলিয়া উল্লেখ করেন।

শ্রীরুদ্র কুণ্ড—নামান্তর হর্‌জি কুণ্ড—এই কুণ্ড ঐরাবত

কুণ্ডের বায়ুকোণে অবস্থিত। এখানে শ্রীমহাদেব শ্রীকৃষ্ণধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলেন।

শ্রীযতিপুরা,—নামান্তর গোপাল পুরা—হরজি কুণ্ডের উত্তরে অবস্থিত। শ্রীগিরিরাজের সমীপে যে স্থান শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীনাথজীর তৃপ্তি বিধানের নিমিত্ত ষড়রসযুক্ত নানাবিধ উপকরণে অন্নকূট মহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন,সেই স্থান শ্রীমাধবেন্দ্র যতির নাম হইতে যতিপুরা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অদ্যাপিও কার্ত্তিক শুক্লা প্রতিপদ দিবসে এখানে মহা সমারোহে শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকেন। সন্নিকটে শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যের উপবেশন স্থান। গ্রামে শ্রীমদনমোহন, শ্রীনবনীত প্রিয়াজী ও শ্রীমথুরেশ জীউর মন্দির বিরাজমান।

গোশালা—গ্রামের উত্তরে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে অবস্থিত। ইহা শ্রীনাথজীর গোশালা বলিয়া সর্ব্বসাধারণে পরিচিত। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীকে কৃপা করিয়া শ্রীগোপালজীউ প্রকট হইয়াছিল জানিয়া ব্রজবাসীগণ যে সমস্ত গাভী শ্রীগোপালজীউকে অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই গাভীগুলি এই গোশালায় রাখা হয়। বর্ত্তমান সময়ে সেই গোশালার ভগ্নাবশেষ সামান্য প্রাচীর মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।

শ্রীবিলছু কুণ্ড—যতিপুরার দেড়মাইল উত্তরে পরিক্রমার বামদিকের অনতিদূরে যেখানে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া শ্রীরাধিকার বদন কমল সানন্দে প্রফুল্লিত হইয়াছিলেন। সেই

স্থানে বৃক্ষাবলীতে পরিব্যাপ্ত বিলাসবদন নামে এক সেবাস্থল সুশোভিত, এই স্থানে বিলছুকুণ্ড নামে খ্যাত এক কুণ্ড শোভা পাইতেছে। চতুর্দ্দিক মণি-খচিত এই কুণ্ডে স্নান মাত্রই মানবগণ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। এই কুণ্ড হইতে শ্রীহরিদেব জীউ প্রকট হইয়াছিলেন।

জান আজান বৃক্ষদ্বয়—এই বৃক্ষদ্বয় শ্রীগিরিরাজের সন্নিধানে অবস্থিত, তদনন্তর শ্রীহনুমানজী বিরাজমান. সর্ব্বসাধারণে ইনি দণ্ডবতী হনুমান বলিয়া প্রসিদ্ধ।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বেদী—শ্রীহনুমানজীর পরেই গোবর্দ্ধন গ্রামের সন্নিকটে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চবুতারা বিরাজমান। যাঁহারা শ্রীগিরিরাজ মহারাজের দণ্ডবতী পরিক্রমা করেন, তাঁহারা এই স্থান হইতে পরিক্রমা শুভারম্ভ করিয়া থাকেন। তদনন্তর গোবর্দ্ধন গ্রাম হইতে সখীথরা।

শ্রীসখীথরা—নামান্তর সখীস্থলী—শ্রীমানসী গঙ্গার উত্তরে অল্প ব্যবধানে এই গ্রাম অবস্থিত। শ্রীরাধার জেষ্ঠতাত ভগিনী শ্রীচন্দ্রাবলীর গ্রাম। কথিত আছে যখন শ্রীপাদ দাস গোস্বামী বিরহে অন্নাদি পরিত্যাগ করিয়া মাত্র একপল মাঠা অর্থাৎ ঘোল পান করিয়া দিবারাত্র অতিবাহিত করিতেন, সেই সময় দাস ব্রজনামে জনৈক শ্রীকুণ্ডবাসী ব্রাহ্মণ প্রত্যহ তাঁহার এই মাঠা (ঘোল) যোগাইতেন। একদিন তিনি গোচারণ করিতে করিতে গোবর্দ্ধন সন্নিকটস্থ সখীস্থলীতে গমন করিলে তথায় বৃহৎ পলাশ পত্র দেখিয়া শ্রীদাস গোস্বামীর

কথা মনে উদয় হওয়ায় তিনি সেই পত্র গৃহে আনিয়া দোনা প্রস্তুত করতঃ তাহাতে মাঠা লইয়া গোঁসাইজীর সমীপে উপনীত হইলে গোঁসাইজী বলিলেন—এই বৃহৎ পত্র আজ কোথায় পাইলে? তিনি বলিলেন সখীস্থলী হইতে আনিয়াছি। গোস্বামীপাদ সিদ্ধ স্বরূপের আবেশে সেই দোনা দূরে ফেলাইয়া দিয়া বলিলেন—চন্দ্রাবলীর ঐ গ্রামে আর কোন দিন যাবে না। এই গ্রামের দেড়মাইল উত্তর পশ্চিম কোণে শক্রোয়া গ্রাম অবস্থিত। এই স্থানে সখীগণ শ্রীকৃষ্ণকে শপথ করাইয়াছিলেন। শপথে শ্রীকৃষ্ণ সখীগণকে বলিয়াছিলেন আমি "শ্রীরাধিকা-বিনু কভু না জানিয়ে আর।"

নিমগাঁও—সখীস্থলীর দেড়মাইল উত্তরে অবস্থিত। শ্রীগোবর্দ্ধন ধারণের পর গোপ গোপী এখানে শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মঞ্ছন করিয়াছিলেন। এই গ্রাম নিম্বাদিত্যের বাসস্থান।

পাড়ল—বর্ত্তমান নাম পাড়ল ইহা নিম গাঁয়ের দুই-মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে সখীসঙ্গে শ্রীরাধিকা পাটল পুষ্প চয়ন করিয়াছিলেন।

কুঞ্জেরা—পাড়লের দেড়মাইল পূর্ব্বে এবং শ্রীরাধা-কুণ্ডের দেড় মাইল উত্তরে কিঞ্চিৎ পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এই স্থান পর্য্যন্ত শ্রীরাধাকুণ্ডের কুঞ্জাদির সীমা বর্ণিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন এখানে শ্রীরাধিকা অষ্টসখীর সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত কৌতুক করিবার নিমিত্ত কুঞ্জরের লীলা অভিনয় করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কৌশলে শ্রীকৃষ্ণ

পরম সন্তুষ্ট হইয়া কুঞ্জররাজ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। সেই অবধি এইস্থানের নাম কুঞ্জরাজ অথবা কুঞ্জরা বলিয় সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।

পালী—ইহা কুঞ্জরার দেড়মাইল বায়ুকোণে অবস্থিত। পালিকা নামে যুথেশ্বরীর এখানে বাসস্থান এই হেতু পালী বলিয়া পরিচিত।

ডেরাবলী—এই গ্রাম পালীর দেড়মাইল বায়ুকোণে অবস্থিত। ব্রজরাজ শ্রীনন্দমহারাজ সটিখরা হইতে শ্রীনন্দীশ্বরে যাইবার কালে এইস্থানে ডেরা স্থাপন করিয়া রাত্রবাস করিয়াছিলেন, সেই হইতে এই গ্রাম ডেরাবলী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার দেড়মাইল ঈশানে বড়ভন্না!

সাহার—বড়ভন্নার দুই মাইল উত্তরে, শ্রীনন্দমহারাজের অগ্রজ শ্রীউপানন্দ এইস্থানে বাস করেন।

শ্রীসূর্য্য কুণ্ড,—নামান্তর ছোট ভন্না—শ্রীমতী বৃষভানু নন্দিনী প্রাণবল্লভের দর্শনোৎকণ্ঠায় মধ্যাহ্নলীলায় সূর্য্যপূজার ছলে সখীগণের সহিত এখানে আগমন করিয়া থাকেন। গোধন ও সম্পদ বৃদ্ধির নিমিত্ত দেবী পৌর্ণমাসীর আদেশে জটিলা শ্রীরাধিকাকে সূর্য্যপূজার নিমিত্ত কুন্দলতার হস্তে অর্পণ করিলে কুন্দলতা শ্রীরাধিকার সহিত বিবিধ রসপ্রসঙ্গে সূর্য্যপূজার ছলে চলিয়াছেন, সঙ্গে সখীগণও সূর্য্যপূজার সামগ্রী লইয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে সূর্য্যকুণ্ডে চলিয়াছেন, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ রঙ্গে সখাগণের সহিত গোবর্দ্ধনে আসিয়া

উপনীত হইয়াছেন, কুন্দলতা ইহা অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত তুলসী মঞ্জরীকে দিয়া শ্রীরাধিকার সংবাদ সহ মাল্যাদি পাঠাইয়া দিলেন। তুলসী মাল্যাদি লইয়া কৃষ্ণের নিকটে আগমন করিলে শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিবার নিমিত্ত সূর্য্যকে প্রণাম করিয়া সূর্য্য পূজার ছলে সখীসঙ্গে পথের দিকে বাহির হইয়া শ্রীকুণ্ডের নিকট কন্দর্প কুহলি নামে পুষ্প বাটিকায় পুষ্প চয়ন ছলে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তুলসীর মুখে শ্রীরাধার সংবাদ পাইয়াই সানন্দে মধুমঙ্গলের সহিত সেই পুষ্পবাটিকায় প্রবেশ করিয়া সসখী শ্রীরাধার দর্শন পাইলেন। উভয়ে উভয়কে দর্শন করিয়া প্রেমসিন্ধু উচ্ছলিত হওয়ায় শ্রীঅঙ্গে বিবিধ ভাবাবলী প্রকাশ পাইল। মধ্যাহ্ন কালের মিলনে প্রথমে কন্দর্প যজ্ঞ আরম্ভ হইল, পরে কুন্দলতা যজ্ঞের আচার্য্যে সূর্য্যপূজা সম্পন্ন হইল। এই গ্রামের একমাইল পূর্ব্বে পেকুঁ ইহার উত্তরে সীমার গ্রাম, ইহা সীমান্ত গ্রাম।

ভাদার—ইহা পেকুঁ, গ্রামের দুই মাইল অগ্নিকোণে, ইহা যুথেশ্বরী শ্রীভদ্রা সখীর গ্রাম।

কোনাই—ভাদারের দেড়মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। একদা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার বিরহে দূতীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "কোও না আই"। সেই অবধি এস্থানের নাম কোনাই।

বসতি-কোনাইয়ের দেড়মাইল পূর্ব্ব ও দক্ষিণে অবস্থিত। ইহার দুই মাইল পশ্চিমে রাধাকুণ্ড, পরিক্রমার্থীর রাধাকুণ্ডে আসিয়া গোবর্দ্ধন হইয়া যাবককুণ্ডে গমনীয়।

যাবক কুণ্ড,—নামান্তর মেহেন্দার কুণ্ড—এই কুণ্ড গোবর্দ্ধনের একমাইল পশ্চিমে রাস্তার সন্নিকটে।

গাঁঠুলী—ইহা গোবর্দ্ধন গ্রামের দুইমাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে সসখী শ্রীললিতা যুগল কিশোরের বস্ত্রে বস্ত্রে গ্রন্থি বন্ধন করিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। এইহেতু এই গ্রাম গাঁঠুলী বলিয়া খ্যাত। কথিত আছে এক দিন শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে আসিয়া কুঞ্জের শোভা দর্শন করিতে করিতে প্রফুল্লিত কুসুমরাজির সৌরভ্যে তাঁহার মনঃ বিহ্বল হইয়া উঠিল। তখন মুরলীতে রাধা রাধা বলিয়া ফুৎকার করিলে সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পুরিত হইল এবং নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল, বৃক্ষগণকে দেখিয়া বলিতেছেন বল-দেখি আমার প্রাণপ্রিয়া শ্রীরাধিকা কোথায়? আমি তাহা-কেই খোঁজ করিতেছি, তাহার সংবাদ দানে আমাকে সুস্থির কর? কিন্তু বৃক্ষের নিকট প্রিয়ার কোন সংবাদ না পাইয়া প্রিয়ার আগমন পথে নয়ন প্রেরিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, এমনি সময়ে শ্রীকৃষ্ণ কথারসে আনন্দিতা সসখী শ্রীরাধা কুঞ্জে আসিয়া উপনীতা হইলে শারী তাহাদের সম্মুখে গিয়া বলিতে লাগিল, শ্রীকৃষ্ণ পুলকিত অঙ্গে ব্যাকুল হইয়া তোমার নিমিত্ত সাতিশয় বিলাপ করিতেছেন, শ্রীরাধিকা শারিকার মুখে প্রাণ-কোটি প্রিয়তমের এই বার্ত্তা পাইয়া অশ্রুধারায় বক্ষঃপ্লাবিত করিতে করিতে কোথায় আমার প্রাণপ্রিয় একবার দেখা দাও বলিতে বলিতে দ্রুতগতিতে প্রাণবল্লভের নিকট উপনীতা

হইলেন। অনন্তর উভয়ে উভয়কে বাহু পসারিয়া গাঢ়ালিঙ্গনে আবদ্ধ করতঃ বদনে বদন অর্পিয়া দুঁহু দোঁহার অধর রসাস্বাদনে মত্ততা বশতঃ বাহ্যস্মৃতি হারাইলেন এবং উদ্দাম বিলাসে প্রমত্ত হওয়ায় উভয়ের বসনভূষণও স্খলিত হইয়াছিল, ইহা দেখিয়া শ্রীললিতা অতি ধীরে ধীরে দিব্যাতিদিব্য নবদম্পতির নিকট আগমন করতঃ দোঁহার অঞ্চলে গ্রন্থি বন্ধন করিয়া পুনঃ সখীগণের সহিত মিলিত হইয়া যুগলের যুগলিত মাধুরী সন্দর্শনে আনন্দ পাথারে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর যুগল কিশোর রত্নাসনে উপবেশন করিলে সখীগণ চতুঃপার্শ্বে আসিয়া মিলিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে তাহাদের সহিত হাস্য পরিহাস করিতে লাগিলেন। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্র গ্রন্থি দেখিয়া আনন্দে বলিলেন—আমাদের এই বস্ত্র গ্রন্থি কে দিয়াছে? আমাদের উভয়ের অন্তরের যে গ্রন্থি তাহা আজ বাহিরে প্রকাশ করিয়া এই অত্যাশ্চর্য্য কাজ কে করিল? তখন ললিতা বলিলেন—শোন কৃষ্ণ! ইহা প্রেমেরই বিলক্ষণ স্বভাব, যাহার অন্তরে প্রেম উদয় হয়, তাহার বাহ্যবৃত্তিও লয় হয় এবং তৎকালে প্রেমানন্দে মগ্ন হওয়ায় অন্তরের গুহ্যকথা সহজেই প্রকাশ হইয়া যায়, তখন আপনে ভুলিয়া অন্যকেও ভুলায়, এইহেতু তোমাদের বসনে গ্রন্থি। ললিতার বাক্যামৃতে নবদম্পতি হাসিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীরাধিকার ইঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত সখীগণের সহিত চুম্বনালিঙ্গনাদি বিবিধ রসক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। গোবর্দ্ধনের দুইমাইল পশ্চিমে এই গাঁঠুলীতে বসন্তকালে হোলীর

সময় সখীগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের বস্ত্রে বস্ত্রে গ্রন্থি বন্ধন করিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন, এই হেতু এই গ্রাম গাঁঠুলী বলিয়া খ্যাত।

শ্রীগোপাল কুণ্ড—গাঁঠুলির অগ্নিকোণে, হোলী লীলান্তে তাঁহারা যে কুণ্ডে স্নান করিয়া শ্রীঅঙ্গের কুঙ্কুম গোলালাদি ধৌত করিয়াছিলেন সেই কুণ্ড গোলালকুণ্ড বলিয়া প্রসিদ্ধ এই কুণ্ডের উপর শ্রীবল্লভাচার্য্যের উপবেশন স্থান।

বেহেজ—গাঁঠুলির চার মাইল পশ্চিম। এখানে ইন্দ্র সুরভীকে সহায় করিয়া স্বীয় অপরাধ ক্ষমা ভিক্ষার জন্য অতি দৈন্যভরে শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিয়াছিলেন। গ্রামের পশ্চিমে শ্রীবলভদ্র কুণ্ড ও দাউজী মন্দির দর্শনীয়। বেহেজের পশ্চিমে দুইটি রাস্তা, বায়ুকোণের রাস্তায় গমন করিলে দেবাশীর্ষ ও মুনিশীর্ষ কুণ্ড হইয়া পরমাদরায় যাওয়া যায়, পশ্চিমের রাস্তায় গেলে লাঠাবন অর্থাৎ দিগ হইয়া পরমাদরায় যাওয়া যায়। বেহেজ হইতে দিগ দুই মাইল পশ্চিমে, এই গ্রাম সীমার বাহিরে অবস্থিত। কিন্তু কাম্যবনে যাওয়ায় সুবিধাজনক বলিয়া এখন পরিক্রমা যাত্রীকগণ দেবশীর্ষ ও মুনিশীর্ষ না যাইয়া দিগ হইয়াই যাইয়া থাকেন। দিগ হইতে তিন মাইল বায়ুকোণে পরমাদরা গ্রাম অবস্থিত।

দেবশীর্ষকুণ্ড—বেহেজের অনুমান চারিমাইল বায়ুকোণে অবস্থিত। এখানে সখাগণ সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে গোচারণ ও নানাবিধ বিচিত্র খেলা করিতে দেখিয়া দেবতাগণ বিবিধ স্তুতি

করিয়াছিলেন।

মুনিশীর্ষকুণ্ড—ইহা দেবশীর্ষের সামান্য ব্যবধানে অবস্থিত। এখানে মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন পাইবার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন।

শ্রীপ্রমোদনা, বর্ত্তমান নাম পরমাদরা—ইহা দেবশীর্ষের তিন মাইল বায়ুকোণে অবস্থিত। এখানে শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ অপূর্ব্ব বিলাস দ্বারা শ্রীব্রজসুন্দরীগণকে প্রমোদিত করিয়াছিলেন। গ্রামের পূর্ব্বে চরণকুণ্ড এবং উত্তর দিকে শ্রীকৃষ্ণ কুণ্ড অবস্থিত। কৃষ্ণকুণ্ডের উত্তরতীরে শ্রীসুদাম সখার শ্রীমূর্ত্তি বিরাজমান।

শ্রীবদরীনারায়ণ—পরমাদরার দেড় মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। মন্দিরের পূর্ব্বভাগে অলকানন্দ কুণ্ড, তাহার পূর্ব্ব ভাগে কদমখণ্ডী। শ্রীবদরীনারায়ণ দর্শন করিয়া কেহ কেহ কাম্যবন অভিমুখে গমন করেন। সেই সময় রাস্তায় সেউকন্দরা নামান্তর সেউঘাটি ও ইন্দ্রলী গ্রাম পাওয়া যায়।

সেউকন্দরা—নামান্তর সেউ শ্রীবদরীনারায়ণের দেড় মাইল উত্তরে। তাহার পরে এক মাইল বায়ুকোণে ঘাট। এই গ্রাম দুইটি পর্ব্বতের মধ্যদেশে বিরাজমান। শ্রীবল্লভাচার্য্য সন্তানগণের স্থান। তদনন্তর চারিমাইল বায়ুকোণে ইন্দ্রালীগ্রাম। ইন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ আরাধনার স্থল। তাহার দুই মাইল বায়ুকোণে কাম্যবন। যাঁহারা শ্রীবদরীনারায়ণ দর্শন পূর্ব্বক শ্রীআদিবদ্রীনাথ দর্শন করিয়া শ্রীকাম্যবনে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের পক্ষে গোহনা হইয়া সুগম।

গোহনা—শ্রীবদরী নারায়ণের এক মাইল দক্ষিণ। শ্রীসুদামার জন্মস্থান। তাহার দুই মাইল পশ্চিমে খো গ্রাম, তাহার দুই মাইল পশ্চিমে কর্ম্মখ গ্রাম। এই গ্রামের অগ্নি-কোণে ধবল উত্থান পর্ব্বত। গ্রামের দক্ষিণ দিকে ঘাটি পাহাড় অতিক্রম করিলেই আলিপুর গ্রাম পাওয়া যায়।

শ্রীআদিবদ্রীনাথ—আলিপুরের দেড়মাইল নৈঋতকোণে বিরাজমান। শ্রীআদিবদ্রীনাথ স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি রমণীয়। চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়া অতি উচ্চ পর্ব্বত রহিয়াছে। সেই সমস্ত পর্ব্বতের উপর দিয়া উচ্চ পর্ব্বত থাকায় আদিবদ্রীনাথ ক্ষেত্রে প্রবেশ করা সহজ সাধ্য নহে। শ্রীআদিবদ্রীনাথ ক্ষেত্রের প্রবেশ দ্বারেই আলিপুর গ্রাম রহিয়াছে। আদিবদ্রীতে নারায়ণের তপস্যা স্থল। এই স্থানেই নারায়ণের তপস্যা ভঙ্গ করিবার ও বিঘ্ন ঘটাইবার জন্য ইন্দ্র ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া অনেক অপ্সরাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গ হইতেই শ্রীনারায়ণ দেব স্বীয় বাম উরু হইতে উর্ব্বশীর সৃষ্টি করেন ও ইন্দ্রের দপ চূর্ণ করেন। তপোবনের দক্ষিণে গন্ধমাদন পর্ব্বত, পশ্চিমে কেশর পর্ব্বত, উত্তরে নিষদ পর্ব্বত এবং পূর্ব্বভাগে শঙ্খকূট পর্ব্বত বিরাজমান। প্রাচীরের পুর্ব্বদিকে প্রবেশ দ্বার। তথায় প্রবেশ করিয়া রাস্তার বামভাগে শ্রীমালাদেবীর অতি প্রাচীন ভগ্ন মন্দির এবং প্রবেশকারীর দক্ষিণদিকে শ্রীঅলকানন্দা অবস্থিত। তদনন্তর কিছু অগ্রসর হইয়াই শ্রীআদিবদ্রীনাথ মন্দির এবং মন্দিরের সম্মুখেই তপ্তকুণ্ড। মন্দির অভ্যন্তরে

সারিবদ্ধ ক্রমে সপ্ত শ্রীবিগ্রহ বিরাজমান। প্রথমে শ্রীবদ্রী-নারায়ণ, এই বিগ্রহের একপার্শ্বে কুবের ভাণ্ডারী, অপর পার্শ্বে শ্রীঅন্নপূর্ণা দেবী চতুর্ভুজরূপে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীবদ্রীনাথের দক্ষিণে ধ্যানমগ্ন শ্রীউদ্ধবজী, তাঁহার দক্ষিণে যোগাসনে উপবিষ্ট শ্রীবদ্রীনাথ, তৎপার্শ্বে শ্রীচতুর্ভুজনারায়ণ, তৎপার্শ্বে শ্রীগণেশজীউ, তৎপার্শ্বে শ্রীপার্ব্বতীদেবী, তৎপার্শ্বে শ্রীকেদারনাথ মহাদেব, অগ্রে বৃষভ বিরাজিত। এই আদি-বদ্রির নিভৃত কাননে ১৩দিন যাবৎ শ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলন লীলা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আনন্দময় শ্রাবণের আগমনে মন্দ মন্দ মেঘ গর্জ্জন, বিদ্যুতের ঝলক মাঝে, মাঝে বারিবর্ষণ, মেঘ দর্শনে ময়ূর ময়ূরী পুচ্ছ বিস্তার পূর্ব্বক নৃত্য, কোকিলের কুহু কুহু রব, ভ্রমরের গুঞ্জন, বৃক্ষরাজি ফলফুলে সমৃদ্ধিশালী হইয়া মৃদু মন্দ পবন সঞ্চারে আন্দোলিত হইতেছে। সেই কাননে মণিময় রত্ন হিন্দোলের চন্দ্র সূর্য্য বিনিন্দিত সিংহাসনে আরূঢ়া নবযৌবন দ্যুতিতে চতুর্দ্দিক সমুদ্ভাষিত অতি সুকুমারী শ্রীরাধিকাকে কোন সখী মৃদু মন্দ দোলাইতেছে, আবার কোন সখী সুমধুর স্বরে গান করিতেছে, কিন্তু প্রাণ-কোটি প্রিয়তম শ্রীগোবিন্দের আগমনে বিলম্ব দেখিয়া একাকী শ্রীরাধার মনে কোনটিই আনন্দ প্রদ হইতেছে না, তিনি প্রাণ প্রিয়ের আগমন পথে নয়ন প্রেরণ করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। ইতি মধ্যে অখিল রসামৃত মূর্ত্তি গোপ কিশোর শ্রীশ্যামসুন্দর ঝুলন সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া বনভূমিকে সমুজ্জ্বল করিতে

করিতে সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইলেন। সসখী শ্রীরাধা তাঁহাকে দর্শন করিয়া পরমানন্দিত হইলেন। অনন্তর রাধা সঙ্গে শ্যাম ঝুলনোপরি উপবেশন করিলে সখীগণ পরম আনন্দে নৃত্য গীত সহকারে ঝুলা ঝুলাইতে আরম্ভ করিলেন। সকলের বিভিন্ন বর্ণের বসন ও অলঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিত হইয়াছেন এবং ঝুলনের ঝোকে ঝোকে কণ্ঠমণিহার দোদুল্যমান হইতেছে, চতুর্দ্দিক অগুরু কস্তুরি গন্ধে আমোদিত হইয়াছে, যুগল কিশোরের অধর যুগল তাম্বুল রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, ঝুলার ঝোঁকে ঝোঁকে শ্রীরাধিকা কখনও কখনও চমকিত হইয়া প্রাণবধুকে জড়াইয়া ধরিতেছেন। রঙ্গী রসময় শ্রীশ্যাম সখীগণকে আরও জোড়ে ঝুলাইতে ইঙ্গিত করিলে সখীগণও যুগলের অভিপ্রায় অবগত হইয়া আরও জোড়ে ঝুলাইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে অতি চকিত দেখিয়া দুইভুজ লতাদ্বারা বক্ষে আবদ্ধ করিলেন। যুগলের ঝুলন লীলা দর্শন করিয়া সখীগণ আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হইলেন। কাননের পশু পক্ষী গণও স্থগিত গতিতে অনিমেখ নয়নে যুগল কিশোরের শোভা দর্শন করিয়া আনন্দে নিমগ্ন হইল। শ্রীবদ্রীনাথ মন্দিরের পশ্চিমে অর্দ্ধমাইল অগ্রসর হইয়া সুগন্ধি শিলা, বর্ত্তমান নাম হরকি পেড় বা হরিদ্বার। শ্রীবদ্রীনাথ হইতে পুনর্ব্বার আলিপুরে আগমন করিয়া দুই মাইল উত্তরে পশপ গ্রাম অবস্থিত।

পশপ-এই গ্রাম আলীপুরের দুইমাইল উত্তরে অবস্থিত

এই গ্রামে দুইটি রাস্তা, কেহ কেহ এখান হইতে পাঁচমাইল উত্তরে কাম্যবনে গমন করেন, আবার কেহ কেহ পশপের পাঁচ মাইল পশ্চিমে শ্রীকেদারনাথ দর্শন করিয়া কাম্যবনে গমন করেন

শ্রীকেদারনাথজীউ – ইহা পশপের পাঁচমাইল পশ্চিমে, পশপ হইতে কেদার নাথ যাইবার সময় রাস্তায় বালীগ্রাম হইয়া যাইতে হয়। শ্রীকেদারনাথ জীউ অতি উচ্চ পর্ব্বতের উপরিস্থিত শিলাকন্দরে শ্রীপার্ব্বতীদেবী সহ বিরাজমান। কেদার নাথের দুইমাইল ঈশানে বিলোন্দ গ্রাম, ইহার দুই মাইল ঈশানকোণে শ্রীচরণ পাহাড়ী, তাহার দুই মাইল ঈশানকোণে কামাবন অর্থাৎ কেদারনাথ হইতে ছয়মাইল ঈশানে কাম্যবন।

শ্রীকাম্যবন

চতুর্থং কাম্যকবনং বনানাং বনমুত্তমম্ ।
তত্র গত্বা নরো দেবি ! মমলোকে মহীয়তে ॥

বনসমূহের মধ্যে অত্যুত্তম কাম্যবনই চতুর্থবন। এই বনে গমন করিলে মানুষ আমার লোকে পূজিত হয়। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সখীগণের প্রহেলীতে ঐশ্বর্য্যময়ী শ্রীরঘুনাথলীলা কথা উপস্থিত হইয়াছিল। একদা সসখী শ্রীরাধাকৃষ্ণ নানা কৌতুক সহ বিহারে মত্ত হইলে সেইকালে বৃক্ষাবলীতে পরিবেষ্টিত পক্ষীগণের কূজনে মুখরিত একটি সরোবর দেখিয়া তথায় উপবেশন করিলে সখীগণ যুগলের চতুপার্শ্বে ক্রমানুসারে দণ্ডায়মান হইয়া সেবা করিতেছিলেন। এদিকে বৃক্ষশাখায়

বানরগণও আনন্দ করিতেছিল। কেহ লম্ফ দিয়া বৃক্ষের উপরে উঠিতেছিল, কেহ বা সরোবর লঙ্ঘন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতেছিল। কেহ বা নানা প্রকার শব্দ করিতেছিল। তাহা দেখিয়া ললিতা বিশাখাকে বলিলেন—পূর্ব্বকালে শ্রীরঘুনাথ সীতাকে হারাইয়া বানরগণকে সঙ্গে লইয়া বনে বনে সীতা অন্বেষণ করিতেছিলেন, অবশেষে রঘুনাথ পক্ষীর মুখে সীতার সংবাদ পাইয়া রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যম করেন। কিন্তু রাবণের ভবন লঙ্কাপুরীতে এই হেতু সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া সেখানে কেহই যাইতে পারিত না। রঘুনাথের সঙ্গে মহাবলবান্ এক হনুমান ছিল, সেইই সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াছিল ইহা প্রাচীনের মুখে শুনিয়াছি। ললিতার কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—ললিতে! আমিই সেই রঘুনাথ দেখ না—বানরগণ আমাকে দেখিয়া সরোবর লঙ্ঘন করিয়া আমার শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেছে। আমিই সেই রাম, তাহার সহিত আমার কোন ভিন্নতা নাই। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে সখীগণ শ্রীরাধিকার মুখাবলোকন করিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে বলিল নন্দনন্দন! অসম্ভব কথা কেন বল? মহাপরাক্রমশালী, ধনুর্দ্ধারী মহারাজ দশরথ পুত্র শ্রীরামচন্দ্র। যাঁহার বাণে ত্রিভুবন কম্পিত হইত, যিনি সীতা ভিন্ন আর কিছুই জানিতেন না। তুমি নিজেকে সেই রঘুনাথ বল ইহা অতীব অসম্ভব কথা। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন শোন ললিতে! রঘুনাথের সহিত আমার নাম মাত্র ভিন্ন, সমস্ত কারণ একই,

আমি তখন ছিলাম শ্রীদশরথ নন্দন, সীতাভিন্ন আর জানিতাম না, সম্প্রতি আমি শ্রীব্রজরাজ নন্দন, রাধা সঙ্গে সদা বিহার করি। পূর্ব্বে আমার শরাঘাতে ত্রিভুবন কম্পিত হইত এখন আমার বংশীস্বরে সমস্ত স্থাবর জঙ্গম কম্পিত, সুতরাং কারণ একই. ভিন্ন মাত্র কায়। তখন ললিতা বলিল—রঘুনাথ পাথরাদি দিয়া সমুদ্র বন্ধন করিয়া লঙ্কায় গিয়াছিল, তুমি পাথর দিয়া সরোবর বাঁধ দেখি? তোমার কাজ দেখিলে তবেই মানিব, নতুবা তোমার কথায় আমরা বিশ্বাস করি না। ললিতার বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ বলিল—তোমরা পাথর আন, আমি অবশ্যই সমুদ্র বন্ধন করিব। তখন সখীগণ বলিল তুমি যদি রঘুনাথ হও, তবে বানরকে পাথর আনিতে আদেশ কর, তাহারাই পাথর আনিবে, আর তুমি সমুদ্র বন্ধন করিবে। সখীগণের বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ বানরগণকে পাথর আনিতে আদেশ করিলে বানরগণ পাথর আনিয়া সরোবর তীরে রাশি করিল, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার বদনকমল অবলোকন করিয়া মধুর স্বরে বলিলেন—রাধে! তুমি যদি আমার প্রাণপ্রিয়া হও তাহা হইলে আমি অবশ্যই সরোবর বন্ধন করিব।

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ পাথর লইয়া জলের উপরে রাখিলে শ্রীকৃষ্ণের হস্ত স্পর্শে পাথর জলের উপর ভাসিতে লাগিল। ক্রমানুসারে সেতু বন্ধন করিয়া আনন্দিত মনে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সহিত মিলিত হইলে শ্রীবিশাখা বলিল বুঝিলাম তোমার চাতুরী! তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—পাথর দিয়া সরোবর

বন্ধন করিলাম, ইহা আমার চাতুরী কিসের ? আমি ঈশ্বর আমার পক্ষে সবই সম্ভব। তোমরা গোপকন্যা আমার মহিমা তোমরা কি জানিবে ? তখন শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে ললিতা হাঁসিতে হাঁসিতে বলিলেন—হে নন্দনন্দন ! তবে বলি শোন—যারা শক্তি উপাসক বাজীকর, তারা সেই শক্তিবলে নানা কার্য্য করিতে পারে। কখনও শিরে ঘট ধরিয়া দড়ির উপর চলিতে পারে, আবার বাঁসের উপরে উঠিয়া ভূমিতেও পড়িতে পারে, বাজীকরের সেই সমস্ত কার্য্যকে সকলে সত্য মনে করিলেও ইহা সবই মিথ্যা। তুমিও সেইরূপ শক্তি আরাধনা করিয়া সেই শক্তিসিদ্ধ বিদ্যাবলে সেতু বন্ধন করিয়াছ, ইহা তোমার চাতুরী ভিন্ন আর কিছুই নয়। ললিতার বাক্যে সখীগণ সকলে সত্য সত্য বলিয়া হাঁসিয়া উঠিল। এখানে সেই রস-লীলার সাক্ষীভূত সমুদ্র বন্ধনাদি ঐশ্বর্য্যময়ী লীলা মাধুর্য্যময়ী লীলা কল্লোলে বিলীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সেতুবন্ধ লীলার সন্নিকটে শ্রীরাধাগোবিন্দের অপর একটি মনোরম লীলা সংঘটিত হইয়াছিল, যাহা লুক্কায়ণ লীলা বলিয়া অভিহিত। একদিন শ্রীকৃষ্ণ ললিতাকে বলিলেন ললিতে ! তুমি প্রধানা হইয়া যাহা আদেশ করিবে আজ সেই নিয়মে খেলা হইবে। শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিয়া ললিতা বলিল কৃষ্ণ ! তবে বলি শোন-তুমি সখীগণকে সঙ্গে লইয়া কুঞ্জে গমন কর, তার পর আমি যখন তোমাদিগকে ডাক দিব সেই সময়ে সকলের আগে আসিয়া আমাকে যে স্পর্শ করিবে সেই জিতিবে, আর

সকলের পিছে যে আসিবে সেই হারিবে। ইহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ খেলারঙ্গে সসখী শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়া কুঞ্জে প্রবেশ করিলে কিয়দনন্তর ললিতা এস এস বলিয়া উচ্চ আহ্বান করিলে বলিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ সকলের আগে আসিয়া ললিতাকে স্পর্শ করিল এবং মন্থর গামিনী শ্রীরাধা সকলের পাছে আসিয়া ললিতার সম্মুখে আসিয়াবসিয়া পড়িল। এদিন খেলার পণানুসারে ললিতা শ্রীরাধার নেত্র বন্ধ করিল, কিন্তু ললিতার হস্তগ্রন্থি হইতে শ্রীরাধা সকলের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়াছিল। এদিকে স-সখী কৃষ্ণ কুঞ্জান্তরে লুকাইয়া গেলে ললিতা রাধিকার নেত্র হইতে হস্ত তুলিয়া বলিল, দেখ বৃষভানুসুতে! তুমি আগে যাকে স্পর্শ করিবে সেই খেলায় হারিবে। পণানুসারে শ্রীরাধা সত্বরই শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জে প্রবেশ করিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তমা-লের কোলে এমন ভাবে লুকাইয়াছিল যে শ্রীরাধিকা বহু অন্বেষণ করিয়াও কৃষ্ণকে চিনিতে পারিতেছে না, ইহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ মন্দ মন্দ হাঁসিতে হাঁসিতে তমালের কোল হইতে রাইয়ের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিল। এদিকে শ্রীরাধা বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, একি তমালের কোলে আবার অরুণ বরণ কোথা হইতে আসিল, এই ভাবে রাই তমাল সন্নিধানে গমন করিলে অনবধান বশতঃ অকস্মাৎ তাঁহার হস্ত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে লাগিলে শ্রীকৃষ্ণ সানন্দে উঠিয়া শ্রীরাধাকে হৃদয়ে ধরিয়া বদনে চুম্বন করিল এবং হৃদয়ে হৃদয়, নয়নে নয়ন অর্পিয়া দৃঢ়ালিঙ্গনে নিভৃত নিকুঞ্জে মনোসাধ পূর্ণ করিলেন। তদনন্তর

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধরিয়া দ্রুতগতিতে ললিতার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর সখীগণও ক্রমে ক্রমে আসিয়া ললিতার নিকটে উপস্থিত হইল। এবার ললিতা দুই হস্ত দিয়া শ্রীকৃষ্ণের নেত্র আচ্ছাদন করিল এবং সখীসহ শ্রীরাধা শীঘ্রই কুঞ্জ মধ্যে লুকাইলে ললিতা শ্রীকৃষ্ণ নেত্র হইতে হস্ত তুলিয়া নিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্রই শ্রীরাধার কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া সেই কুঞ্জের মনোহর পুষ্পোদ্যানের সুন্দর সৌরভে সর্ব্বদা মধুকর ভ্রমণ করিতেছে দেখিয়া পরমানন্দিত হইল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রাধাঙ্গ স্পর্শের লালসায় সাতিশয় উৎকণ্ঠিত চিত্তে অনুসন্ধান করিয়াও কোথাও তাহার দর্শন না পাইয়া ব্যাকুল হইয়া বলিতে লাগিল ওগো প্রেমময়ী রাধে কোন কুঞ্জে আছ, একবার কুক দেও, তোমার অদর্শনে আমার প্রাণ বিকল, ওগো রাধে! একবার দয়া প্রকাশিয়া দেখা দেও। প্রাণকোটি প্রিয়তমের বৈকুল্য শুনিয়া সরলা শ্রীরাধা সখীসঙ্গে কুক দিল, সেই কুক শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে সেই কুঞ্জে প্রবেশ করিল। কিন্তু এমনই বৈচিত্র্য যে, রাধাদি ব্রজবালা প্রবিষ্ট-কুঞ্জের বৃক্ষ, পুষ্প, লতা, পাতা সকলেই হেমময়, আর শ্রীরাধা ও তাঁহার সখীগণ তাঁহারাও কাঁচা কাঞ্চন বর্ণ এবং তাহাদের বসন ভূষণও তদ্রূপ হওয়ায় সেই হেমময় কুঞ্জের মধ্যে কে যে কোথায় লুকাইয়া আছে বহু সন্ধান করিয়াও মদন তরঙ্গে আন্দোলিত সর্ব্ব সমর্থ শ্রীকৃষ্ণ তাহা চিনিতে সমর্থ হইল না! এইরূপে পুনঃ পুনঃ বহু যত্ন করিয়া এবং একদৃষ্টি চারিপার্শ্বে

নিরীক্ষণ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ চিনিতে পারিতেছে না, সখীগণ কুঞ্জান্তর হইতে ইহা দেখিয়া মৃদু মন্দ হাসিতে লাগিল। তাঁহাদের হাস্যধ্বনি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ একদৃষ্ট্যে সেই দিকে তাকাইয়াও রাইকে কোন প্রকারে চিনিতে না পারিয়া অবশেষে শ্বেত, রক্ত, নীল ও পীত বর্ণের আশ্চর্য্য পুষ্প দেখিয়া সেই কুঞ্জে প্রবেশ করিল। শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জ প্রবেশ দেখিয়া সখীগণও সেই কুঞ্জ ত্যাগ করিয়া অন্য কুঞ্জে গমন করিল. ইহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভাবিতে লাগিল, এতো বড়ই আশ্চর্য্য! বৃক্ষগণ কি নুপুরাদির শব্দ করিয়া চলিতে পারে? এখন বুঝিলাম এই কুঞ্জেই সখীগণের সঙ্গে রাইধনী লুকাইয়াছিল, আমাকে দেখিয়া অন্য কুঞ্জে গমন করিয়াছে সখীগণ দ্রুতগতিতে কুঞ্জ মধ্যে লুকাইয়া গেল কিন্তু মন্থর গামিনী রাই ধীরে ধীরে চলিতেছিল, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্র গিয়া শ্রীরাধাকে হৃদয়ে ধরিয়া গাঢ়ালিঙ্গনে আবদ্ধ করতঃ মনঃসাধ পূর্ণ করিলেন। অনন্তর সকলকে লইয়া ললিতার নিকট গমন করিল। এই প্রকার রসের আস্পদ বহু কুণ্ড ও কুঞ্জাদি এবং যুগল কিশোরের অভিলষিত বহু বনরাজি শোভিত থাকায় ইহা কাম্যবন বলিয়া কথিত হইয়াছে। এখানে এই প্রকার সহস্র সহস্র তীর্থ বিরাজমান। কিন্তু এক সময় এই স্থানে রাক্ষসের বহু উৎপাত হওয়ায় সমস্ত তীর্থ বা কুণ্ডাদির অধিকাংশ লোপ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পুরাণাদি প্রসিদ্ধ বহু তীর্থ লুপ্ত হওয়ায় কেবল তাহাদের নামমাত্র অবশেষ রূপে দৃষ্টি গোচর হইয়া

তীর্থানুরাগীজনের হৃদয়ে তীর্থের শোচনীয় দুরবস্থা স্বতঃই বেদনা বা সমুৎকণ্ঠা উৎপন্ন করিতেছেন। তথাপি এখনও যে সমস্ত তীর্থাদি বিরাজিত আছেন, তাঁহাদেরও নামোল্লেখ অসম্ভব, এই হেতু কেবল মাত্র মুখ্য মুখ্য দর্শনীয় শ্রীমূর্ত্তি ও কুণ্ডাদির নাম বর্ণিত হইতেছে। তন্মধ্যে শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে দর্শনীয় শ্রীমূর্ত্তি ও তীর্থাদি—

শ্রীবৃন্দাদেবী—একটি কিম্বদন্তী আছে কালাপাহাড়ের উৎপাতকালে শ্রীবৃন্দাবনের বিশেষ বিশেষ শ্রীবিগ্রহ স্থানান্তরিত হইবার কালে শ্রীবৃন্দাদেবীও যানবাহনে স্থানান্তরিত হইতেছিলেন, কিন্তু বৃন্দাদেবীর গাড়ী কাম্যবনে আসিয়া উপস্থিত হইলে দেবী আদেশ করিলেন, আমি ব্রজের বাহিরে যাইব না, অতএব আমাকে ব্রজ বাহির করিও না। সেই অবধি শ্রীবৃন্দাদেবী কাম্যবনেই অবস্থান করিতেছেন।

শ্রীবিষ্ণুসিংহাসন—বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়ায় শুক্রবারে এই সিংহাসনে শ্রীনারায়ণের সহিত শ্রীলক্ষ্মীদেবীর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। শ্রীচরণ কুণ্ড শ্রীবৈদ্যনাথ মহাদেব, শ্রীগরুড়, চন্দ্রাভাস, চন্দ্রেশ্বর মহাদেব, বরাহকুণ্ড বরাহকূপ, যজ্ঞকুণ্ড, ধর্ম্মকুণ্ড, নরনারায়ণ কুণ্ড, নীলবরাহ, পঞ্চপাণ্ডব শ্রীহনুমানজী পঞ্চপাণ্ডব কুণ্ড, নামান্তর পঞ্চতীর্থ, শ্রীমণিকর্ণিকা শ্রীবিশ্বেশ্বর মহাদেব এবং শ্রীগণেশজী প্রভৃতি দর্শনীয়।

শ্রীবিমলাকুণ্ডের চতুর্দ্দিকস্থমন্দির ও তীর্থাদি

শ্রীসত্যনারায়ণ, শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীবলদেব, শ্রীচতুর্ভুজ

ভগবান্, সিদ্ধবাবার ভজন কুটীর, শ্রীদাউজী, শ্রীসূর্য্যদেব, নীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেব, শ্রীগোবর্দ্ধন নাথ, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীকাম্যবন বিহারী, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীবিমলা দেবী, শ্রীবিমলা বিহারী, শ্রীমুরলী মনোহর, শ্রীগঙ্গাজী, শ্রীগোপালজী, শ্রীবিহারীজীউ।

শ্রীবিমলাকুণ্ডের নিকটস্থ তীর্থাদি—

মনোকামনা কুণ্ড, কামসরোবর, এই কুণ্ডদ্বয় বিমলাকুণ্ড ও যশোদা কুণ্ডের মধ্যভাগে একত্র অবস্থিত এবং ইহার মধ্যদেশে দেবকীকুণ্ড ও নারদকুণ্ড বিরাজমান। তদনন্তর লঙ্কাকুণ্ড নামান্তর সেতুবন্ধ কুণ্ড, ইহার তীরে শ্রীরামেশ্বর মহাদেব, তদনন্তর শ্রীপ্রয়াগ কুণ্ড ও পুষ্কর কুণ্ড এই দুই কুণ্ড একত্র অবস্থিত অনন্তর অগস্ত্যকুণ্ড ও গয়াকুণ্ড একত্র অবস্থিত। গয়াকুণ্ডের দক্ষিণভাগের নাম অগস্ত্য ঘাট বলিয়া প্রসিদ্ধ।

শ্রীকাম্যবনস্থ গ্রামের বহির্দেশস্থ তীর্থাদি—

কাশীকুণ্ড মণিকুণ্ড, এই দুই কুণ্ড অবস্থিত। শ্রীচন্দ্রশেখর মহাদেব, অক্ষিনিমীলন কুণ্ড বা লুক্‌লুকানি কুণ্ড, এই কুণ্ডের মধ্যে কমলাকর সরোবর ও জলক্রীড়ন কুণ্ড একত্র অবস্থিত। অনন্তর ধ্যানকুণ্ড ও তপকুণ্ড একত্র অবস্থিত। এই দুই কুণ্ড লুক্‌লুকানি কুণ্ড ও চরণপাহাড়ীর মধ্যদেশে চরণপাহাড়ী বিহ্বল কুণ্ড পঞ্চসখা কুণ্ড একত্র অবস্থিত। পঞ্চসখা যথা— রঙ্গিলা, ছবিলা, জকিলা মতিলা ও দতিলা এইকুণ্ড অঙ্গরাবলী গ্রামের সন্নিকট। এই কুণ্ডের মধ্যদেশে শ্রীশ্যামকুণ্ড

ও মোহিনীকুণ্ড একত্র অবস্থিত। ইহার পরে শ্রীকৃষ্ণের মাতামহী শ্রীপাটলা দেবীর ঘোষরাণীকুণ্ড, এই কুণ্ড তীরেই শ্রীযশোদা মাতার পিত্রালয় পরে দ্বারকাকুণ্ড, সোমতিকুণ্ড, মানকুণ্ড, বলভদ্রকুণ্ড, এই চারিকুণ্ড পরস্পর অবস্থিত। অনন্তর চতুর্ভুজ কুণ্ড, ললিতা কুণ্ড ও বিশাখা কুণ্ড এই দুই কুণ্ড একত্র অবস্থিত। কুণ্ড তীরে মানসী দেবী বিরাজিত।

শ্রীকাম্যবন গ্রাম মধ্যস্থ দর্শনীয় বিগ্রহ ও তীর্থাদি যথা—

শ্রীরাধামোহন, শ্রীকোটেশ্বর মহাদেব, কল্যাণরায়, চৌরাশী খাম্বা, নামান্তর কামসেন রাজার কাছারী, শ্রীগোপীনাথ জীউ শ্রীমুরলী বিলাস গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে—শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীমতী জাহ্নবা ঠাকুরাণী শ্রীরামাই প্রভু ও উদ্ধারণ ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিলে, তৎকালে শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীগোপালভট্ট ও শ্রীজীব প্রমুখ গোস্বামীবৃন্দ সকলেই তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনাদি করতঃ তাঁহারা সঙ্গে লইয়া শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন প্রভৃতি বিগ্রহ দর্শন করাইয়াছিলেন এবং শ্রীমতী জাহ্নবা মাতা শ্রীমুখে শ্রীগো বন্দ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন প্রভৃতি শ্রীমূর্ত্তির মহিমা বর্ণন দ্বারা গোস্বামিবৃন্দকে আনন্দ সাগরে নিমর্জ্জিত করতঃ স্বয়ংও আনন্দ সহকারে শ্রীবৃন্দাবনের দর্শন ও পরিক্রমাদি করিতেছিলেন। কিন্তু শ্রীপাট খড়দহ গমনে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া শ্রীরামাই প্রভু অনুযোগ করিলেন—মাগো! শ্রীকাম্যবন দর্শন কতদিনে হইবে? শ্রীরামাই প্রভুর আগ্রহা-

তিশয় দেখিয়া শ্রীজাহ্নবা মাতা শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীব প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীদাস গোস্বামিকে দর্শন দিয়া কাম্যবনে আগমন করিলেন। কাম্যবনে শ্রীগোবিন্দাদি দর্শন করিয়া শ্রীগোপীনাথ মন্দিরে আগমন করতঃ প্রাণবল্লভ শ্রীগোপীনাথের দর্শন করিয়া সাতিশয় আনন্দ ভরে শ্রীগোপীনাথের নিমিত্ত স্বহস্তে রসুই করিয়া ভোগ সমর্পণ করিলেন। অনন্তর সন্ধ্যাকালে শ্রীরূপ শ্রীসনাতন প্রমুখ গোস্বামিগণ আকুল আবেগভরে শ্রীগোপীনাথের সম্মুখে সঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকিলে শ্রীমতী জাহ্নবা মাতা শ্রীগোপীনাথের আরত্রিক আরম্ভ করিলেন। আরত্রিক অন্তে ঠাকুরাণী শ্রীগোপীনাথকে প্রণাম ও পরিক্রমা করিয়া বাহিরে আসিবেন, অমনি সময়ে শ্রীগোপীনাথ মা জাহ্নবার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করিলে ঠাকুরাণী উলঠিয়া শ্রীগোপীনাথের নয়ন প্রান্তে নয়ন প্রদান করিবা মাত্র শ্রীগোপীনাথ মা জাহ্নবাকে আত্মসাৎ করতঃ প্রীতিভরে স্বীয় বাম পার্শ্বে ধারণ করিলে তিনি সেই শরীরে শ্রীগোপীনাথে লীন হইয়া যান। তদবধি ব্রজের সর্ব্বত্র শ্রীগোপীনাথ জীউর বামপার্শ্বে শ্রীমতী জাহ্নবা মায়ের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজমান। শ্রীগোপীশ্বর মহাদেব, গোপীকুণ্ড নিকটে গন্ধর্ব্বকুণ্ড গোদাবরী কুণ্ড, অযোধ্যাকুণ্ড, এই দুই একত্রে অবস্থিত। সুরভীকুণ্ড, শ্রীকুণ্ড চক্রতীর্থ, দামোদরকুণ্ড, মধুসূদনকুণ্ড, পৃথুদক কুণ্ড, অর্ঘ্যকুণ্ড, অপ্সরা কুণ্ড নামান্তর রমণাভিদ কুণ্ড এই অষ্টকুণ্ড সুরভী কুণ্ডের অন্তর্ভুক্ত, বেদ কুণ্ড, রোহিনী কণ্ড ও

চন্দ্রকূপত্রয় একত্র বিরাজমান। এখানে **ঘিসলিনি স্থান**, বা পিছলিনী শিলা বর্ত্তমান। শ্রীনন্দনন্দন সখাগণের সহিত এই পর্ব্বতে পরমানন্দে বিহার করিয়া থাকেন এই খণ্ডগিরি চন্দ্রসেন পর্ব্বত নামে অভিহিত। সখাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ এই গিরির উপরি ভাগে আরোহণ করতঃ দুইপদ সোজা একসঙ্গে মিলিয়া পর্ব্বতের উপরে বসিতেন, অতি মসৃণ সেই প্রস্তর সঙ্গে সঙ্গেই নীচে নামাইয়া দেয়, পুনরায় এইরূপে বসিলে সঙ্গে সঙ্গেই নীচে নামিয়া যান। খেলানুবন্ধে অতিশীঘ্র গতিতে উঠানামা হয় এই হেতু এই স্থানের নাম পিছলিনী বলিয়া প্রসিদ্ধ। কাম্যবন আজও সেই অতীত স্মৃতি বহন করিয়া দর্শকের চিত্তে আনন্দের উন্মাদনা জাগাইতেছেন। তদনন্তর শ্রীবলদেব চরণচিহ্ন, মেধাবী মুনির কন্দর, নামান্তর **ব্যোমাসুরের গোফা**. একদিন শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে গো-চারণ রঙ্গে কাম্যবনে আগমন করিল, তথায় প্রচুর সুন্দর তৃণাদি দেখিয়া সহর্ষে ধেণু পালকে ছাড়িয়া দিলেন, তাহারা স্বচ্ছন্দে চরিতে লাগিল। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে আনন্দে খেলিতে লাগিল। এই দিন সকলে প্রথমেই চৌর্য্য খেলা আরম্ভ করিল। সখাগণের মধ্যে কতেক সখা নীল পীতাদি কম্বলে অঙ্গ আবরণ করিয়া মেষ হইল, কতেক সখা মেষ রক্ষক হইল, আবার কতেক সখা চৌর সাজিল। কিয়নদন্তর চৌরগণ সঙ্গোপনে মেষ চুরি করিয়া অন্য স্থানে লইয়া যায়, তখন মেষরক্ষকগণ মেষ না দেখিয়া মেষ অন্বেষণ করিত

করিতে দেখিল কতকগুলি চৌর মেষ লইয়া অন্যত্র যাইতেছে, তখন রক্ষকগণ চৌরকে ধরিয়া কৃষ্ণের নিকট লইয়া আসিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল তোমরা এত পরিশ্রান্ত কেন? তদুত্তরে মেষ রক্ষকগণ বলিল—শোন কৃষ্ণ! আমরা তোমার রাজ্যে নির্ভয়ে মেষ চরাই, আচম্বিতে এই চৌর সকল আমাদের মেষ চুরি করিয়া লইয়া যায়, এখন ইহাদিগকে ধরিয়া আমরা রাজপুত্র তোমার নিকট আনিয়াছি, তুমি ইহার ন্যায় বিচার কর। ইহাদের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ মেষ চৌরগণকে ডাকিল, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে আসিলে তাহাদিগকে বলিল—তোমরা মেষ কি জন্য চুরি করিয়াছ? চৌরগণ জোড়হস্তে বলিল মহারাজ! মেষগণ প্রতিদিন আমাদের খন্দ খায়, আমরা দুই চারিদিন রক্ষকগণকে ডাকিয়া দেখাইলে তাহারা বিনয় বাক্যে আমাদের হস্তে ধরিয়া বলিল, এই প্রকার অপচয় আর কোনদিন করিবে না, তাহাদের বাক্যে আমরা বিশ্বাস করিয়া ঘরে চলিয়া যায়, কিন্তু পরদিন আবার আমাদের খন্দ অপচয় করে, শস্যের এই অপচয় আমরা সহ্য করিতে না পারিয়া আজ এই মেষ অপহরণ করিয়াছি। তাহাদের এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে বলিল—ইহাদের ন্যায় বুঝিয়া সত্বর আমাকে বল। তখন মধুমঙ্গল বলিল—ইহাদের দুই জনেরই দোষ হইয়াছে, উভয়কেই দণ্ড দিতে হবে, তবে আমার বিচারে ইহারা আমাকে একপেট মিষ্টি খাওইয়া ঘরে চলে যাক। শ্রীকৃষ্ণ

সখাসঙ্গে এইরূপে খেলারঙ্গে বিভোর আছেন, এমন সময় ময়পুত্র ব্যোমাসুর দূর হইতে ইহা লক্ষ্য করিয়া মায়াতে বালকবেশ ধরিয়া মেষরূপী বালকগণকে চুরি করিয়া পর্ব্বত গুহায় রাখিল, কিন্তু সকলেই খেলারঙ্গে মত্ত থাকায় কেহই তাহা বুঝিতে পরিল না, চার পাঁচ বালক মাত্র অবশেষ থাকিলে অসুর পর্ব্বত গুহামুখ শিলা দ্বারা রুদ্ধ করিয়া পুনরায় বালক-সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সখা বহুযুথ বশতঃ কেহ কাহাকে প্রথমে চিনিতে পারে নাই, সেই কালে শ্রীকৃষ্ণ বলিল ওহে পশুপালগণ! এখন নিজ নিজ কার্য্যে মনোযোগ দাও। কৃষ্ণ বাক্যে বালকগণ স্বস্থানে গমন করিয়া মেষ গণকে দেখিতে না পাইয়া বলিল মেষ কোথায় গেল? ইহা শুনিয়া শ্রীগোবিন্দ সকলের পাণে তাকাইতে লাগিল এবং অসুর বালক মূর্ত্তি ধরিয়া সম্মুখে উপস্থিত জানিতে পারিয়া মন্দ মন্দ হাঁসিতে হাঁসিতে সিংহ যেমন শার্দ্দুলকে আক্রমণ করে, সাধু-গণের শরণদাতা শ্রীগোবিন্দও তদ্রূপ সেই অসুরের গলায় ধরিল। তখন ব্যোমাসুর পর্ব্বত প্রমাণ নিজরূপ প্রকট করিয়া বহুযত্নেও শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহার দুই হাত ধরিয়া মাটীতে আছাড় দিলে অসুর পশুর ন্যায় মৃত্যু বরণ করিল। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পর্ব্বত গুহা হইতে প্রাণসম বালক গণকে উদ্ধার করিল, সখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সকলে পরমানন্দিত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে প্রশংসা করিতে করিতে ব্রজে রওনা হইলেন।

ইহার পর **ভোজনথালী,** শ্রীরামকৃষ্ণ সখাগণের সহিত এই প্রস্তরের উপর আনন্দে ভোজন করিতেন। এইখানে এক খানি বাজনাশিলা রহিয়াছে—শ্রীরামকৃষ্ণ সখাগণের সহিত মিলিত হইয়া নানা ভঙ্গিতে এই শিলা বাদ্য করিতেন। সম্মুখে ক্ষীরসাগর এই কুণ্ডের যুগভেদে চার নাম যথা পুণ্ডরীক, অপ্সরা, দেবহ্রদি ও ক্ষীর সাগর। তদনন্তর শ্রীচৈতন্য কুণ্ড, পরে শ্রীশান্তনু কুণ্ড এই কুণ্ডে আরও কয়েকটি কুণ্ড বিরাজমান। যথা—শ্রীগুপ্তগঙ্গা, নৈমীষতীর্থ, হরিদ্বার কুণ্ড, অবন্তিকাকুণ্ড ও মৎস্যকুণ্ড, গোবিন্দকুণ্ড, নৃসিংহকুণ্ড, ও প্রহ্লাদকুণ্ড, এই দুই কুণ্ড একত্র অবস্থিত। পরে গোপাল কুণ্ঠি ও ব্রহ্মকুণ্ড প্রভৃতি দর্শনীয়।

শ্রীকাম্যবন গ্রাম পরিক্রমার পর্য্যায়ানুসারে দর্শনীয় তীর্থাদি যথা—

প্রথমে শ্রীবৃন্দাদেবী দর্শন করিয়া ধামকুণ্ড, ভোগকুণ্ড, পরশুরামকুণ্ড, দাবরীকুণ্ড, মাধুরীকুণ্ড, কেবলকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড প্রভৃতি কুণ্ড মহিমা শ্রবণ করিয়া তদনন্তর দর্শনীয় ঠাকুর মন্দির শ্রীসত্য নারায়ণ, কামকিশোরী, সূর্য্যনারায়ণ, গোপাল জীউ, লক্ষ্মীনারায়ণ, বিহারীজীউ, সীতারামজীউ, বিহারী-জীউ, বৈদ্যনাথ মহাদেব, ছোটরামজীউ, ছোটদাউজী, ধর্ম্মরাজ, বড়দাউজী, কামেশ্বর মহাদেব, শ্রীরাধাবল্লভ, শ্রীমদনমোহনজীউ, শ্রীগোকুলচন্দ্রমাজী, নবগ্রহ, লক্ষ্মীনারায়ণ চিত্রগুপ্ত, হনুমানজী গঙ্গাবিহারী, শ্রীরামলালা, শ্রী.গাপালজী, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু,

শ্রীগোবর্দ্ধন নাথ, শ্বেত বরাহদেব প্রভৃতি দর্শনীয়।

এই বনে উপরোক্ত কুণ্ড ভিন্ন আরও তিনশত পঞ্চাশ কুণ্ড রহিয়াছেন। কিন্তু কাম্যবনস্থ সমস্ত কুণ্ডের মধ্যে যে চৌরাশী কুণ্ড প্রধান কেবল তাহাদের নাম বর্ণিত হইতেছে যথা-

শ্রীচরণকুণ্ড, গরুড়কুণ্ড, চন্দ্রভাগা, বরাহ যজ্ঞ, নরনারায়ণ, পাণ্ডব, মণিকর্ণিকা, বিমলা, মনোকামনা, কামসরোবর, যশোদা, দেবকী, নারদ, লঙ্কা, প্রয়াগ, পুষ্কর, গয়া, অগস্ত্য, কাশী, মনি, যোগ, লুকলুকানি, কমলাকর সরোবর, জলক্রীড়ন, ধ্যান তপ, বিহ্বল, শ্যাম, বলভদ্র, চতুর্ভুজ, ললিতা, বিশাখা, গোপী, গন্ধর্ব্ব, গোদাবরী, অযোধ্যা, সাবিত্রী, গায়ত্রী, সুরভী, শ্রী, চক্রতীর্থ, দামোদর, মধুসূদন, পৃথুদক, অর্ঘা, অপ্সরা, বেদ, রোহিণী, চন্দ্র, ক্ষীরসাগর, চৈতন্য, শান্তানু, গুপ্তগঙ্গা, নৈমীষ তীর্থ, হরিদ্বার, অবন্তিকা, মৎস্য, গোবিন্দ, নৃসিংহ, প্রহ্লাদ গোপাল, ব্রহ্মা, ধাম, ভোগ, পরশুরাম, দাত্রী, প্রেম, রত্ন, মাধুরী, কেবল, সূর্য্যকুণ্ড এবং পঞ্চ সখা অর্থাৎ রঙ্গিলা, ছবিলা, জকিলা, মতিলা, ও দতিলা এই চৌরাশীকুণ্ড দর্শনীয়।

এইবনে চৌরাশি সিংহাসন নামক একশত পনর সিংহাসন বিরাজমান যথাক্রমে তাঁহাদের নাম যথা—

শ্রীবিষ্ণু সিংহাসন, শ্রীবৈদ্যনাথ সিংহাসন, বীরভদ্র, নিকম্ভ, কীর্ত্তিপাল, মিত্রাবরুণ, বৈনতেয়, কশ্যপ, বিনতা, কামদেব, বায়ুদেব, পিতৃ, ধর্ম্মরাজ, ঋষি, ভৃগু, যাজ্ঞবল্ক্য,

বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ, উপাসনা, বুধ, দক্ষ, শঙ্খ, বৃহস্পতি, নারদ, ব্যাস অঙ্গিরা, অগস্ত্য, হরিত, পর্ব্বত, পরাশর, গর্গ, গৌতম, লিখিত, সাতাতপ, গোভিল, বাল্মিকী, সনক, সনন্দ, কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির হোত্র, দ্রুমীল, চমস, করভাজন, আপস্তম্ভ, পুরুহুত, বিশোকা, বরাহ, নারায়ণ, কামধেনু, লাঙ্গুল, কামেশ্বর, সোমনাথ, ইন্দ্র, শচী, জয়ন্ত, অশ্বিনীকুমার, পঞ্চপাণ্ডব, বিশ্বনাথ, গণেশ, চতুর্দ্দশ, অম্বরীষ, ধ্রুব, ধন্দুমা, গাধি, সগর, ককুৎস্থ, দিলীপ হরিচন্দ্র, জনক, ঋতুপর্ণ, জয়ন্ত, ভগীরথ, বহুলাশ্ব, বালখিল্য, চতুঃসন, সুভদ্র, গোপদশসহস্র, সুতপা, পৃশ্নি, ভীষ্ম, কৃষ্ণ, গোপিকা, লঙ্কা, পদ্মনাভ, রেবত, অগ্নি, স্বাহা উন্মুখ, ভদ্রকালী, গয়া, গদাধর, অনিরুদ্ধ, কাশীশ্বর, চৌষট্টি-যোগিনী, রাম লক্ষণ, পঞ্চ, বলভদ্র, পৃথু, নৃসিংহ, প্রহ্লাদ, পরশুরাম, সূর্য্য বলি, ভৃগু, বিন্ধ্যাবলী, বিষ্ণুদাসষোল, জয়-বিজয় ইত্যাদি দ্বাদশ, সমুদ্র, গঙ্গা ইত্যাদি একশত পনর সিংহাসন।

অপর শ্রীকাম্যবনের পূর্ব্বে একান্ত বন, তথায় একাত্তর গ্রাম বিরাজমান। এই গ্রামের নিকটেই প্রেম কুণ্ড অবস্থিত পরে কদমখণ্ডী নামান্তর সনেরা ইহা শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাস্থলী। এই স্থানে রত্নকুণ্ড অবস্থিত। অগ্রে ইন্দ্রস্থল ও চন্দ্রস্থল ইহা ইন্দ্রলী বলিয়া বিখ্যাত। অগ্রে নরনারায়ণস্থল, তথায় মানসী-দেবী বিরাজমান। আদি বদ্রীতে শ্রীনরনারায়ণের তপস্যাস্থল,

তপোবনের দক্ষিণে গন্ধমাদন পর্ব্বত, পশ্চিমে কেশর পর্ব্বত, উত্তরে নিষদ পর্ব্বত এবং পূর্ব্বে শঙ্খকূট পর্ব্বত অবস্থিত। কাম্যবনে সাতটি দরজা যথা—দিগদরজা, লক্ষা, আমীর, দেবী, দিল্লী, রামজী, মথুরা। শ্রীনন্দগ্রাম যাইতে হইলে রামজী দরজা দিয়া যাইতে হইবে। কাম্যবন হইতে বজেরা।

বজেরা—এই গ্রাম কাম্যবনের দুই মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত, এখানে শ্রীরাধিকার সখী শ্রীরঙ্গদেবী ও সুদেবী যমজ ভগ্নিদ্বয়ের জন্মস্থান। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীরাধিকা ও অষ্টসখীর জন্মস্থানের পরিচয় প্রদত্ত হইল। শ্রীরাধিকার জন্মস্থান গোকুলের উত্তর দিকে শ্রীযমুনার পূর্ব্ববর্ত্তী রাভেল গ্রামে, পরে বর্ষাণ গ্রামে অবস্থিত। ললিতার জন্মস্থান বর্ষাণের পূর্ব্বদিকে করেলাতে। কেহ কেহ পেশাইয়ের পশ্চিমস্থ লুধৌলী গ্রামেও বলিয়া থাকেন। বিশাখার জন্মস্থান করেলার দক্ষিণ দিকস্থ কামাই গ্রামে। শ্রীইন্দুরেখার জন্মস্থান আঁজনকে, কেহ কেহ পেশাই গ্রামেও বলিয়া থাকেন। চিত্রার জন্ম বর্ষাণের দক্ষিণস্থ চিক্‌শালীতে। চম্পকলতার জন্মস্থান বর্ষাণের পশ্চিমস্থ সনেরা গ্রামে। রঙ্গদেবী ও সুদেবীর জন্মস্থান এই বজেরা গ্রামে। তুঙ্গবিদ্যার জন্মস্থান বর্ষাণের দক্ষিণস্থ ডাভেরা গ্রামে। চন্দ্রাবলীর জন্মস্থান রিঠোর গ্রামে। মতান্তরে সখীগণের গ্রাম—ললিতার গ্রাম করেলা, বিশাখার গ্রাম উঁচাগাঁও, চিত্রার জন্ম আঁজনক, চম্পকলতার চিক্‌শালী, রঙ্গদেবীর কামাই, সুদেবীর রাকৌল গ্রাম তুঙ্গবিদ্যার ডাভোরা এবং ইন্দুলেখার লুধৌলী

গ্রাম। বজেরার পূর্ব্বে সনেরা।

সনেরা—এই গ্রাম বজেরার দুইমাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। শ্রীচম্পকলতার জন্মস্থান এই স্থানে শ্রীরাধিকা মহাদেবকে স্বর্ণহার পরাইয়াছিলেন, সেই অবধি এই গ্রাম সনেরা বলিয়া বিখ্যাত। গ্রামের নৈঋতে অতি মনোরম কদমখণ্ডী, তথায় শ্রীরাসমণ্ডল ও রত্নকুণ্ড অবস্থিত। এই কদমখণ্ডীতে ভাদ্র শুক্লা চতুর্দ্দশীতে মহা সমারোহের সহিত শ্রীরাসলীলার অভিনয় হইয়া থাকে।

শ্রীউঁচাগাঁও—সনেরার তিন মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। এই গ্রামের পূর্ব্বদিকে শ্রীবলদেব জীউর মন্দির। তাহার নৈঋতে শ্রীনারায়ণ ভট্টের সমাধি, তদুত্তরে ত্রিবেণু কূপ। তাহার নৈঋতে আলতাপাহাড়ী নামান্তর বিহাবলী, কেহ কেহ চিত্র বিচিত্র শিলা খণ্ড বলিয়া উল্লেখ করেন। ইহার উত্তরে দেহিকুণ্ড। এই কুণ্ডের নৈঋতকোণে চরণচিহ্ন বিরাজমান। ভাদ্র শুক্লা দ্বাদশীতে এই গ্রামে মেলা বসিয়া থাকে।

শ্রীবর্ষাণ—ইহা উচা গাঁয়ের অগ্নিকোণের এক মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। এই গ্রাম শ্রীবৃষভানুপুর বা বর্ষাণ বলিয়া পরিচিত। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যও অতি মনোরম। পশ্চিমদিকে উচ্চ পর্ব্বতের উপরে শ্রীরাধিকার মন্দির অতিশয় শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। এই মন্দির ব্রহ্ম গিরির উপরে অবস্থিত। মন্দিরের ঈশানকোণে চতুর্মুখ ব্রহ্মাজী বিরাজ করিতেছেন। পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া ব্রজশোভা

দর্শনে মনে অপার্থিব ভাবের স্বতঃই উদয় হয়।

শ্রীভানুখোর—এই কুণ্ড বর্ষাণের পূর্ব্বে অবস্থিত। শ্রীবৃষভানু মহারাজের নামানুসারে এই কুণ্ড ভানুখোর বলিয়া পরিচিত। ইহার বায়ুকোণে শ্রীকীর্ত্তিদা কুণ্ড অবস্থিত। ইহার নৈঋতকোণে বিহার কুণ্ড, কেহ কেহ এইকুণ্ডকে তিলক কুণ্ড বলিয়া থাকেন। বিহার কুণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে এবং চিক্ শালী গ্রামের দক্ষিণে দোহনীকুণ্ড অবস্থিত। চিক্ শালী গ্রামে সুচিত্রা সখীর জন্মস্থান এবং শ্রীরাধিকার বেশ রচনার স্থল বলিয়া পরিচিত। তদুত্তরে সাকরিখোর অর্থাৎ দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ রাস্তা বিশেষ। এখানে শ্রীকৃষ্ণ কৌশলক্রমে গোপিকা গণের নিকট হইতে দধি লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। ভাদ্র শুক্লা ত্রয়োদশীতে এখানে দধিলুণ্ঠন লীলা ও বুড়ী লীলা কৌতুক মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বিলাসগড় সাকরিখোরের পূর্ব্ব পর্ব্বতের উপরিভাগে অবস্থিত। ইহা শ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাসস্থল। এখানে মনোরম একটি রাসমণ্ডল বিরাজমান। ইহার সন্নিকটে শ্রীরাধিকার ধুলি-খেলার স্থল। একদিন শ্রীরাধিকা সখীগণের সঙ্গে এখানে ধুলি খেলিতেছিলেন এমনি সময়ে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া কৌশলক্রমে শ্রীরাধিকার সহিত বিহার করিয়াছিলেন। এখানকার বিলাস মন্দির দর্শনীয়। দানগড় সাকড়িখোরের পশ্চিম পর্ব্বতোপরি অবস্থিত। এখানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সহিত দান সাধিয়াছিলেন।

শ্রীদানগড় - একদিন শ্রীকৃষ্ণ সখাসঙ্গে ধেনু চারণ করিতে করিতে দেখিতে পাইল বনমধ্যে এক সরোবরে অতিশয় মনোহর স্বর্ণপদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়াছে এবং ভ্রমরগণ অত্যাসক্তিতে সেইপদ্মের মধুপান করিতেছে, বিকশিত এই স্বর্ণ পদ্ম দেখিয়া শ্রীগোবিন্দের প্রিয়ার মুখপদ্ম মনে হইল তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ সখাগণকে বলিল তোমরা এই সরোবর তীরে কিছু সময় খেলাকর, আর আমি সুবলের সঙ্গে কিছু সময়ের জন্য স্থানান্তরে যাইতেছি। এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ দানগড়ে উপনীত হইয়া সুবলকে বলিল সখে? আমি প্রিয়া রাধিকার কিরূপে দেখা পাইব? সুবল বলিল সখে! আমি বৃন্দাবনে শুনিয়াছি অদ্য প্রাতকালে শ্রীরাধিকা পিতৃগৃহে আসিয়াছেন, তিনি সূর্য্য পূজার ছলে সখী সঙ্গে এখানে অবশ্যই আসিবেন। সখে! তুমি ক্ষণেক বিলম্ব করিলে এখানেই দেখা পাইবে। ইতি মধ্যে সসখী শ্রীরাধা সূর্য্য পূজার ছলে মন্থর গতিতে চলিতে চলিতে আচম্বিতে কদম্ব তরুতলে সুবল সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। শ্রীরাধা অনতিদূরে প্রিয়তমের দর্শন পাইয়া বলিলেন—সখি এপথে আমরা কেমনে গমন করিব, হরি পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়া আছে, চল সখি আমরা অন্যপথে যাই, তখন ললিতা প্রগল্‌ভ বচনে বলিল—তোমরা সকলে আমার সঙ্গে এস. দেখি কৃষ্ণ কি করিতে পারে? এই বলিয়া সকলে শ্রীরাধাকে মধ্যে করিয়া চলিতে লাগিল, ইহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ আটোপ সহকারে বলিল তোমরা

কে? আর কি দ্রব্য লইয়া যাও? আমি এখানকার রাজদানী কর দিতে হবে। তোমাদের এতো গর্ব্ব কিসের প্রীতিভাবে বলছি দান দিয়া চলে যাও। শ্রীকৃষ্ণের কথায় সকলে হাঁসিতে হাঁসিতে আগে চলিতে লাগিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি আগে গিয়া পথ আগলাইয়া দাড়াইলে তখন ললিতা প্রগল্‌ভ বাক্যে বলিল—কে তুমি! কিসের দান হে, আর পথ আগালাইলে কেন? তুমি এই চাতুরীপণা ছাড়, আর যদি বিশেষ কিছু বল তবে আমরা তোমার গুণের কথা প্রকাশ করে দেব, ললিতার আটোপ বাক্য শুনিয়া তখন শ্রীকৃষ্ণ মধুর স্বরে বলিল শোন ললিতা তুমি আমাকে জান না, কন্দর্প রাজার আজ্ঞায় দান গ্রহণে আমি রাজাধিকারে নিযুক্ত হইয়াছি, আমার আজ্ঞা লঙ্ঘিলে অনিবার্য্য শাস্তি, সুতরাং সম্প্রতি সেই প্রকার ব্যাবহার না করিয়া তোমরা অন্য প্রকার বল। তোমাদের সহিত আমার বাক্যালাপের কোন প্রয়োজন নাই, রাজকর দিয়ে তোমরা এখান হইতে স্বচ্ছন্দে গমন কর। তখন ললিতা বলিল, দেখ কানাই তুমি অনেক রকম কথা জান, আমরা অবলা তোমাকে আর কি বলিব, তবে আমাদের রাজ আজ্ঞা লঙ্ঘনে যদি মনে ভয় হয়, তবে যাহা বুঝ তাহাই কর। ললিতার কথা শুনিয়া বিশাখা সগর্ব্বে বলিল শোন সখী এখানে উনার কি অধিকার যেখানে কন্দর্প রাজা আছে উনার সেখানেই অধিকার। এই বন শ্রীরাধিকার অধিকারে, আমরা তাঁর সহচরী। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিল দেখ বিশাখে! এতো

গর্ব্ব কেন ? সকলেরই উপর কন্দর্পের অধিকার। এ জগতে যত যুবক যুবতী আছে সকলেরই উপর কন্দর্পের অধিকার। তোমরা কর না দিয়া উৎশৃঙ্খলভাবে বন মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াও, তাই কামদেব ক্রোধ করিয়া আমাকে পাঠাইয়াছে, পথ এই জন্যই রুদ্ধ হইল। আর সত্যই যদি দান না দাও, তাহলে আমাকে রাজার নিকটে নিয়ে যেতে হবে। বিশাখা বলিল তোমার রাজা আমাদের কি করতে পারে ? দেখ আমাদের সম্মুখে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধা বিদ্যমান, তোমার কন্দর্প রাজার পরাক্রম আমরা ভালভাবে জানি, শ্রীরাধার নেত্রবাণে তাহার সমস্ত গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছিল,শুধু তাই নয় রাধানাম শুনিলেই পলাইয়া যায়, অধিক কি তুমি তার অনুচর, এই বলিয়া বিশাখা শ্রীরাধাকে নিয়া চলিতেছে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্র সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বলিল, আমি ভালোই জানি তোমারা রাজার নিকট আমাকে দণ্ড দিবে, তবে শোন সখীগণ আমি সত্য কথা বলছি, তোমরা ছলে বলে কোন প্রকারেই আমার কাছথেকে যেতে পারবে না। সগর্ব্বে ললিতা বলিল ওহে মুরারী কিসের দান চাও ? শ্রীকৃষ্ণ বলিল শোন ললিতে ! যৌবনরূপ পূর্ণ পসরা অঞ্চলে লুকিয়ে নিয়ে যাও, তোমাদের প্রত্যেককে এই দ্রব্যের কর দিতে হবে। শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া সখীগণ হাঁসিতে হাঁসিতে বলিল দানী হইয়া এই প্রকার রূপ যৌবনের দান মাগে এমত আশ্চর্য্যের কথাতো আমরা কোথাও শুনি নাই, এখন জানিলাম এই কারণে তুমি দানী হইয়া বনে বনে ঘুরে বেড়াও,

চল সখী আমরা সূর্য্য পূজায় যাই, ইহার সহিত আমাদের বাক্যালাপের কোন প্রয়োজন নাই, এই বলিয়া সখীগণকে গমনোদ্যত দেখিয়া কৃষ্ণ বলিল—শোন সখীগণ! তোমাদের সখী রাধা আমার মনরত্ন চুরি করিয়াছে, রত্নাভাবে আমার দেহ মন অতি অস্থির, তোমরা সেই রত্নকে সত্বর দিতে বল। তদুত্তরে ললিতা বলিল কৃষ্ণ! তুমি মিথ্যা কথা বল কেন? আমার সখী অতি সুধীর, তিনি কবে তোমার মনোরত্ন চুরি করিয়াছে? শোন কৃষ্ণ! এই গোকুলে যত কুলবালা আছে, তুমি তাদের সকলের চিত্ত চুরি করিয়াছ, চিত্তাভাবে আজ তাহারা পাগলের ন্যায় বনে বনে তোমাকেই খোঁজ করিতেছে। কি বলব রাজ নন্দন, নতুবা আমি তোমাকে ভাল রূপেই বলতে পারতাম। তুমি নিজেকে না জানিয়া অপরকে চোর অপবাদ দাও। কৃষ্ণ—শোন ললিতে আমি মিথ্যা বলছি না, তুমি রাই-কে জিজ্ঞাসা কর আর যদি রাই কিছু না বলে তবে আমি বলি শোন, যেদিন বিশাখার সঙ্গে আমার কলহ হয়, সেইদিন তোমার সখী আমার মনোরত্ন হরণ করিয়া সযত্নে কুচ কুম্ভে রাখিয়া দিয়াছে, তোমরা যদি আমার কথা বিশ্বাস না কর তবে আমি তোমাদের দেখাই, শ্রীকৃষ্ণ এই বলিয়া শ্রীরাধি-কার কুচকুম্ভে হস্তার্পণ করিলে সখীগণ কুঞ্জান্তরে গমন করিল। কিয়দনন্তর সখীগণ আসিয়া যুগল কিশোরের সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীগহ্বর বন সাকরিখোরের নৈঋত চিক্‌শোলী গ্রামের পশ্চিম সংলগ্ন অতি মনোরম স্থল। বনের পশ্চিম

ভাগে গহ্বর কুণ্ড। গহ্বরবনের বায়ুকোণে পর্ব্বতের উপরে শ্রীময়ূরকুটী অবস্থিত। একদিন এইস্থানে শ্রীরাধাগোবিন্দকে বেষ্টন করিয়া ময়ূর সকল পুচ্ছ বিস্তার ক্রমে নৃত্য করিতেছিল। এইহেতু ময়ূর কুটী নামে পরিচিত। ভাদ্র শুক্লা নবমীতে এখানে লাড়ু ফেলা কৌতুক হইয়া থাকে। শ্রীমানগড় গহ্বর বনের নৈঋতকোণে পর্ব্বতের উপরিভাগে অবস্থিত। এখানে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের উপরে মান করিয়াছিলেন। এই হেতু মানগড় নামে প্রসিদ্ধ।

শ্রীমানগড়-একদা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী ভানুনন্দিনীকে সঙ্কেত করিয়া সুবলসহ মহানন্দে সঙ্কেত স্থলে অভিসার করিয়াছেন, সহসা পথিমধ্যে চন্দ্রাবলীর প্রিয়সখী পদ্মার সহিত সাক্ষাৎ হয়, পদ্মা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া উৎফুল্লের সহিত সম্মুখে গিয়া কৃষ্ণের গমনপথ রুদ্ধ করতঃ বলিলেন—ওহে তুমি এতই নিঠুর? আমরা সকলে তোমাকে খুঁজে খুঁজে অবশ হয়ে পড়েছি, তথাপি কোথাও তোমার সন্ধান পেলাম না। আর আমাদের প্রিয় সখী চন্দ্রাবলীর কথা তোমাকে আর কি বলিব? তার দুঃখে পাষাণও বিদীর্ণ হয়ে যায়, হে বিদগ্ধ নাগর! তুমি বারেকের জন্য সখী চন্দ্রাবলীকে দেখা দিয়া তাঁর প্রাণ রক্ষা কর। আর যদি বল এখন সময় নাই, অন্য সময় যাইব, তাহলে কিন্তু আমি তোমাকে একপদও যাইতে দিব না। চতুর শিরোমণি শ্রীগোবিন্দ পদ্মার কথা শুনিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, যদি বলি এখন আমার সময় নাই, তাহলে পদ্মা আমাকে সহজে ছাড়িবে

না। তাই বাহিরে হাস্য প্রকাশ করতঃ বলিলেন—শোন পদ্মে! দেবী চন্দ্রাবলীর রূপ লাবণ্যে আমি সদাই মুগ্ধ, ত্রিভুবনে চন্দ্রাবলীর ন্যায় আমার কেহই আর প্রিয় নাই, তার নাম শ্রবণ মাত্রেই আমার হৃদয় কাঁদিয়া উঠে, কখন আমি সেই চন্দ্রাবলীকে দর্শন করিব। শোন পদ্মে! আমি এখনই তোমার সঙ্গে যাইতাম, কিন্তু বৃষভানুপুরে আজ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া দারুণ সঙ্কটে পড়িয়াছি, শুধু তাই নয়, আজ সকাল হইতে তাঁর ভৃত্য বারম্বার যাতায়াত করিতেছে, অতএব সম্প্রতি আমি সুবলের সঙ্গে রাজ নিমন্ত্রণ সমাধান করিয়া অপরাহ্ণ কালে আমি অবশ্যই তোমার প্রিয় সখীর সহিত মিলিত হইব। চন্দ্রাবলীকে আমার আর্ত্তি জানাইয়া তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিবে, পদ্মাকে এইরূপ অনুনয় বিনয় করিয়া চুম্বনালিঙ্গনে প্রসন্ন করিলেন। এমনি সময় সসখী চন্দ্রাবলী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রাবলীকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দের সহিত তাহাকে লইয়া কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া বিবিধ রসলীলায় নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর শ্রীচন্দ্রাবলী শ্রীকৃষ্ণের দুইটি হস্ত নিজ হস্তদ্বয়ে ধারণ করতঃ বলিতে লাগিলেন—হে ব্রজরাজ নন্দন! একমাত্র তোমার দর্শন লালসায় সর্ব্ব কর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া আমি বনে বনে ঘুরে বেড়াই, কিন্তু কোনদিন তোমার দর্শন পাই, কোনদিন নাও পাই, যেদিন দর্শন পাই সেইদিনের চারি প্রহর এক ক্ষণের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায়, কেবল তোমার প্রেমের বশেই জীবন ধারণ করি। চতুর শিরোমণি গোবিন্দ

চন্দ্রাবলীকে মধুর সম্ভাষণে বলিলেন—প্রাণপ্রিয়ে! তোমাকে বলিবার আমার কোন ভাষা নাই, তুমি একবার পদ্মাকে জিজ্ঞাসা কর, আমি তোমার জন্য বনে বনে ঘুরে বেড়াই, বন মধ্যে কেবল তোমারই অন্বেষণ করি, হঠাৎ যদি কেহ চন্দ্রা এই বাক্য উচ্চারণ করে, আমি তখনই ধৈর্য্য হারা হই, আকাশের চন্দ্র দর্শন করিলেও আমার তোমার কথাই মনে পড়ে, তোমার অঙ্গ স্পর্শের জন্য আমার সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ে লালসা জাগে, প্রিয়ে সত্য সত্যই আমার মনের কথা তোমাকে খুলিয়া বলিলাম। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচন্দ্রাবলীর এই কথোপকথন বৃক্ষ হইতে শ্রীরাধিকার শারিকা পক্ষী শ্রবণ করিয়া অতি শীঘ্র গোপী সভায় গিয়া প্রকাশ করিলেন। তৎশ্রবণে ললিতা সক্রোধে সখীগণকে বলিলেন—তোমরা শীঘ্র গোবর্দ্ধন মল্লের গৃহে গিয়া চন্দ্রাবলীর সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিবে এবং তাহাকে যেন গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখে। সখীগণ চন্দ্রাবলীর শাশুরী করলার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে বৃদ্ধা ক্রোধে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে অতি শীঘ্র তথায় আগমন করিলে পদ্মা দূর হইতে বৃদ্ধাকে দেখিয়া অতিশয় ভীতা হইয়া চন্দ্রাবলীকে জানাইলে চন্দ্রাবলী ভয়ে মুর্চ্ছিত হইয়া যান, শ্রীকৃষ্ণ সস্নেহে বলিলেন প্রিয়ে! কোন ভয় নাই, এইরূপ অভয় দিয়া সঙ্গে সঙ্গে কাত্যায়ণী রূপ ধারন করিলেন। সখীগণ সকলে সেইরূপ দর্শন করিয়া আনন্দিতা হইলেন, ইতি মধ্যে ক্রোধাবিষ্টা করলা তথায় উপস্থিত হইয়া বলিতে

লাগিলেন এতদিনে তোদের মনোভাব বুঝিলাম, তোমরা পর পুরুষের সঙ্গ অভিলাষে আমার বধূ কে নিয়া নিত্য নিত্য বনে ঘুরে বেড়াও, আজ ইহার উপযুক্ত শাস্তি বিধান করিব। বৃদ্ধার বাক্যে পদ্মা মুখরা হইয়া বলিতে লাগিল, তুমি এমন নিঠুর বাক্য বলিতেছ কেন? দেবী পূজার জন্য আমরা তোমার বধূকে নিয়ে এসেছি ঐদেখ,তোমারবধূ তোমার পুত্রের মঙ্গলকামনায় দেবী পূজা করিতেছে,তোমাকে দেখিয়া দেবী অন্তর্হিত হইয়া প্রতিমারূপ ধারণ করিয়াছেন। করালা ইহা প্রত্যেক্ষে দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়া সকলকে আশীবাদ দানে পরিতুষ্ট করিলেন। চন্দ্রাবলীও শাশুড়ী করালাকে দেখিয়া প্রণাম করিলে সস্নেহে আশীর্ব্বাদান্তে গৃহে লইয়া গেলেন। তখন সুবল বলিল হে যাদুকর শিরোমণে! তোমার যাদু বিদ্যা আজ সফল হইল। শ্রীকৃষ্ণ হাঁসিতে হাঁসিতে সুবলকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরাধিকার কুঞ্জে উপনীত হইলেন। দূর হইতে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া বিষন্ন বদনে পিছন ফিরিয়া রইলেন। তখন ললিতা শ্রীকৃষ্ণকে শঠ নিঠুর, কুঞ্জে কুঞ্জে পরনারী নিয়ে বিলাসে মত্ত থাক, তুমি আর একপদও অগ্রসর হইও না, এত সময় যার সঙ্গ বিলাসে প্রমত্ত ছিলে, মঙ্গল চাওতো এখানকার আশা পরিত্যাগ করিয়া সেখানে চলিয়া যাও। ললিতার ভৎর্সন বাক্য শ্রবণ করিয়া গদ গদ স্বরে বলিলেন ললিতে! আমাকে তুমি বিনা দোষে কেন ক্রোধ করিতেছ, আমি রাধা ভিন্ন মূহুর্ত্ত কালও বাঁচতে পারি না। সে যে আমার প্রাণের ঈশ্বরী,

শ্রীরাধার নাম, রূপ গুণ আমার জীবাতু, তুমি তো আমার অনুরাধা আমাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা কর। শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার বিনয় করিয়া শ্রীরাধার সম্মুখে গিয়া করযোড়ে গললগ্ন কৃতবাসে চরণ প্রান্তে বসিয়া নয়ন জলে শ্রীরাধার চরণ সিক্ত করতঃ কাতর কণ্ঠে রাই রাখ রাই রাখ বলিয়া কত মিনতি করিলেন, তথাপি মানিনী রাধা একবারও তাঁর প্রতি ফিরিয়াও চাইলেন না, শ্রীকৃষ্ণ শোকে অভিভূত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অবশেষে শ্রীরাধার কুঞ্জ হইতে বাহিরে চলিয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই অবস্থা দেখিয়া শ্রীবিশাখা আর স্থির থাকিতে না পারিয়া বলিলেন রাধে! শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তোমার এমন ক্রোধকরা উচিত হয় নাই,তুমিত ভালই জান যে শ্রীকৃষ্ণ স্বভাবতঃ ধৃষ্ট, না জানিয়া যখন প্রীতি করিয়াছ, এখন তো আর কোন উপায় নাই। তবে জান রাধে! তোমার প্রতি সে সাতিশয় অনুরক্ত, তোমা ভিন্ন সে এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না.আবার তুমিও তাকে ছাড়া থাকিতে পার না। অতএব আমার একটি অনুরোধ রাখ, এখন ক্রোধকে সম্বরণ করিয়া তোমার নাগরকে সুখী কর। বিশাখার কথা শুনিয়া শ্রীরাধা সক্রোধে বলিলেন বিশাখে তুমি না আমার প্রধানা ও প্রিয়সখী, তুমিও আমাকে বারম্বার সেই ধৃষ্টের কথা বলিয়া অনুরোধ করিতেছ? বিশাখা দুর্জ্জয় মানিনী শ্রীরাধিকার সমস্ত কথা শ্রীকৃষ্ণকে জানাইলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—শ্রীরাধিকা যদি আমার প্রতি প্রসন্ন না হয় তবে সত্য সত্যই আমি প্রাণ ত্যাগ করিব।

বিশাখা শ্রীকৃষ্ণের মনোবেদনা অনুভব করিয়া বলিলেন শোন নন্দনন্দন! রাইয়ের সহিত মিলনই তার প্রসন্নের উপায়। বিশাখার কথা শুনিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন বল-বল সখী কিরূপে আমি রাইয়ের সঙ্গে মিলিতে পারি? তদুত্তরে বিশাখা বলিল—নন্দনন্দন! তুমি যদি শ্যামা সখীরূপে বীণা হস্তে লইয়া সেই সভায় গমন করিতে পার, তাহলে আমরা তোমার গুণের প্রশংসা করিয়া বীণা বাজাইতে বলিলে তুমি বীণা বাজাইবে, তাহা শুনিয়া রাই অবশ্যই প্রসন্ন হইবে। বিশাখার বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণ বাদ্যকারের আভরণে ভূষিত হইয়া বীণা হস্তে সখী সভায় গমন করিলেন এবং তাহারা সাদরে বীণা বাদককে উপবেশন করাইলেন পরে রাধিকা জিজ্ঞাসা করিলেন ইনি কে! বিশাখা বলিলেন ইনি শ্যামা সখী বীণা বাদ্যই ইহার কাজ, তোমার গুণগ্রাম শুনিয়া এখানে আসিয়াছে। তখন শ্রীরাধা শ্যামাসখীকে বীণা বাজাইতে আদেশ করিলে অখিল কলাগুরু শ্রীকৃষ্ণ মধুর ঝঙ্কারে বীণা বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীমতী বৃষভানু নন্দিনী অপূর্ব্ব বীণা বাদ্য শ্রবণ করিয়া আনন্দের আতিশয্যে শ্যামাসখীকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন বীণা বাদনকারী শ্যামাসখীও শ্রীরাধিকার মুখ চুম্বন পূর্ব্বক গাঢ়আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন! তদ্দর্শনে সখীগণ মহানন্দে চতুর্দ্দিক হইতে জয় জয় ধ্বনি করিলেন। এখানে শ্রীমান মন্দির দর্শনীয়, এই স্থানের নামানুসারে দক্ষিণ দিকস্থ গ্রামের নাম মান পুরা বলিয়া পরিচিত।

মানগড়ের উত্তরে জয়পুর পত্তনের রাজা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া শ্রীরাধিকার নিমিত্ত একটি নূতন মন্দির প্রস্তুত করিয়াছেন, তদুত্তরে শ্রীজীর অর্থাৎ শ্রীরাধিকার মন্দির পরম শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। শ্রীজী মন্দির হইতে নীচে যাইবার সময় শ্রীরাধিকার পিতামহ শ্রীমহীভানু মহারাজের মন্দির দর্শনীয়। তদনন্তর শ্রীবর্ষাণ গ্রাম। গ্রামের উত্তরাংশে শ্রীকীর্ত্তিদা মাতা এবং শ্রীবৃষভানু মহারাজ সহ শ্রীদাম ও অষ্টসখীর মন্দির বিরাজমান। গ্রামের পশ্চিমে মুক্তাকুণ্ড, নামান্তর রতনকুণ্ড। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে বিরোধ করিয়া এই স্থানে মুক্তাক্ষেত্র করিয়াছিলেন। গ্রামের উত্তরে প্রিয়াকুণ্ড।

পিয়ল কুণ্ড—নামান্তর পিরিপুকুর, ইহা বর্ষাণের উত্তরে অবস্থিত। শ্রীরাধাকৃষ্ণের পিলু চয়ন ছলে এখানে মিলন হইয়াছিল।

ডাভোরা—এই গ্রাম বর্ষাণের দুই মাইল দক্ষিণে অবস্থিত, তুঙ্গবিদ্যা সখীর এই গ্রামে জন্মস্থান। কোন এক দিন সুবলের মুখে শ্রীরাধিকার অপূর্ব্ব অতুলনীয় রূপ ও গুণের কথা শ্রবণ করিয়া এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের দুটি নয়ন অশ্রুজলে ডুবুডুবু হইয়াছিল।

রাকৌলী—ইহা ডাভোরো গ্রামের দেড় মাইল নৈঋত কোণে অবস্থিত। কেহ কেহ ইহাকে সুদেবীর গ্রাম বলিয়া উল্লেখ করেন।

শ্রীপ্রেমসরোবর—শ্রীবর্ষাণ হইতে নন্দীশ্বর যাইবার

রাস্তার বামভাগে বর্ষাণের দেড়মাইল উত্তরে অবস্থিত,ইহা সসখী শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমবৈচিত্র্য স্থল। কথিত আছে একদা সসখী—যুগলকিশোর চতুর্দ্দিক পুষ্পোদ্যানে সুশোভিত পরম নির্জ্জন এই সরোবর তীরে আগমন করিয়া স্বচ্ছন্দে সানন্দে বিহার করিতেছিলেন। যুগলকিশোর রত্নবেদীতে উপবেশন করিলে সখীগণ ক্রমানুসারে চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান থাকিয়া তৃষিত নয়নে যুগলের রূপমাধুরী দর্শন করিতেছেন, এমন সময় একটি ভ্রমর আসিয়া শ্রীরাধিকার কর্ণোৎপলে বসিবার চেষ্টা করিলে তিনি অত্যন্ত ভীতা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে এই রূপ দর্শন করিয়া বলিলেন—মধুকর তোমার মধুমঙ্গল পান করুক, তার জন্য এত ভীতি কেন? শ্রীকৃষ্ণের প্রহেলিকায় মধুমঙ্গলের শঙ্কা হওয়ায় সত্বর আসিয়া ভ্রমরকে দূর করিয়া দিয়া বলিলেন—মধুসূদন এখন এখান হইতে গমন করিল। শ্রীরাধা মধুমঙ্গলের এই কথা শুনিতেই তাঁহার চিত্ত দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত হইল, তৎফলে প্রেমবৈচিত্র্য দশার উদ্‌গম হইল, তখন বিরহ বিধুরা শ্রীরাধিকার বাহ্য স্মৃতি লোপ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড়ে অবস্থান করিয়াও শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছেন না তখন প্রৌঢ়া রাগোৎকণ্ঠিতা চিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—হে কমলনয়ন! বিদগ্ধশেখর! শ্যামল সুন্দর! তুমি আমাকে এখানে রাখিয়া কেন স্থানান্তরে গমন করিয়াছ? হে রসিকবর! তুমি আমার জীবন বল্লভ। আমি অবলা জাতি, তাতে কুলবালা, তুমি ছাড়া আমার জীবন

ক্ষণকালও থাকিবে না। এইরূপ বহুশঃ বিলাপ করতঃ উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধিকার এই দশা অবলোকনে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহারও প্রেম পারাবার উথলিয়া উঠিল। তখন উভয়ে উভয়কে দেখিতে না পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া ঘন ঘন উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। উভয়ের নয়ন হইতে অবিশ্রান্ত প্রেমনীর এবং উভয়ের শ্রীঅঙ্গ হইতে অবিরাম স্বেদ বিন্দু ভূমিতলকে সিক্ত করিতেছিল। সেই প্রেমনীর ও ঘর্ম্মজল সরোবরে গমন করিয়া সরোবর পূর্ণ করিয়া দিল। সখীগণ প্রেমমূর্চ্ছিত যুগলের শ্রীঅঙ্গে কোন স্পন্দন না দেখিয়া তাঁহারাও সম্বিৎ হারাইলেন। তখন বৃক্ষস্থ শুকশারী সসখী যুগলের অবস্থাদর্শনে প্রমাদ মানিয়া বৃক্ষডালে বসিয়া ধ্বনি করিতে লাগিলেন। শারী উচ্চস্বরে ঘন ঘন শ্রীরাধানাম এবং শুক কৃষ্ণ নাম করিতে থাকিলে শ্রীরাধানাম ও শ্রীকৃষ্ণনাম উভয়ের কর্ণে প্রবেশ করিতে উভয়ে সানন্দে চেতনা প্রাপ্ত হইলেন। চেতনান্তে নিজ নিজ অগ্রে উভয়ের বদন কমল দর্শন করিয়া আনন্দে চুম্বনালিঙ্গনে আবদ্ধ হইলেন। সখীগণও রাধাকৃষ্ণের নাম কর্ণে প্রবেশ করায় চেতনা পাইয়া যুগল দর্শনে দুঃখ দূর করিলেন। তখন আনন্দে সকলে কুণ্ডতটে বিহার করিতে লাগিলেন। যাঁহারা এই প্রেমের কুণ্ডে মাত্র একবার স্নান করিবেন, তাঁহারা যুগল কিশোরের প্রেমলাভে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীশ্রীসঙ্কেত

নন্দীশ্বরঃ শ্রীবৃষভানুশৈল মধ্যেতু মদ্ধ্যেয়তম স্বরূপম্ ।
সঙ্কেত নামাস্পদমেব শঙ্কে প্রেমৈব তদ্দ্বন্দ্ববরস্য মূর্ত্তম্ ॥

শ্রীসঙ্কেত—ইহা শ্রীনন্দীশ্বর ও শ্রীবৃষভানু বা বর্ষাণ পর্ব্বতের মধ্যস্থলে এবং প্রেম সরোবরের দেড় মাইল উত্তরে অবস্থিত। আমর ধ্যেয়তম স্বরূপ সঙ্কত নামক স্থান, আমি এই স্থানকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তিমান প্রেমের ন্যায় আশঙ্কা করিতেছি। ললিতাদি সখীগণ সঙ্কেত ক্রমে আনয়ন পূর্ব্বক অতি যত্নে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকার প্রথম মিলন করাইয়াছিলেন। একদিন শ্রীকৃষ্ণ কালীয়দমন স্থানে সখীগণের সমভিব্যহারে শ্রীরাধিকাকে দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করতঃ তাঁহার সহিত মিলনের নিমিত্ত সাতিশয় উৎকণ্ঠিত ও চিন্তামগ্ন হইলেন। প্রিয়নর্ম্মসখা সুবল তাঁহার এই দশা দেখিয়া অনুযোগ করিলেন—সখে! তোমার চিন্তার কারণ আমাকে সত্য করিয়া বল। আমি অবিলম্বে তাহার উপায় করিব। শ্রীকৃষ্ণ—সখা আমার মনের কথা বলি শোন, আমি যেদিন কালীয়দমন করিয়াছিলাম সেইদিন তথায় উপস্থিত অনেক সুন্দরীই ছিল, কিন্তু রূপে গুণে অনুপম এক পরমাসুন্দরী তার স্মিত হাস্য বিজৃম্ভিত বঙ্কিম নেত্রবাণ আমার চিত্তকে হরণ করিয়া নিদ্রিত কামকে জাগাইয়া দিয়াছে। তাকে লাভ না করা পর্য্যন্ত আমার প্রাণকে স্থির করিতে পারছি না। সুবল—

সখে ! যে সুন্দরী তোমার চিত্ত হরণ করিয়াছে, তাহার সহিত আমি তোমাকে অবশ্যই মিলাইব তুমি নিশ্চিন্ত হও।

এদিকে শ্রীরাধিকাও দেবী পৌর্ণমাসীর মুখে "কৃষ্ণ" এই দুইটি বর্ণ শ্রবণ মাত্র অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা এবং শ্রীকৃষ্ণের মুরলী-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া অতি ব্যাকুলিতা, তদুপরি তিনি স্বপ্নে যমুনার কদম্ব কাননে অপরূপ শ্যামসুন্দর রূপ দর্শনে তাঁহার ধৈর্য্য গিরি বিচলিত হইল। প্রথম "কৃষ্ণ" এই দুই অক্ষর অনন্তর মুরলীধ্বনি, তদুপরি স্বপ্নে অপরূপ শ্যাম রূপের দর্শনে, শ্রীরাধিকার এই তিন পুরুষে রতির উদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় দশায় অত্যন্ত উদ্বেগে বিন্দু মাত্র সোয়াস্তি নাই, লবমাত্রও নিদ্রা নাই, পনসের ন্যায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বদা পুলকিত, অভীষ্টের অদর্শনে জড়িমায় সখীগণের আহ্বানেও কোন সাড়া নাই। কোটি সমুদ্র গম্ভীর বশতঃ দুঃসহ প্রেষ্ঠবিরহ প্রকাশ করিতে না পারিয়া কেবল উচ্চস্বরে রোদন করিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন। কখনও ভূমিতলে মূর্চ্ছা, আবার কখনও উন্মাদ স্বভাবে নানা প্রলাপ বলিতেছেন। শ্রীরাধিকার এই দশা দেখিয়া সখীগণ প্রীতিভরে জিজ্ঞাসা করিলেন রাধে ! তোমার এই দশা কেন হল ? তোমার বদন দর্শনে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। শ্রীরাধা—সখি আমার মনের কথা শোন, আমি কুলবতী অবলা, আমার মন তিন পুরুষে আসক্ত। এক মন তিনদিকে ধাবিত, বল এখন কি করি ? আমার জীবনে আর কাজ কি ? এখন মরণই

শ্রেয়ঃ। শ্রীরাধিকার বাক্যে ললিতা বলিলেন—কোন্ তিন পুরুষ? আর কেমন করিয়া তোমার চিত্ত হরণ করিল? শ্রীরাধা-শোন সখী কৃষ্ণনামে কোন এক পুরুষ তাঁহার নাম শ্রবণ মাত্রই সে আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, কোন প্রকারে আর বাহির হইতেছে না। আর কোন এক পুরুষের বংশীধ্বনি শ্রবণ মাত্রই আমার মন উন্মত্ত হইয়া সেই বংশী ধ্বনিতে অত্যাসক্ত হইয়াছে। আরও বলি শোন! নবমেঘ জিনি শ্যামকান্তি পীতাম্বর ধারী, তার অরুণাধরে মৃদুহাস্য সুশোভিত, সেই পুরুষকে যমুনাতীরে স্বপ্নে দর্শন করিলে সে সত্বরে বাহু পসারিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিল, আমি বারংবার না না করিলেও বলাৎকারে আমার অধর চুম্বন করিল। তার সেই অধরসুধা পানে আমার চিত্ত হরণ করিয়াছে।

শ্রীরাধিকার সমস্ত কথা শুনিয়া সুচতুরা ললিতা বলিল-শোন সখী, তিন পুরুষ নহে, উহা একজনই। প্রথমে তুমি যাহার নাম শ্রবণ করিয়াছ, তাহারই মোহ বজ্রময় বংশীধ্বনি, আর সেই কৃষ্ণবর্ণ মুরলী বদন পীতাম্বরধারী নবীনমদনকে তুমি স্বপ্নে দর্শন করিয়াছ। অতএব সখী আর বৃথা চিন্তা করিও না একটু ধৈর্য্য ধর। তদুত্তরে শ্রীরাধা উৎকণ্ঠাভরে বলিলেন—সখী সেই নাগররত্নের দর্শন ব্যতীত আমার জীবন বিফল, এখন বল কিরূপে তাহার সহিত আমার মিলন হয়। ইতিমধ্যে প্রসন্নবদনে সুবল আসিয়া তথায় উপনীত হইলে ললিতা তাহাকে সঙ্গোপনে নিয়া শ্রীরাধিকার অবস্থা সবই নিবেদন

করিলেন। ললিতার বাক্যে সুবল অন্তরে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন কিন্তু বাহিরে বাক্‌চাতুর্য্যে ললিতাকে বলিলেন—ললিতে! তুমি যাহা বলিলে ইহা ত প্রমাদের লক্ষণ, তবে এই দুয়ের মিলন অতি দুর্ঘট, কেননা ইনি রাজনন্দিনী, আর তিনি রাজনন্দন, রাজনন্দিনী কোনদিন অন্তঃপুরের বাহিরে যাইবেন না এবং রাজনন্দন ও কোনদিন এখানে আসিতে পারিবেন না। আর এক কথা কৃষ্ণের স্বভাব হল সখাগণ ভিন্ন একেশ্বর কোথাও একপদ চলে না। আর সখাগণের মধ্যে শ্রীরাধিকার জ্যেষ্ঠ ভাই শ্রীদাম সর্ব্বদা কৃষ্ণের সঙ্গে চলেন। তিনি যদি কখনও কৃষ্ণের চাঞ্চল্য দেখেন তবে নিজসম ভাই বুদ্ধিতে নিষেধ করেন। কৃষ্ণ সর্ব্বদা সখাগণের অধীন তার কোন স্বতন্ত্রতা নাই। অতএব এ মিলন সর্ব্বথা অসম্ভব! তদুত্তরে সুবলকে ললিতা বলিলেন—শোন সুবল! তুমি যদি আমার কথা রাখ তাহা হইলে এ মিলন অবশ্যই সংঘটিত হইবে। দেখ বর্ষাণের উত্তরে এবং নন্দীশ্বরের দক্ষিণে পরম নির্জ্জন সঙ্কেত যোগ্য এক স্থান বিদ্যমান, তুমি যদি শ্রীরাধিকার রাগোৎকণ্ঠা জানাইয়া নন্দনন্দনকে সঙ্গোপনে কোন ছলে তথায় লইয়া যাইতে পার, তাহলে আমিও শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়া তথায় মিলাইতে পারি। সুবল ললিতার বাক্যে পরম আনন্দে বলিলেন—দেবি! তেমোর বাক্য শিরে ধারণ করিয়া আমি এখনই কৃষ্ণের নিকটে গিয়া রাধিকার রাগোৎকণ্ঠা নিবেদন করিব। তবে দেবি! জানিবেন আমি তাঁহার প্রিয় নর্ম্ম সখা

তিনি কখনও আমার কথা লঙ্ঘন করেন না। আমি অবশ্য তাঁকে তথায় আনিব। এই বলিয়া সুবল সত্বর নন্দীশ্বর কৃষ্ণ নিকট গিয়া বলিলেন—সখে! যে তোমার চিত্ত হরণ করিয়াছে তাঁর সন্ধান মিলিয়াছে, তিনি বৃষভানু রাজার কুমারী, নাম শ্রীরাধিকা। তাঁর সখীগণের মধ্যে যিনি অতি বিচক্ষণা সেই ললিতার সঙ্গে বহু প্রকার উক্তি প্রত্যুক্তির পরে অবশেষে তিনি আমাকে বলিলেন—বর্ষাণের উত্তরে পরম সুন্দর এক নির্জ্জন কানন আছে, প্রদোষকালে নন্দনন্দনকে সঙ্গোপনে সঙ্গে লইয়া তুমি অবশ্য তথায় আসিবে, যেন অন্যথা না হয়। সুবলের বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দে তথায় আগমন করতঃ বনশোভা দর্শনে নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন।

এদিকে ললিতাও শ্রীরাধিকাকে বলিলেন—দেখ রাধে! যাঁর জন্য তোমার প্রাণ ব্যাকুল, তোমার সেই নাগর এই কুঞ্জে সমাগত, তুমি তাহার সহিত মিলিত হও। ললিতার বাক্যে মুগ্ধস্বভাবা শ্রীরাধা মনে শঙ্কা যুক্ত হইয়া মধুর স্বরে বলিলেন ললিতে! আমি কদাচ সেখানে যাইতে পারিব না, শ্রীরাধিকার মুখপানে চাহিয়া ললিতা বলিলেন—রাধে! তুমি স্বচ্ছন্দে মিলিত হও, আমরা সকলে তোমার নিকটেই থাকিব, কোন শঙ্কা করিও না। ললিতার বাক্যে শ্রীরাধা বলিলেন—সখি! তোমাদের কথা আর কতই লঙ্ঘন করিব। এখন যাহা বলিবে আর অন্যথা করিব না। তখন চতুরা ললিতা সসখী শ্রীরাধিকাকে সঙ্গে লইয়া রস কথার আলাপনে ত্বরিত

গতিতে কুঞ্জের মধ্যে আসিয়া উপনীতা হইলেন। শ্রীরাধিকার আগমনে শ্রীকৃষ্ণ চঞ্চলচিত্তে সানন্দে নির্নিমেষ নয়নে শ্রীরাধা রূপ দর্শন করিতে থাকিলে ললিতা অতি স্নেহভরে চাতুর্য্য-কলা প্রকাশে শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণের সমীপে লইয়া গিয়া সত্বর কুঞ্জ হইতে বাহিরে আসিল। নিভৃত নিকুঞ্জে নাগরকে দেখিয়া স্বীয় পটাঞ্চল দিয়া নিজ বদন আবৃত করিলে রসিক শেখর প্রীতিভরে ধীরে ধীরে শ্রীরাধিকার বস্ত্রাঞ্চল চাপিয়া ধরিলেন। শ্রীরাধিকাও বাহু প্রসার করিয়া অম্বর সম্বরণ করিয়া বঙ্কিম নয়নে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বাহুযুগল প্রসারিত করিয়া সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়া স্বীয় জানুপরি বসাইলে শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গের সংস্পর্শে শ্রীরাধার চিত্তে বিবিধ ভাবাবলীর তরঙ্গ উছলিয়া উঠিল। রসিকশেখর নায়ক চূড়ামণি আলিঙ্গন চুম্বনাদির নিমিত্ত বহুযত্ন করিলেও শ্রীরাধিকা মস্তক অবনত করিয়া মুখকমল আবৃত করিয়া রাখিলেন। রসিকেন্দ্র চূড়ামণির বিবিধ রসকলার প্রকাশেও শ্রীরাধিকা নির্ব্বাকই রহিলেন। দিব্যাতিদিব্য নায়ক নায়িকার এই হঠতাই প্রথম মিলনের চিহ্ন।

অনন্তর রসিক মিথুন রতিরসে নিমগ্ন হইলে সখীগণ গবাক্ষ রন্ধ্রে নয়ন দিয়া সঙ্কেত কুঞ্জের রহঃলীলা সন্দর্শনে আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হইলেন। এই হেতু শ্রীবল্লভ সন্তানগণ ভাদ্র শুক্লা দশমীতে সঙ্কেতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন উপ-লক্ষ্যে মহাসমারোহের সহিত উৎসব কার্য্য সম্পাদন করিয়া

থাকেন। গ্রামের উত্তরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর উপবেশন স্থান এবং শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামীর ভজন কুটীর। সন্নিকটে শ্রীশ্রীসঙ্কেত দেবী বিরাজমান। এই গ্রামের অগ্নি-কোণে বিহ্বল কুণ্ড। এই স্থান হইতে কেহ কেহ তিন মাইল উত্তর শ্রীনন্দীশ্বরে গমন করেন, আবার কেহ কেহ লীলাস্থল দর্শনের নিমিত্ত পশ্চিম মুখে গমন করিয়া নিম্নলিখিত স্থান সমূহ দর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীবিহ্বলকুণ্ড—ইহা সঙ্কেতের অগ্নিকোণে অবস্থিত। ইহার চতুর্দ্দিক বিবিধ বৃক্ষাবলীতে পরিবেষ্টিত। ময়ূর ময়ূরীর তথা শুকশারীর কূজনে এই নির্জ্জন স্থান সর্ব্বদা মুখরিত। একদা শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় নর্ম্ম সখা সুবলের সহিত এই স্থানে আগমন করতঃ বনশোভা সন্দর্শনে পরমানন্দিত হইয়া উল্লাসভরে এই স্থানে উপবেশন করিলেন। এমনই সময়ে এক শারিকা পক্ষী বৃক্ষশাখায় মনের আনন্দে শ্রীরাধার গুণগান করিতেছিল। শ্রীরাধানাম শ্রবণে রাধানাথের আনন্দসাগর উথলিয়া উঠিল এবং অশ্রু কম্প পুলকাবলীতে তাহার অঙ্গ পরিব্যাপ্ত হইল। অনুরাগাতিশয্যে তাঁহার নেত্রযুগল যেদিকে নিক্ষিপ্ত হইতেছেন সেই দিকেই শ্রীরাধা মূর্ত্তি দর্শনে তাঁহার দিকে ধাবিত হইয়া বলিতেছেন—হে রাধে! প্রাণ প্রিয়ে এস এস! আমাকে ছেড়ে তুমি এত দূরে কেন? সুবল শ্রীকৃষ্ণের এই প্রেমদশা অবলোকনে শ্রীরাধার সহিত মিলনের নিমিত্ত ব্যাকুলিত হইলেন। কিন্তু এক্ষণে শ্রীরাধার সহিত মিলনের কোন সম্ভাবনা

না দেখিয়া শারিকার প্রতি আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন হে শারিকে! তুমি অসময়ে রাধানাম উচ্চারণ করিয়া বড়ই অনর্থ ঘটাইয়াছ, এখন যেরূপে ইহার সহিত রাধার মিলন হয় তাহার উপায় কর। শারিকা বলিল—তুমি আগে শ্রীকৃষ্ণকে স্থির কর, সখীসহ শ্রীরাধা এখনই এখানে আসিতেছেন, ইত্যবসরে শ্রীরাধিকা সখীগণ সমভিব্যাহারে কুণ্ডতীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। শ্রীরাধিকার নূপুর ও কিঙ্কিণীর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সুবল শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—প্রাণসখা স্থির হও, তোমার রাধা আসিয়াছে দর্শন কর। শ্রীরাধানাম শুনিবামাত্র শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে বলিলেন—কোথায় রাই, আমার রাই কোথায়? হেনই সময়ে শ্রীরাধিকা আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন। উভয়ে উভয়কে দর্শন করিয়া আনন্দে নিমগ্ন হইলেন। শ্রীরাধার অঙ্গ সংস্পর্শে শ্রীকৃষ্ণ বিহ্বল হইয়া শ্রীরাধাকে আলিঙ্গনপাশে অবদ্ধ করতঃ অধরসুধাপানে অত্যাসক্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে শ্রীরাধানাম শ্রবণ করিয়া বিহ্বল হইয়াছিলেন সেইহেতু এই কুণ্ড ও স্থানের নাম বিহ্বল কুণ্ড।

শ্রীরিঠোর—এই গ্রাম সঙ্কতের দেড়মাইল পশ্চিমে, এখানে শ্রীবৃষভানু মহারাজের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীচন্দ্রভানুর গ্রাম। এই গ্রামে শ্রীচন্দ্রাবলীর জন্মস্থান। গ্রামের অগ্নিকোণে শ্রীচন্দ্রাবলী কুণ্ড বিরাজমান। তাহার উত্তরে শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক।

ভড়খোড়ক—রিঠোরের চারিমাইল বায়ুকোণে এবং

শ্রীনন্দগ্রামের চারিমাইল পশ্চিমে। শ্রীব্রজরাজ নন্দমহাজের পশ্চিম গোশালা। গ্রামের অগ্নিকোণে ভ্রমরকুণ্ড ও পশ্চিমে ক্ষীরকুণ্ড।

শ্রীমেহেরান—ইহা ভড়খোরকের দুইমাইল পশ্চিমে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের জেষ্ঠ্যতাত শ্রীঅভিনন্দের গোশালা, কেহ কেহ এই গ্রামকেও শ্রীযশোদার পিত্রালয় বলিয়া উল্লেখ করেন। গ্রামের পূর্ব্বদিকে ক্ষীর সরোবর বিরাজমান।

শ্রীসাঁতোয়া—নামন্তর শংবাস, মেহেরাণের দুইমাইল পশ্চিমে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ মহিষী শ্রীসত্যভামার পিতা শত্রাজিৎ মহারাজের শ্রীসূর্য্য আরাধনার স্থল। গ্রামের ঈশান কোণে সূর্য্যকুণ্ড বিরাজমান। কুণ্ডের উত্তরেই শ্রীসূর্য্যদেবের মন্দির অবস্থিত। শংবাসের চারি মাইল নৈঋতকোণে শ্রীভোজন থালি অবস্থিত, ভোজন থালির উপরিস্থিত শিলার নাম বাদ্য শলা। ভোজন থালির দুই মাইল উত্তরে নন্দেরা গ্রাম। তাহার দুই মাইল ঈশান কোণেই শংবাস। শ্রীকাম্য-বন হইতে শ্রীবর্ষাণ যাওয়া গতিকে ব্রজের পরিক্রমা পথ ছাড়া হইয়া যায়, একারণই শংবাস হইতে কাম্যবনের ভোজন থালিতে আসিলে পুনর্ব্বার পরিক্রমা পথ পাওয়া যায়। সুতরাং পরিক্রমার্থির পুনরায় ভোজন থালিতে আসা একান্ত প্রয়োজন।

পাইগাঁও—শংবাসের সাড়ে পাঁচমাইল বায়ুকোণে অবস্থিত। একদিবস শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকের সহিত লুকাচুরি খেলা

আরম্ভ করিলে, সমস্ত সখীগণের সহিত শ্রীরাধা বহু অন্বেষণ করিবার পর শ্রীকৃষ্ণকে এখানে পাইয়াছিলেন। পাইগ্রামে যাইবার সময় ভটকী, উচেরা ও পরেই গ্রামত্রয় হইয়া যাইতে হয়। এই পাইগাঁও মেবজাতীয় লোকের বাসস্থান সুতরাং এখানকার দর্শনান্তে নুনেরা গ্রামে আসিয়া বাস করিতে হয়। পাইগাঁও ব্রজের সীমান্ত গ্রাম। পাই গ্রাম হইতে নুনেরা চারিমাইল ঈশানকোণে অবস্থিত। অতএব শংবাস হইতে দশমাইল চলিবার সঙ্কল্পে যাত্রা করিতে হয়। পাইগাঁও হইতে নুনেরা যাইবার সময় খেড়ী ও গাওরী নামে দুইটি মুসলমান বস্তি হইয়া যাইতে হয়।

তিলোয়ার—নুনেয়ার ছয়মাইল বায়ুকোণে অবস্থিত। এখানে শ্রীরাধাকৃষ্ণ এরূপ নিপুণতার সহিত ক্রীড়া আরম্ভ করিয়াছিলেন যে তিলমাত্র অবসর হয় নাই। এই হেতু তিলোয়ার বলিয়া বিখ্যাত। এখানেও মেবজাতীর বাস, সুতরাং শিঙ্গারবট ও বিছোর হইয়া অন্ধোপ গ্রামে বাস করিতে হইবে। নুনেরা হইতে তিলোয়ার যাইবার সময় চারিমাইল ঈশান-কোণে নরী নামে একটি মুসলমান পাড়া হইয়া যাইতে হয়। নরী হইতে তিলোয়ার দুইমাইল পশ্চিমে অবস্থিত। তিলো-য়ার ব্রজের সীমান্ত গ্রাম।

শিঙ্গারবট—তিলোয়ারের দুই মাইল উত্তরে। এখানে সখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে ষোড়শ শিঙ্গারে ভূষিত করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে শ্রীরাধিকার বেশরচনা করিয়াছিলেন। এই

গ্রাম ব্রজের সীমান্ত স্থান এবং সর্ব্বসাধারণ এই গ্রামকে শিঙ্গার বলিয়া উল্লেখ করেন। এই গ্রামও মুসলমান পাড়া বিশেষ।

বিছোর—ইহা শিঙ্গারবটের দেড়মাইল ঈশানকোণে অবস্থিত। সখীগণের সহিত এখানে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলাস করিয়াছিলেন। তদনন্তর গৃহে যাইবার সময় বিচ্ছেদ বশতঃ অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। ইহা মুসলমান গ্রাম

অন্ধোপ—বিছোরের দুই মাইল বায়ুকোণে এবং শিঙ্গার-বটের তিনমাইল উত্তরে অবস্থিত, ব্রজের সীমান্ত গ্রাম বিশেষ।

সোন্দ—এই গ্রাম শ্রীকৃষ্ণের মধ্যম খুল্লতাত শ্রীসনন্দের গ্রাম। এই গ্রাম ব্রজের সীমান্ত স্থান।

বোন্‌ছারী—সোন্দের দুইমাইল উত্তরে কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব-দিশা ব্রজের সীমান্ত গ্রাম। বোন্‌ছারীতে দাউজী দর্শনীয়। (এই পর্য্যন্ত ব্রজের সীমায় আসিয়া লীলাস্থলী গুলি দর্শন করিবার জন্য ব্রজের মধ্যে প্রবেশ করা হইতেছে। পুনরায় এই স্থানে আসিয়াই পরিক্রমা আরম্ভ করিতে হইবে।)

হুড়েল—বোনছারীর চারিমাইল অগ্নিকোণে অবস্থিত। গ্রামের অগ্নিকোণে পাণ্ডববন, পাণ্ডবগণ এখানে বাস করিয়া-ছিলেন। এখানে পাণ্ডব কুণ্ড বিরাজমান। হুড়েলের নৈঋতকোণে এক মাইল ব্যবধানে শ্রীকুঞ্জরবন।

দইগাঁও—এই গ্রাম হুড়েলের তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ কৌতুক করিবার নিমিত্ত গোপীগণের নিকট হইতে দধি লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। দধিকুণ্ড, মধুসূদনকুণ্ড, শৃঙ্গার

মন্দির, শীতল কুণ্ড ও সপ্তবৃক্ষ মণ্ডলী দর্শনীয়। শীতল কুণ্ডতীরে কদম্বতলে শ্রীবল্লভাচার্য্যের উপবেশন স্থান।

লালপুর—এই গ্রামের দেড়মাইল পশ্চিম। এই গ্রামের দুই মাইল নৈঋতকোণে কামের অবস্থিত। গ্রামের উত্তরে দুর্ব্বাসা মুনির আশ্রম। এখানে দুর্ব্বাসা মুনি ও দুর্ব্বাসা কুণ্ড দর্শনীয়। এই স্থানে গেপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণের বসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হারোয়ান গ্রাম—বর্ত্তমান নাম পিপরবর—কামেরের দুই মাইল অগ্নিকোণে অবস্থিত। এখানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সহিত পাশা খেলায় হারিয়াছিলেন। একদিন শ্রীরাধা কৃষ্ণ নানাবিধ রস কৌতুক করিয়া এই খানে উপবেশন করিলে শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে রাইকে বলিলেন শোন প্রাণপ্রিয়ে! তোমার সঙ্গে বহুদিন পাশা খেলা করি নাই, আমি মনে আশা করিয়াছি আজ পাশা খেলিব। তখন মৃদু মন্দ হাঁসিতে হাঁসিতে ললিতা বলিল শোন কৃষ্ণচন্দ্র! তুমি রাইয়ের সহিত পাশা খেলিতে চাও, তাঁহার সহিত তুমি কি খেলিবে? তুমিতো পাশা চালিতেই জান না, কতবার তুমি তাঁহার সহিত হারিয়াছ, তথাপি তুমি শ্রীরাধিকার সহিত খেলিতে চাও? তুমি খেলাতে হারিলেই কলহ উঠাইবে, এইবার এই প্রকার খেলা হইবে না, দ্রব্য রাখিয়া পণানুসারে তোমাদের খেলা হইবে। হার-জিতের বিচার আমরা করিব ললিতার বাক্যে রসিক ও রসবতী হাঁসিতে হাঁসিতে বলিল—বলতো ললিতে! তোমার নিকট

কি দ্রব্য রাখিয়া আমরা খেলা করিব ? ললিতা বলিল শোন কৃষ্ণ ! বাঁশের একটি বাঁশী এইমাত্র তোমার ধন, তাহাকে শুদ্ধ মনে আমার নিকট রাখিতে হইবে, আর শোন ভানুনন্দিনী তোমার কণ্ঠমণিহার আমার নিকট রাখিতে হইবে, তবেই আমাদের মনে বিশ্বাস হইবে। তখন শ্রীকৃষ্ণ হাঁসিতে হাঁসিতে বলিল এই নাও বংশী, আজ তো রাই পাশাতে হারিবেই আমি অবশ্যই জিতিব, সুতরাং বংশী আমি পাইবই। ললিতা হাতে কৃষ্ণের বংশী নিয়া শ্রীরাধিকার কণ্ঠহার চাইলে শ্রীরাধা বলিল মণিহার কেন দিব ? নাগর কি আমার সঙ্গে জিততে পারবে ? দুই একবার চালেই হারিয়া যাইবে। ললিতা বলিল রাধে ! তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্যই এবং আমরাও ভালভাবে জানি, তথাপি পণের কথাই যুক্তিযুক্ত। ললিতার বাক্যে শ্রীরাধিকা সানন্দে তাহার হাতে মণিহার দিয়া খেলা আরম্ভ করিল, শ্রীকৃষ্ণ দুয়া চারি বলিয়া পাশা ফেলিল, জিতিবার উভয়েরই মন কিন্তু শ্রীরাধার অঙ্গভঙ্গি, নেত্রের চাহনি, মধুর বচন ও মন্দ মন্দ হাঁসিতে শ্রীকৃষ্ণ সাতিশয় চঞ্চল হইয়া কি ফেলিতেছে আর কি বা চালিতেছে কিছুতেই মন স্থির করিতে পারিতেছে না দেখিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিল শোন ললিতে ! তোমার সখীর কি প্রকার অবিচার অঙ্গ ভঙ্গি ও বক্রনেত্রে আমার প্রতি চাহিয়া আমার মনকে অস্থির করিলে আমি খেলিব কি প্রকারে ? শ্রীরাধিকা যদি কটাক্ষ সম্বরণ করে তবে তো আমি সুস্থমনে খেলিতে পারি ?

কৃষ্ণের অবস্থা দেখিয়া ললিতা বলিল—কৃষ্ণচন্দ্র ! তুমি নিজের চাঞ্চল্যে নিজেই মুগ্ধ হও। একে তুমি রসিকনাগর, তাতে নাগরীর সঙ্গ, প্রতি কথার ছলে রসতরঙ্গ উছলিয়া উঠে, তখন কি যে কর, কিছুই স্মরণ থাকে না, যদি স্থিরচিত্তে রাইসঙ্গে খেল, তবে না জিতিবে, শোন ললিতে ! আমি একটুও অস্থির নই, কিন্তু রাই নেত্রবাণে আমাকে অস্থির করিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়া এবার চঞ্চলতা সম্বরণ করিয়া সগর্ব্বে শীঘ্রই "দোয়া চারি" বলিয়া পাশা ফেলিল, কিন্তু পাশা সেইরূপ পড়ে নাই, তখন শ্রীরাধা "বিদু বামঞ্চ"বলিয়া পাশা ফেলিয়া জিতিল। তখন গোপীগণ বলিল দেখ নাগর ! তুমি যে পাশাতে হারিবে ইহা আমরা ভাল মতেই জানি, আমরা যে তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শ্রীরাধা বিদগ্ধার শিরোমণি পরমা সুন্দরী, সর্ব্ববিদ্যায় বিশারদা রসবতী রমণী, তিনি রসিকের চিত্ত হরণ করেন, সেই হেতু তোমাকে পরাজয় করিয়াছে, সখী তুমি যাহা বলিলে ইহা সবই সত্য, কারণ গোপজাতী গোপক্রীড়ায় খুবই তৎপর, আর আমার সরল অন্তর, আমি ইহার কিছুই জানি না, এই কারণে নানাবিধ সন্ধানে রাই আমাকে পরাজয় করিল, রাই কেবল কটাক্ষ দ্বারা আমাকে পরাজয় করিয়াছে, যাই হোক যেখানে এরূপ অবিচার, সেইখানে থাকা আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি না, ললিতে ! তুমিএখন বংশী আনিয়া আমার হাতে দাও, আমি ধেনুর নিকট যাইব। তদুত্তরে ললিতা বলিল, তা হবে না চতুর, তুমি আমাকে আগে বল কি—

ভেট দিবে ? তবেই তোমার বংশী দিব। কৃষ্ণ বলিল শোন ললিতে ! বংশী ও মন এই দুই বস্তু ভিন্ন আমার আর কোন ধন নাই, এই দুয়ের মধ্যে রাই প্রথমেই নেত্রদ্বারা আমার মন হরণ করিয়াছে, অবশিষ্ট ধন বংশী, তাহা তুমি হরণ করিয়া এখন ভেট চাইতেছ, তোমাদের রীতি এখন বুঝিলাম। শোন ললিতে ! যদি ভেট ভিন্ন আমি বংশী না পাই, তবে রাইয়ের স্থানে আমার মন আছে, যদি দয়া করে দেয়, তাহা তোমাদিগকে অর্পণ করিব, ইহাছাড়া আমার অন্যকোন ভেটদ্রব্য নাই, পুনঃ ললিতা বলিল শোন কৃষ্ণচন্দ্র ! তুমি নানামত বচন প্রবন্ধ জান, আমরা তাঁর দাসী, আমরা কিছুই জানি না তোমার মন রাই চুরি করিয়াছে, শোন ললিতে— আমার কথা মিথ্যা নয়,রাই আমার মনোরত্ন চুরি করিয়া নির্জ্জন কঠিন কুচগিরিতে রাখিয়া দিয়াছে, সেইস্থান হইতে কোন প্রকারে বাহিরে আসিতে পারিতেছে না। তোমরা যদি আমার কথায় বিশ্বাস না কর তবে তোমাদের সকলের সাক্ষাতে দেখাইতেছি, এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সানন্দে শ্রীরাধার নিকট গমন করিলে সখীগণ কুঞ্জমধ্যে লুকাইয়া গেলেন। কিয়দনন্তর শ্রীরাধা সখীসঙ্গে মিলিত হইয়া স্বভবনে গমন করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ বংশী লইয়া গোচারণে গমন করিলেন। এইগ্রাম বৈঠানের দুইমাইল বায়ুকোণে অবস্থিত।

সাঁচলী—হারোয়ানার চারি মাইল নৈঋতকোণে অবস্থিত, যাইবার সময় কদনা নামক গ্রাম হইয়া যাইতে হয়।

এখানে চৈত্র শুক্লা পঞ্চমী হইতে তিনদিন ব্যাপী বহু সমারোহে মেলা হইয়া থাকে। গ্রামের মধ্যে শ্রীচন্দ্রাবলীদেবীর মনোরম মন্দির শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। গ্রামের দক্ষিণে সূর্য্যকুণ্ড এবং অগ্নিকোণে চন্দ্রকুণ্ড বিরাজমান। এই গ্রাম শ্রীনন্দীশ্বরের ছয় মাইল বায়ুকোণে অবস্থিত।

শ্রীগেঁড়ো—ইহা সাঁচুলীর তিন মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। এখানে বদনগড় হইয়া যাইতে হয়। ইহা শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের গেঁন্দখেলার স্থান। গ্রামের চারিদিকে সাতটি কুণ্ড বিরাজমান, যথা উত্তরে গেঁন্দখোর। এই স্থান শ্রীবলরামের দাঁড়াইবার স্থল। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের মুকুট চিহ্ন বিরাজমান। গ্রামের ঈশানকোণে দ্বিতীয় গেন্দ খোর। ইহা শ্রীকৃষ্ণের দাঁড়াইবার স্থল। এই দুই কুণ্ড পরস্পর অর্দ্ধমাইল ব্যবধানে অবস্থিত। গ্রামের পূর্ব্বে গৈধরবন কুণ্ড, দক্ষিণে বেলবন কুণ্ড বিরাজমান এবং নৈঋতে গোপীকুণ্ড, পশ্চিমে জলভর কুণ্ড এবং বায়ুকোণে বেহার কুণ্ড বিরাজমান। ইহার অগ্নিকোণে শ্রীনন্দীশ্বর।

শ্রীশ্রীনন্দীশ্বর

তত্তচ্ছিরোভূতমপারশোভং নন্দীশ্বরং সাধুগণা বদন্তি।
নন্দীশ্বরং তঞ্চ যদীয়রূপং শ্রীনন্দরাজালয় রাজমানম্॥

শ্রীনন্দীশ্বর—অপার শোভাশালী শ্রীনন্দীশ্বর গ্রামই সমস্ত গ্রাম সমূহের মস্তক স্বরূপ। সাধুগণ প্রসিদ্ধ নন্দীশ্বর

নামক শিবকেই এই শৈলরাজের স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই শ্রীনন্দীশ্বর গ্রামেই শ্রীনন্দমহারাজের আলয় বিরাজিত আছেন। গোঁড়োর দুইমাইল অগ্নিকোণে এই শ্রীনন্দীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলরামের বিহারস্থল। নন্দীশ্বরের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। পর্ব্বতের উপরিভাগে নন্দীশ্বর গ্রাম মণ্ডলীভাবে অবস্থিত। তন্মধ্যস্থ শ্রীমন্দিরে শ্রীব্রজেশ্বর ও শ্রীব্রজেশ্বরী তৎমধ্যদেশে সুললিত ত্রিভঙ্গবেশে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম ভ্রাতৃযুগল ভক্তজনের অভীষ্টপূর্ণ করিতেছেন। শ্রীমন্দিরের উত্তরদিকে শ্রীনন্দীশ্বর বিরাজ করিতেছেন। মন্দিরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ব্রজের অতুলনীয় শোভা সন্দর্শনে এবং তৎসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব লীলাবলী ভাবুকের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হইলে যে কি এক অনির্বচনীয় আনন্দ তাহা সত্যই বর্ণনাতীত। শ্রীনন্দীশ্বর গ্রামের চতুর্দ্দিকে ছাপ্পান্ন কুণ্ড বিরাজ করিতেছেন। ইহার নাম ও স্থিতি প্রথমে শ্রীনন্দ ভবনের উত্তর দরজার পার্শ্বে সিংহ পহরী দর্শন করিয়া শ্রীনন্দীশ্বর পরিক্রমায় বাহির হইতে হয়। নন্দীশ্বরের ঈশানকোণে সাঁচকুণ্ড, নামান্তর ধোয়নীকুণ্ড, কুণ্ডের পশ্চিমতীরে শ্রীমনসাদেবী বিরাজমান। এই কুণ্ডের বায়ুকোণে ও নন্দীশ্বরের উত্তরে শ্রীবিশাখার পিতা পাবন গোপ কৃত শ্রীপাবন সরোবর। সরোবরের দক্ষিণতীরে শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভজনকুটীর অবস্থিত। কথিত আছে—একদিন শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণ বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া কুটীর নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে তিনদিন অনশনে পড়িয়াছিলেন।

তখন শ্রীকৃষ্ণ কোন গোপ শিশুর রূপে দুগ্ধ লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"তুমি এখানে তিন দিন উপবাসী আছ, ইহা কেহই জানে না, আমি গোচারণে আসিয়া তোমাকে দেখিতে পাইয়া এই দুগ্ধ লইয়া আসিয়াছি। তুমি ইহা পান কর, আমি পরে বাসন লইয়া যাইব। আর তুমি কুটীরে না থাকিয়া এরূপ জঙ্গলে থাকিলে ব্রজবাসীগণ দুঃখ পাইবে।" এই বলিয়া শিশু চলিয়া গেলে শ্রীপাদ সনাতন দুগ্ধ পান করিতে করিতে প্রেমে অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন। তিনি নয়ন নীরে বক্ষঃপ্লাবিত করিয়া ভূমিতলকে ক্লিন্ন করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ অলক্ষ্যে থাকিয়া সান্ত্বনা করতঃ কোন ব্রজবাসী দ্বারা এই কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। পাবন সরোবরের ঈশানকোণে নন্দীশ্বর তড়াগ, নামান্তর ক্ষুণ্ণাহার কুণ্ড। এই স্থান শ্রীনন্দমহারাজের পিতা শ্রীপর্জ্জন্য গোপের তপস্যা স্থল। তাহার উত্তরে কিঞ্চিৎ পশ্চিম দিশা মতিকুণ্ড, এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ মুক্তাক্ষেত্র করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে, ফুলয়ারী কুণ্ড, তাহার পূর্ব্বে বিলাস বট, তাহার পূর্ব্বে সাহলীকুণ্ড। শ্রীকৃষ্ণ বলরাম পরস্পর প্রায়ই সঙ্গ ছাড়া থাকিতেন না, তজ্জন্য একদিন শ্রীযশোদা মাতা তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন সারসকি জুড়ী, সেই অবধি এই কুণ্ডের নাম সারসিককুণ্ড। তাহার অগ্নিকোণে শ্যামপিপড়ী কুণ্ড, তাহার অগ্নিকোণে বটকদম্বকুণ্ড, তাহার অগ্নিকোণে কেওয়ারীবট কুণ্ড, তাহার দক্ষিণে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিশা সপ্তবৃক্ষমণ্ডলী ও টেরিকদমকুণ্ড, ইহা শ্রীনন্দীশ্বর ও

যাবটের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই কুণ্ডের দক্ষিণতীরে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর ভজন কুটীর। কথিত আছে—একদিন শ্রীরূপ-গোস্বামী মনে মনে চিন্তা করিতেছেন—"যদি দুগ্ধ পাওয়া যায়, তাহলে ক্ষীর তৈয়ার করিয়া শ্রীপাদ সনাতন প্রভুকে ভোজন করাই" এমন সময়ে শ্রীভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকা ব্রজ বালিকার রূপে কিছু দুগ্ধ, তণ্ডুল ও চিনি লইয়া শ্রীরূপ-গোস্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং গোস্বামীকে শীঘ্র ক্ষীর তৈয়ার করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইবার কথা বলিয়া ছদ্মা বালিকা চলিয়া গেলেন। এদিকে শ্রীপাদ রূপ ক্ষীর তৈয়ার করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করতঃ শ্রীসনাতন প্রভুকে পরিবেশন করিতেছিলেন, শ্রীপাদ সনাতন দুই এক গ্রাস মুখে দিয়া প্রেমে অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন। জিজ্ঞাসাক্রমে শ্রীরাধিকার কার্য্য বুঝিতে পারিয়া শ্রীরূপকে রন্ধন করিতে নিষেধ করিলেন। এই কুণ্ডের পূর্ব্বভাগে শ্রীরাসমণ্ডলীদেবী এবং কুণ্ডের দক্ষিণে আশেশ্বর মহাদেব ও কুণ্ড। তাহার পশ্চিমে জলবিহার কুণ্ড, তাহার পশ্চিমে চন্দ্রকুণ্ড, তাহার বায়ুকোণে কুয়াকি কুণ্ড, তদ্দক্ষিণে কুকেশ্বর, তদ্দক্ষিণে কৃষ্ণকুণ্ড, এই কুণ্ড শ্রীনন্দগ্রামের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত, তাহার পূর্ব্বে সেহেনকুণ্ড, তাহার দক্ষিণে বেহেক কুণ্ড, তাহার পূর্ব্বে যোগীয়া কুণ্ড, তাহার পূর্ব্বে ঝগড়াকি কুণ্ড, তাহার অগ্নিকোণে ভাণ্ডীর বট, তাহার পূর্ব্বে লেণ্ডবট। সখাসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মাঠা অর্থাৎ তক্র পান করিবার স্থান। তদ্দক্ষিণে অক্রুর কুণ্ড, শ্রীকৃষ্ণ

বলরামকে মথুরায় লইয়া যাইবার জন্য আগমন করিলে অক্রুর এখানে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দর্শন করিয়া অশেষ বিশেষ রূপে স্তুতি করিয়াছিলেন। এখানে অদ্যাপিও শ্রীশিলাখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিহ্ন বিরাজমান। অক্রুরের নৈঋতকোণে বস্ত্রবনকুণ্ড, তাহার দক্ষিণে তুমনবন ও কুণ্ড। এই বন নন্দগ্রামের অগ্নিকোণে অবস্থিত, তাহার পশ্চিমে ঝিম্‌কি ও রিম্‌কি কুণ্ডদ্বয়। তাহার বায়ুকোণে শ্রীপৌর্ণমাসীদেবীর গোফা ও কুণ্ড। তাহার উত্তরে পারলখণ্ডী, এখানে কোন মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ বিরহে জ্বলন্ত চিতায় আরোহন করিয়াছিলেন, অদ্যাপি সেই চিতা বিরাজমান। তাহার পশ্চিমে মোহনকুণ্ড· কেহ কেহ এই কুণ্ডকে বিশাখাকুণ্ড বলিয়া উল্লেখ করেন, তাহার বায়ুকোণে ললিতা কুণ্ড। এই কুণ্ডের উত্তরাংশে হিন্দুলবেদী বিরাজমান। ললিতা কুণ্ডের পশ্চিমে নারদকুণ্ড, তাহার পশ্চিমে শ্রীসূর্যকুণ্ড, তাহার অগ্নি-কোণে এবং ললিতা কুণ্ডের দক্ষিণে কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব দিশায় শ্রীউদ্ধব কেওয়ারী। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে শ্রীব্রজবাসীগণকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত শ্রীউদ্ধব ব্রজে আগমন পূর্ব্বক এখানে দশমাস কাল নিবাস করিয়াছিলেন। এই স্থানে শ্রীউদ্ধবের উপবেশন স্থান বিরাজমান। তাহার পশ্চিমে শ্রীনন্দবৈঠক শ্রীব্রজরাজ গাভী দোহনের সময় এখানে উপবেশন করিতেন। তাহার পশ্চিমে শ্রীযশোদাকুণ্ড, কুণ্ডের উত্তর তীরে হাউ মূর্ত্তি বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে সঙ্গে লইয়া শ্রীব্রজেশ্বরী এই ঘাটে স্নান করিবার সময় দুইভাই যাহাতে কোনরূপ চাঞ্চল্য

প্রকাশ না করে, তজ্জন্য জননী হাউ আসিবে বলিয়া ভয় দেখাইতেন। এই কুণ্ড শ্রীনন্দীশ্বরের দক্ষিণে অবস্থিত। তাহার উত্তরে শ্রীমধুসূদনকুণ্ড, ইহার ঈশানকোণে শ্রীনৃসিংহ-দেবজীর মন্দির। কুণ্ডের উত্তরে যশোদা মাতার দধি মন্থনের প্রকাণ্ড মাঠ অর্থাৎ মৃত্তিকার ভাণ্ড বিশেষ অবস্থিত। তাহার নৈঋতকোণে দধিকুণ্ড, তাহার নৈঋতকোণে কারেলো, তাহার অগ্নিকোণে এবং দধিকির দক্ষিণে রাবরিকুণ্ড, তাহার দক্ষিণে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিশা কেম, তাহার নৈঋতে রেম, তাহার বায়ু-কোণে মান্ধীরকুণ্ড, তাহার পশ্চিমে পুকুরিয়া, তাহার বায়ু-কোণে বেলকুণ্ড, তাহার নৈঋতে কেরারীকুণ্ড, তাহার বায়ু-কোণে পাণিহারিকুণ্ড। মাতা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের পানীয়জল এই কুণ্ড হইতে ব্যবহার করিতেন। তাহার বায়ুকোণে চড়খোর, তাহার বায়ুকোণে শ্রীবৃন্দাদেবীর স্থান ও কুণ্ড। এই কুণ্ডের বায়ুকোণে শ্রীবৃন্দাদেবীর দর্শনীয় মূর্ত্তি বিরাজমান, এই স্থান শ্রীনন্দীশ্বরের পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার উত্তরে রঞ্জখোর, তাহার উত্তরে রুহিণীকুণ্ড, তাহার উত্তরে পাতরাকি কুণ্ড, ইহার ঈশাণে পিপরার কুণ্ড এই কুণ্ড পাবন সরোবরের বায়ু-কোণে অবস্থিত। সাকল্যে এই ছাপ্পান্ন কুণ্ড দর্শন করিতে চারি দিবসের আবশ্যক। পাবন সরোবরের বায়ুকোণে ছাপ্পান্নকুণ্ড ছাড়াও রামপুকুরিয়া নামে আরও একটি কুণ্ড বিরাজমান।

শ্রীনন্দভবনের উত্তরে শ্রীযশোদানন্দনের মন্দির এবং নৈঋতকোণে শ্রীরাধারমণের মন্দির এবং নন্দীশ্বর গ্রামের

দক্ষিণে শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির। নন্দীশ্বর পর্ব্বতের নৈঋত-কোণে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন বিরাজমান চরণ চিহ্নের উপর বর্দ্ধমানরাজা একটি ছত্রি তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন। এই চরণচিহ্ন থাকায় এই স্থানকে চরণ পাহাড়ী বলিয়া উল্লেখ করা হয়। শ্রীচরণ চিহ্নের পূর্ব্বভাগে শিলাখণ্ডের উপরে গাভীর চরণচিহ্ন বিরাজমান। তাহার ঈশানে পর্ব্বতের উপরিভাগে ময়ূরকুটী, তাহার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের নানা প্রকার খেলন চিহ্ন বিরাজমান। তাহার পূর্ব্বে যুগলের অতি রমণীয় উপবেশন স্থল। তাহার পূর্ব্বে পর্ব্বতের নিম্নভাগে এবং শ্রীনন্দীশ্বরের নৈঋতে খিড়কীশ্বর মহাদেব। শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা পর্ব্বোপলক্ষ্যে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা নবমী পর্যন্ত এবং ফাল্গুন মাসের হোরী লীলোপলক্ষ্যে শুক্লাদশমী তিথিতে শ্রীনন্দগ্রামে বিশেষ কৌতুক ও মেলা বসিয়া থাকে। বর্ষাণে ফাল্গুন শুক্লাষ্টমী ও নবমীতে শ্রীরাধিকার জন্মতিথি অবধি পূর্ণিমা পর্য্যন্ত বর্ষাণে নানা কৌতুক হইয়া থাকে। অনন্তর যাবট।

শ্রীশ্রীযাবট

সঙ্কেত্য যত্র প্রিয়য়া বিলস্য প্রোল্লস্য রস্যস্য বটস্য মূলে।
যাবৈস্তদজ্ঘ্রী রচয়াঞ্চকার নাম্নাপি তৎ যাববটং চকার॥

শ্রীযাবট—বিদগ্ধবর শ্রীকৃষ্ণ যে রমণীয় বটতরুমূলে প্রিয়তমা শ্রীরাধাকে সঙ্কেত পূর্ব্বক অভিসার করাইয়া তাঁহার সহিত লীলা বিলাস করিয়া থাকেন এবং পরমোল্লাস ভরে

তাঁহার চরণকমল যাবকরসে সুরঞ্জিত করিয়াছিলেন, সেইবট তরুর নামানুসারে এই স্থান যাবট নামে অভিহিত। এই গ্রামেই শ্রীরাধিকার শ্বশুর আলয়। ইহা নন্দীশ্বরের দুই মাইল ঈশানে অবস্থিত। গ্রামের পূর্ব্বে শ্রীরাধাকান্তের মন্দির, গ্রামের পূর্ব্বে শ্রীকিশোরীজীউর মন্দির ও কিশোরী কুণ্ড এই কুণ্ড গ্রামের ঈশানকোণে, তাহার দক্ষিণে এবং গ্রামের অগ্নিকোণে সিদ্ধকুণ্ড, তাহার নৈঋতে এবং গ্রামের দক্ষিণে কুণ্ডলকুণ্ড নামান্তর গহেনা, তাহার নৈঋতে বৎসখোর, এই স্থানে শ্রীরাধিকা সুবলবেশে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তাহার উত্তরে ভদ্রবন, তাহার উত্তরে যুগলকুণ্ড, তাহার উত্তরে বিহ্বল কুণ্ড, তাহার পশ্চিমে বেড়িয়া অর্থাৎ কুল বৃক্ষের স্থল। শ্রীকৃষ্ণ এই কুল বৃক্ষের নীম্নে অবস্থান করতঃ কোকিলের ন্যায় শব্দ করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে কানিহারী কুণ্ড তাহার উত্তরে কোকিলাবন। কানিহারী কুণ্ডের অগ্নিকোণে এবং বিহ্বল কুণ্ডের ঈশানকোণে লাড়োলিকুণ্ড, তাহার ঈশানকোণে নারদ কুণ্ড, তাহার পূর্ব্বে ধর্ম্মকুণ্ড, তাহার দক্ষিণ দিকে শ্রীপারলগঙ্গা নামান্তর পিয়লকুণ্ড। এই কুণ্ড শ্রীযাবট গ্রামের বায়ুকোণে অবস্থিত। এই কুণ্ডের পশ্চিম তীরে একটি প্রাচীন ফুলবৃক্ষ আছে। কথিত আছে—শ্রীরাধিকা নিজহস্তে এই বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন এবং এই বৃক্ষের ফুল বহু যত্নে শ্রীকৃষ্ণের মালার নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত। এই বৃক্ষের নাম পারিজাত বৃক্ষ। বৈশাখমাসে এই বৃক্ষে অতি সুগন্ধি ফুল ফুটিয়া থাকে। বর্ণিত

এই পনরটি কুণ্ড যাবট গ্রাম বেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিক বিরাজমান। যাবটের পূর্ব্বে ধনশিঙ্গা।

ধনশিঙ্গা—ইহা যাবটের দুই মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। এই গ্রাম শ্রীধনিষ্ঠা সখীর জন্মস্থান।

কুশী,—নামান্তর কুশস্থলী—ধন শিঙ্গারের চারিমাইল উত্তরে কিঞ্চিৎ পশ্চিম দিশা। গ্রামের পশ্চিমে গোমতীকুণ্ড। এখানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনন্দ মহারাজকে দ্বারকাধাম দর্শন করাইয়াছিলেন। এই গ্রামের পূর্ব্বে পয়গাঁও।

পয়গাঁও—ইহা কুশীর ছয় মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। গ্রামের উত্তরে পয় সরোবর, কদম্ব ও তমাল শোভিত মনোরম কদমখণ্ডী অবস্থিত। এখানে শ্রীকৃষ্ণ পয় পান করিয়াছিলেন।

শ্রীছত্রবন,—নামান্তর ছাতাই—পয় গাঁয়ের চারিমাইল নৈঋতে অবস্থিত। গ্রামের ঈশানে সূর্য্যকুণ্ড এবং নৈঋতে চন্দ্রকুণ্ড। এই কুণ্ডের তীরে শ্রীদাউজী মন্দির বিরাজমান। গ্রামের উত্তরাংশে শ্রীনারায়ণদেবের মন্দির বিরাজিত। এখানে শ্রীদামের চেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণ রত্ন সিংহাসনে বসিয়া রাজ্য শাসন লীলার অভিনয় কৌতুক করিয়াছিলেন। তখন বলরাম শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে উপবেশন করিয়া মন্ত্রীর কার্য্য করিতে লাগিলেন। শ্রীদাম শিরোপরি বিচিত্র ছত্র ধারণ করিলেন। অর্জ্জুন চামর দুলাইতে লাগিলেন। মধুমঙ্গল সম্মুখে থাকিয়া বিদূষকের কার্য্য করিতে লাগিলেন। সুবল নিকটে বসিয়া তাম্বুল যোগাইতে লাগিলেন। সেই বিচিত্র লীলার পরাবধি

বলিয়া এই গ্রামের নাম ছত্রবন রাখা হয়।

শ্যামরী—ছত্রবনের চারি মাইল অগ্নিকোণে অবস্থিত। এক সময় শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের উপর দুর্জ্জয়মান করিলে পর নানা চেষ্টা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ মান ভঙ্গ করিতে সক্ষম হইলেন না, তখন কোন সখীর মন্ত্রণায় এখানে শ্যামলা সখীর বেশ ধারণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণ কৌশলক্রমে শ্রীরাধার মান উপশম করিয়াছিলেন। এই গ্রামে যূথেশ্বরী শ্যামলার গৃহ। এখানে চৈত্র শুক্লাষ্টমীতে বিশেষ মেলা বসিয়া থাকে।

নরী—শ্যামরীর এক মাইল পশ্চিমে কিঞ্চিৎ দক্ষিণে শ্রীবলদেব স্থল। বলরাম ও সঙ্কর্ষণ কুণ্ড বিরাজমান।

শাঁখি—নরীর এক মাইল পশ্চিম এবং সাহারের দুই মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খচূড়কে বধ করিয়াছিলেন। শ্রীরাধাকুণ্ডের লগমোহন কুণ্ড দর্শন উপলক্ষে এ সম্বন্ধে বিস্তার বর্ণন আছে।

আরবাড়ী—নামান্তর আলয়াই—শাঁখির দেড় মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত রঙ্গযুদ্ধ অর্থাৎ হোরী খেলা করিবার নিমিত্ত শ্রীরাধিকা সখীগণের সহিত অভিমান করিয়াছিলেন

শ্রীরণবাড়ী—আরবাড়ীর এক মাইল উত্তরে এবং ছত্রবনের তিন মাইল দক্ষিণ পশ্চিম অংশে বিরাজমান। এখানে শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সহচরী ও সহচরগণকে সঙ্গে করিয়া পরস্পর রঙ্গযুদ্ধের অভিনয় করিয়াছিলেন। এখানে পৌষ

অমাবস্যা তিথিতে বিশেষ বৈষ্ণবোৎসব হইয়া থাকে। এই স্থানে সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীকৃষ্ণ বিরহের বিরহানলে আশ্চর্য্যরূপে লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন।

ভাদাবলী—রণবাড়ীর দুই মাইল বায়ুকোণে অবস্থিত। ইহা শ্রীনন্দ মহারাজের ভাণ্ডার গৃহ বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ স্থান। এই গ্রাম ভাণ্ডাগোর বলিয়াও পরিচিত।

খাঁপুর—এই গ্রাম ভাদাবলীর এক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। শ্রীরাধাগোবিন্দ রণবাড়ীতে ফাগু যুদ্ধের পর তাঁহারা এখানে আসিয়া ভোজন করিয়াছিলেন। ইহা রণবাড়ীর দেড় মাইল বায়ুকোণে অবস্থিত।

শ্রীউমরাও—খাঁপুরের দুই মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ছত্রবনে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামের প্রচেষ্টায় রাজা হইলে সখীগণের চেষ্টায় পৌর্ণমাসী দেবী শ্রীরাধিকাকে এখানে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীদামাদি সখাগণ ছত্রবনে শ্রীকৃষ্ণের উপর ছত্র ধরিয়া রাজাসনে অভিষিক্ত করিলে শ্রীরাধা সখীমুখে তাহা শ্রবণ করিয়া বৃন্দা ও নান্দীমুখীকে বলিলেন, এই ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন আমার অধিকারে এবং পশু পক্ষীগণ সকলেই আমার প্রজা, ইহা শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্রে সবিশেষ প্রসিদ্ধ, তৎশ্রবণে তখন তাহারা বলিল রাধে ! তোমার রাজ্যে তুমি ভিন্ন কে রাজা হইবে ? বৃন্দা ও নান্দীমুখীর বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা সত্বর সখীগণকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণকে জয় করিবার অভিলাষে উমরাবেশে অর্থাৎ সাক্ষাৎ বৃন্দাবনেশ্বরী এই বেশে

বনমধ্যে আগমন করিলেন! পৌর্ণমাসী দেবী এই সংবাদ পাইয়া সেখানে আগমন করতঃ শ্রীরাধার সেই বেশভূষা দেখিয়া আনন্দিতা হইলেন। শ্রীরাধা পৌর্ণমাসীকে দেখিয়া প্রণাম করিলে তিনি আশীর্ব্বাদ ও আলিঙ্গন করিয়া সখীগণের শিকট কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন বৃন্দা ও নান্দীমুখী কারণ নিবেদন করিলে ভগবতী রাইকে বলিলেন রাধে! এই বৃন্দাবন তামারই রাজ্য, এখানে তুমি ভিন্ন কে রাজা হইতে পারে? শোন রাধে! যেমন বৈকুণ্ঠে কমলা রাজা, দ্বারাবতীতে রুক্মিণী, দণ্ডকারণ্যে জানকী, সেই প্রকার এই বৃন্দাবনের রাজা শ্রীরাধা। অতএব আজ আমি তোমাকে এই বৃন্দাবনে বৃন্দাবনেশ্বরী এই নামে অভিষেক করিব, এই বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে অনুগতা বৃন্দাকে অভিষেকের সামগ্রী আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন। বৃন্দা যে আজ্ঞা বলিয়া প্রণাম করতঃ চলিয়া গেলেন এবং সখীগণ ভগবতীর আজ্ঞা পাইয়া আনন্দে নৃত্যগীত করিতে লাগিল ও নান্দীমুখী অভিষেকের নিমিত্ত শতঘট সুশীতল সুবাসিত জল আনিলেন। ইত্যবসরে বৃন্দা গণসহ অভিষেকের সামগ্রী লইয়া উপস্থিত হইলেন। পৌর্ণমাসী ভগবতী শ্রীরাধিকাকে দিব্যাসনে উপবেশন করাইয়া অভিষেক করিতে থাকিলে বৃন্দা ও নান্দীমুখী সানন্দে তৎপর তার সহিত তাঁহার সহায়তা করিতেছেন এবং সকলে বৃন্দাবনেশ্বরী নাম ধরিয়া জয় জয় করিতে করিতে অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া মহা মহোৎসব করিলেন। অনন্তর শ্রীরাধা

ভগবতীর চরণে প্রণাম করিলে তিনি আশীর্ব্বাদ করতঃ নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন। এই সমস্ত কথা ব্রজে প্রচার হইয়া যায়, তাহাতে শ্রীরাধা শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী নামে খ্যাত হইলেন। শ্রীরাধা উমরা সাজে এইস্থানে ভূষিত হওয়ায় ইহা উমরা বলিয়া প্রসিদ্ধ। গ্রামের উত্তরে শ্রীকিশোরী কুণ্ডের তীরে শ্রীপাদ লোকনাথ গোস্বামীর ভজন কুটীর। শ্রীপাদ লোকনাথ প্রভুর প্রেমে বশীভূত হইয়া শ্রীরাধাবিনোদ এই কিশোরী কুণ্ড হইতে প্রকট হইয়াছিলেন। শ্রীলোকনাথ প্রভুর হৃদয় সর্ব্বস্ব শ্রীরাধা-বিনোদ বর্ত্তমানে জয়পুর রাজধানীর শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন।

কামাই—উমরায়ের সাড়ে চারি মাইল নৈঋত কোণে অবস্থিত, যাইবার সময় উমরায়ের দুই মাইল নৈঋতে রহেরা গ্রাম হইয়া যাইতে হয় এই গ্রামে শ্রীরাধিকার সখী বিশাখার জন্মস্থান। কামাইয়ের দক্ষিণে সি ও পরশু এই গ্রামদ্বয় অবস্থিত।

করেলা—এই গ্রাম কামাইয়ের এক মাইল উত্তরে অবস্থিত, ইহা শ্রীইন্দ্রাবলীর মাতামহী করালার গ্রাম। তাঁহার নামানুসারে এই গ্রাম করেলা বলিয়া পরিচিত এই গ্রামে শ্রীরাধিকার প্রধানা সখী ললিতার জন্মস্থান। গ্রামের পূর্ব্বে মনোরম কদমখণ্ডী, ভাদ্র পূর্ণিমায় এখানে মহা সমারোহে শ্রীরাস লীলার অভিনয় হইয়া থাকে।

পেশাই—করেলার দেড় মাইল উত্তরে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ জল পিপাসায় কাতর হইলে পর শ্রীবলরাম এখানে

তাঁহার পিপাসা দূর করিয়াছিলেন। গ্রামের বায়ুকোণে অতি মনোরম কদমখণ্ডী বিরাজমান। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন এই গ্রামে ইন্দুলেখার জন্ম হইয়াছিল।

লুধৌলী—এই গ্রাম পেশাইর অর্দ্ধ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। কেহ কেহ এই গ্রামকে ললিতার জন্মস্থান বলিয়া উল্লেখ করেন।

আঁজনক—লুধৌলীর এক মাইল পশ্চিমে, গ্রামের দক্ষিণে শ্রীকিশোরী কুণ্ড। এই কুণ্ডের পশ্চিম তীরে অঞ্জন-শিলা বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় হস্তে এখানে শ্রীরাধিকার নেত্রে অঞ্জন পরাইয়া ছিলেন। একদিন সখীগণ আনন্দ অন্তরে শ্রীরাধিকার বেশভূষা রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া সুবর্ণের চিরুণী দ্বারা কেশ সংস্কার করিতে গিয়া যেখানে যেরূপ ভূষণ শোভিত হয় সেইরূপ বেশ রচনা করিতে প্রথমে কেশ রচনা করিয়া ললাটে স্মর যন্ত্রের তিলক রচনা করিলেন এবং হৃদয়োপরি হরি মনোহারি হার, কর্ণে রোচন নামক রত্ন বিভূষণ, নাসিকায় রক্তা প্রভাকরী, কৃষ্ণের অঙ্গছটা আচ্ছাদক পদক এবং শিরে মদনমোহন বিমোহিত স্তমস্তক মণি ধারণ করাইলেন। অপর চন্দ্র সূর্য্য তিরস্কারি সৌভাগ্যমণি, ভুজযুগলে শব্দায়-মান কঙ্কণ, মণিময় কেয়ূর এবং বিপক্ষ পর্ব্ব নাশিনী নাম মুদ্রা অঙ্কন, বিচিত্র কাঞ্চন কাঞ্চী ও চরণযুগলে কৃষ্ণ মনোহারি রতন মঞ্জীর, পরিধানে নীল মেঘাম্বর এবং কৃষ্ণ সুখের নিমিত্ত নীল বস্ত্রের ভিতর রক্ত বস্ত্র ধারণ করাইয়া

সখীগণ মণিবন্ধ নামক মণিতে বিভূষিত চন্দ্র দর্পহারী দর্পণ সম্মুখে ধরিলেন এবং তাঁহার নয়ন যুগলে অঞ্জন পরাইবার জন্য অঞ্জনপাত্র সম্মুখে ধরিয়াছে এমনি সময় শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জ হইতে রাধা রাধা বলিয়া বংশী ধ্বনি করিলেন শ্রীরাধা সেই বংশীধ্বনি শ্রবণে প্রেমাবিষ্ট হইয়া অতি শীঘ্র প্রিয়তমের সহিত কুঞ্জে মিলিত হইলেন, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে দেখিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ রাইয়ের হস্ত ধরিয়া স্বীয় বাম-পাশে বসাইয়া নিজ পীতাম্বর দিয়া শ্রীরাধার মুখকমল মোছাইয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সমস্ত অঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া নয়নে অঞ্জন না দেখিয়া বলিল হায়! হায়! একি বেশ? অঞ্জন বিহীন নয়ন? এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সখীর নিকট হইতে অঞ্জন গ্রহণ করতঃ সুবর্ণ নির্ম্মিত সম্মদ শলাকার তুলিকা দ্বারা অতিশয় কৌতুকভরে শ্রীরাধিকার নয়নযুগল অঞ্জনে রঞ্জিত করিলেন। তৎকালে শ্রীরাধিকার নেত্র যুগল ঈষৎ নিমলন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ অনঙ্গরবসে চঞ্চল হইয়া একদৃষ্টে তাহার বদন কমলের মাধুরী দর্শন করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধাও তৃষ্ণা ব্যাকুলা ভ্রমরীর ন্যায় নেত্র দ্বারে শ্রীকৃষ্ণ মাধুরী পান করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয়ে উভয়ের মাধুরী দর্শন করিয়া আনন্দাতিশর্য্যে ক্রীড়ারসে নিমগ্ন হইলেন। এই গ্রাম ইন্দু-লেখার জন্মস্থান, কেহ কেহ আবার পেশাই গ্রামেও বলিয়া থাকেন। এই গ্রামের দুই মাইল উত্তরে খদিরবন অবস্থিত।

সপ্তমন্তু বনং ভূমৌ খাদিরং লোকবিশ্রুতম্।
তত্র গত্বা নরো ভদ্রে! মম লোকং স গচ্ছতি॥

শ্রীখদিরবন—জগৎ প্রসিদ্ধ খদির বনই এই পৃথিবীতে সপ্তমবন। দেবি! এই বনে গমন করিলে লোকের বিষ্ণু-লোকে গমন হয়। এই গ্রামের নামান্তর খায়রো ইহা আজনকের দুই মাইল উত্তর, কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব অংশে শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ স্থল। এই গ্রাম যাবটের দুই মাইল অগ্নিকোণে অবস্থিত। এই দুই গ্রামের মধ্য ভাগে বক্থরা নামান্তর চিললী নামে স্থান আছে। শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে বকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। বকাসুরের চঞ্চুযুগ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে চিরিয়া অর্থাৎ দুই অংশ করিয়া ফেলাতে এই স্থানের নাম চিললী হইয়াছে এবং এই দিকে শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করিবার জন্য যে সময় বকাসুর চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা দেখিয়া সকলে আর্ত্তনাদে চীৎকার করিতে করিতে খায়রে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, এই জন্য এই খদির বনের অপর নাম খায়রো বলিয়া উল্লিখিত। চিললীর পশ্চিমাংশে একটি কদম্ববৃক্ষ আছে। কথিত আছে—বকাসুরকে বধ করিয়া এই স্থানে সখাসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ভোজন করিয়াছিলেন। গ্রামের উত্তরদিকে শ্রীসঙ্গম কুণ্ড। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাগণ সমভিব্যাহারে বিবিধ বিহার করিয়াছিলেন। কুণ্ডের উত্তর তীরে শ্রীরাসমণ্ডল ও কদমখণ্ডী অবস্থিত। কদমখণ্ডীতে বর্ত্তমান সময়ে কেবল মাত্র ৬/৭টি কদম্ববৃক্ষ বিরাজমান কুণ্ডের উত্তরে শ্রীলোকনাথ ও শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর

ভজন কুটীর অবস্থিত। খদির বনের চতুর্দিকে দ্বাদশটি কুণ্ড অবস্থিত।

বিজুয়ারী—খদির বনের এক মাইল পশ্চিমে কিঞ্চিৎ দক্ষিণে এবং শ্রীনন্দগ্রামের দেড় মাইল অগ্নিকোণে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ বলরাম মথুরায় যাইবার সময় এখানে অক্রুরের রথে আরোহণ করিয়াছিলেন। অক্রুর মথুরায় যাইবার সময় বিজুয়ারী, পেশাই, সাহার ও জৈত হইয়া অক্রুর ঘাটে যাইয়া যমুনায় স্নান করেন। তদনন্তর মথুরায় গমন করেন। শ্রীনন্দগ্রাম ও বিজুয়ারীর মধ্যভাগে অক্রুর নামক স্থানে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন শিলাখণ্ডের উপর বিরাজমান।

কোকিলাবন—শ্রীনন্দগ্রামের তিন মাইল উত্তরে এবং যাবট গ্রামের দুই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এই নির্জ্জন অরণ্যে শ্রীকৃষ্ণ কোকিলের ন্যায় সুললিত বংশীধ্বনি করিয়া কৌশলক্রমে শ্রীরাধিকার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এক দিন শ্রীরাধিকার সহিত মিলনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের যাবটের কুল বৃক্ষতলে সমস্ত রাত্রি ব্যতীত হইল, তথাপি মিলন না হওয়ায় পরদিন প্রাতে ললিতার সহিত সাক্ষাৎ হইলে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া শ্রীরাধিকার সহিত মিলনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে ললিতা বলিল—শোন নন্দনন্দন! যাবটের পশ্চিমে মনোরম এক নির্জ্জন স্থান আছে, উহা মনোমুগ্ধকর কোকিলের কণ্ঠরবে সতত মুখরিত। তুমি অপরাহ্ণকালে সেই স্থানে গমন করিয়া মিলনের নিমিত্ত বংশী

ধ্বনি করিলে আমরা সকলে রাইকে সঙ্গে লইয়া তথায় মিলিত হইব। ললিতার বাক্যে আনন্দিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সমাগত মধ্যাহ্ন কালে এই স্থানে আগমন করিয়া মিলনের নিমিত্ত মধুর স্বরে বংশীধ্বনি করিলেন। তাহা শুনিয়া ললিতা বলিল রাধে! নন্দনন্দন তোমার নিমিত্ত বন হইতে বংশীধ্বনি করিতেছে ঐ শোন তোমার বঁধুর বংশীধ্বনি। বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধিকা বলিল—ললিতে! রসিক শেখর আমার নিমিত্ত আর্ত্তস্বরে ঘন ঘন বংশীধ্বনি করিতেছে, বল এখন আমি তাহার সহিত কিরূপে মিলিত হইব। একে আমি অবলা, তদুপরি শ্বাশুরী, ননদীও কণ্টক, ইহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া কিরূপে অভিসার সম্ভব হইবে। ললিতা বলিল সখি! তুমি চিত্ত স্থির কর, তোমার কৃষ্ণমনোরথে অনুরাগ নামে এক সারথি আছে, রথির আদেশ পাইলে সারথি রথ সত্বরই কুঞ্জে লইয়া যাইবে। ললিতার বাক্যে শ্রীরাধিকা সাতিশয় আনন্দিতা হইয়া সোৎকণ্ঠায় সঙ্কেত নিকুঞ্জে মিলিত হইলেন এবং মিলনান্তে সকলে নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। ভাদ্র শুক্লাদশমীতে এখানে শ্রীরাসলীলার অভিনয় হইয়া থাকে। এখানকার শ্রীকৃষ্ণকুণ্ড ও বলরামকুণ্ড দর্শনীয়।

বড় বৈঠান—ইহা কোকিলা বনের আড়াই মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই গ্রাম শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের বৈঠক গৃহ বলিয়া বিখ্যাত। ব্রজবাসীগণের আগ্রহে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী এই স্থানে কিছুদিন যাবৎ ভজনানন্দে অতিবাহিত

করিয়াছিলেন। এখানে কুন্তল কুণ্ড বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সহিত এখানে কুন্তল বিন্যাস করিয়াছিলেন।

শ্রীচরণ পাহাড়ী—ইহা ছোট বৈঠানের এক মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই স্থানে গোপগণের বহু পদচিহ্ন রহিয়াছে এবং সুরভী, ঘোড়া ও হস্তীর পদচিহ্ন বিরাজমান। একদা শ্রীকৃষ্ণ কোন অপূর্ব্ব লীলার অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত অগ্রজ বলরাম সঙ্গে পরামর্শ করেন। তদনুসারে সমস্ত বয়োজ্যেষ্ঠ গোপগণ যানবাহন, অশ্ব, হস্তীকে শিলাখণ্ডের উপরে উপস্থাপিত করেন। এই সময় একটি হরিণও ভিন্ন স্থান হইতে দৌড়াইয়া পাহাড়ের উপর দিয়া যাইতেছিল। ঠিক ঐ সময়েই শ্রীকৃষ্ণ সুললিত বংশীধ্বনি করেন, সঙ্গে সঙ্গে পাষাণ দ্রব হওয়ায় গোপ ও গাভীগণের চরণচিহ্ন শিলাখণ্ডের উপরে বসিয়া যায়। পাষাণ যে কিরূপ কর্দ্দম সদৃশ নরম হইয়াছে তাহার গুরুত্ব প্রমাণের জন্য যেন ঐ গতিশীল হরিণের পদখুর পাষাণের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। সেই অবধি এই স্থানের নাম চরণপাহাড়ী। নিকটে শ্রীচরণগঙ্গা বিরাজমান। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ চরণ ধৌত করিয়াছিলেন। কেহ কেহ চরণপাহাড়ীর চিহ্নকে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম এবং সখাগণের চরণচিহ্ন বলিয়া উল্লেখ করেন বস্তুতঃ তাহা নহে, কারণ কাম্যবনের শ্রীচরণপাহাড়ীতে শ্রীকৃষ্ণের যে চরণচিহ্ন এবং ভোজন থালীর নিকটে বোমাসুরের গোফায় যাইবার সময় শ্রীবলরামের চরণচিহ্নের যে লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় এবং নন্দগ্রামের পূর্ব্বদিকস্থ অক্রুরেতে

শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নের যে লক্ষণ দৃষ্ট হয় তাহার সহিত চরণ-পাহাড়ীর চরণ চিহ্নের কোন সামঞ্জস্য নাই, সুতরাং এই বড় বড় চরণচিহ্ন শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম কিম্বা তদীয় সমবয়স্ক সখাদের না হইয়া বৃদ্ধ বৃদ্ধ গোপগণের পদচিহ্নই সুসিদ্ধ হইতেছে। ইহার পর রাসোলী।

শ্রীরাসোলী—চরণপাহাড়ী ও কোটবনের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহা শ্রীকৃষ্ণের শারদীয় রাসলীলার স্থল।

শ্রীকোটবন—চরণপাহাড়ের চারি মাইল উত্তরে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিশা। সখাসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস স্থল। এই স্থানে শীতল কুণ্ড ও সূর্য্যকুণ্ড দর্শনীয়। ইহার পরে হুড়েল।

হুড়েল—কোটবনের চারি মাইল বায়ুকোণে অবস্থিত। তাহার চারি মাইল বায়ুকোণে বনছারী গ্রামে যাইয়া পরিক্রমা রাস্তা দিয়া পূর্ব্ব মুখে খামী গ্রামে যাইতে হইবে।

খামী—এই গ্রাম হুড়েলের চারি মাইল ঈশানকোণে অবস্থিত। এই গ্রাম শ্রীবলদেবজীউর বিলাসস্থল। এই গ্রামে বলদেব জীউর হস্ত প্রেথিত খাম অদ্যাপি বিরাজমান, এই হেতু এই গ্রামের নাম খামী, ব্রজের সীমান্ত গ্রাম বিশেষ। এই স্থানে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ও শ্রীমহাদেব জীউ দর্শনীয়। ইহার পর পেঙ্গথু।

পেঙ্গথু—ইহা খামীর চারি মাইল অগ্নিকোণে অবস্থিত। ইহা ব্রজের সীমান্ত গ্রাম বিশেষ। অনন্তর বাসৌলী।

বাসৌলী—নামান্তর বাসো—ইহা পেঙ্গথুর অনুমানিক চারমাইল অগ্নিকোণে, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ সৌরভে এখানে ভ্রমরগণ ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িতেছিল। ইহা শ্রীরাধাগোবিন্দের বসন্তের হোলী খেলা স্থল। বসন্তের সমাগমে ব্রজের প্রতিটি বৃক্ষলতা আনন্দোচ্ছাসে মাতিয়া উঠিয়াছে, তাহারা সকলেই নব নব মুকুলে পরিপূরিত হইয়া অদ্ভুত শোভা ধারণ করিয়াছে। কাননে বিকসিত পুষ্পের মন মাতান গন্ধে আকৃষ্ট মধুকর ইতস্তত গুঞ্জন করিতেছে, শিখীকুল ঊর্দ্ধপিচ্ছে নৃত্য করিতেছে, কোকিল পঞ্চম স্বরে গান করিতেছে, আজ বৃন্দাবন যেন নব নব সাজে সজ্জিত হইয়া শুক্লা পঞ্চমী তিথিকে সাদর আহ্বান জানাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ বলরাম সখাসঙ্গে গোচারণ রঙ্গে বনের এই প্রকার শোভা দর্শন করিয়া অপরাহ্ন কালে শীঘ্র শীঘ্র গোধন লইয়া নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ স্নান ও ভোজনাদি সমাপন করিয়া হোলীর সাজে সজ্জিত হইয়া হোলী খেলায় প্রবৃত্ত হন। এইরূপে বেশ কিছুদিন খেলা চলিতেছিল, যখন দেখিলেন যে দোল পূর্ণিমার আর একমাস বাঁকী আছে তখন শ্রীরামকৃষ্ণ পিতা শ্রীনন্দমহারাজের নিকট আজ্ঞা লইয়া এক মাস যাবৎ গোচারণ লীলা বন্ধ করিয়া সখাগণের সহিত হোলী খেলিতে আরম্ভ করিলেন। ইতিমধ্যে একদিন পূর্ব্বাহ্নকালে স্নান ভোজনাদি কার্য্য সম্পন্ন করতঃ শ্রীকৃষ্ণ স্ব স্ব নামে সখাগণকে আহ্বান করিলে তাহা শুনিবামাত্রই সখাগণ হোলীর সাজে সাজিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট আগমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ

সখাগণের সহিত পরিবেষ্টিত হইয়া বহির্গত হইলেন। শ্রীবলরামও তাঁহার সখাগণের সহিত হোলী খেলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। লীলাবিলাসী আজ হোলী লীলায় প্রমত্ত হইয়া এদিক ওদিক ছুটিতেছেন এবং মোহন মুরলী ধ্বনি করিতেছেন। ব্রজরামাগণ সেই মুরলী ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সকলে উন্মত্তের ন্যায় গোলাল কুম্‌কুম ও পিচকারি প্রভৃতি লইয়া মুরলী ধারীর নিকট ছুটিয়া আসিল। এদিকে শ্রীরাধা সঙ্গে অগণিত সখীবৃন্দ এবং অপর দিকে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার সখাগণ, উভয় পক্ষে তুমুল রঙের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে শ্রীরাধিকার ইঙ্গিতে সুবল শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধারণ করিলেন, সেই অবসরে সখীগণ চতুর্দ্দিক হইতে বেষ্টন করতঃ শ্রীকৃষ্ণের অরুণবর্ণ বদন কমলকে কৃষ্ণবর্ণ করিয়া দিলে তদ্দর্শনে সকলে হাস্য করিতে লাগিলেন। গোপীগণের নিকট পরাস্ত ও অপমানিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ এবার গজেন্দ্রের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিয়া শ্রীরাধিকার প্রতি অজস্র গোলাল কুমকুম প্রভৃতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীরাধা ও তাঁহার সখীগণ নীরব না থাকিয়া বর্ষা ধারার ন্যায় তাঁহারাও পিচকারীতে রঙ্ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষের যুদ্ধ তুমুল আকার ধারণ করিলে রঙ্ ও গোলালাদি বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া গগন মণ্ডল আচ্ছাদিত হওয়ায় অসময়ে রক্তসন্ধ্যা নামিয়া আসিল। সকলের বস্ত্রাদি চিত্র বিচিত্র রঙে রঞ্জিত হওয়ায় সমগ্র ব্রজ আজ রক্ত কর্দ্দমে পূর্ণ হইয়া উঠিল। এই তুমুল যুদ্ধের মধ্যে সুচতুরা ললিতা সহসা কোন ছলে শ্রীকৃষ্ণকে

ধরিয়া ফেলিলে তখন সমস্ত সখীগণ কৃষ্ণের মুখচন্দ্র রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিয়া দিল এবং কোন সখা কৃষ্ণের সাহায্য করিতে আসিলে তাহাকেও বাদ দিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ নিরুপায় হইয়া পলায়ণ করতঃ সখাগণের সভায় আগমন করিলে সখীগণ শ্রীরাধার জয় ঘোষনা করিলেন,তখন সুবল আমার সখা রাইকে পরাস্তকরিয়াছে বলিয়া করতালি দিতে লাগিলেন। তখন ললিতা বলিল আমাদের রাই কৃষ্ণকে জিতিয়াছে, উভয় পক্ষের এইরূপ বাদানুবাদ ও গোলাল কুম্‌কুমের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রসিক শেখরের রস-লীলা দর্শনে মুনিগণ স্তব করিতে লাগিল এবং গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ নৃত্য গীত ও বাদ্য করিতে লাগিল এবং দেবতাগণ অন্তরীক্ষ হইতে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল।

শেষশায়ী—ইহা বাসৌলী গ্রামের দেড় মাইল দক্ষিণে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিশা, ক্ষীরসাগর গ্রামের পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। ঐ কুণ্ডের পশ্চিম তীরে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণদেব অনন্ত শয়নে আছেন এবং শ্রীলক্ষ্মীদেবী চরণ সেবা করিতেছেন। একদা শ্রীকৃষ্ণ কৌতুক করিবার জন্য এখানে জলের উপরে শয়ন করিয়াছিলেন এবং শ্রীরাধিকা চরণ প্রান্তে বসিয়া কোমল হস্তে পদসেবা করিতে ছিলেন। কথিত আছে একদিন সসখী শ্রীরাধাগোবিন্দ কৌতুকরসে মত্ত হইয়া নানা পুষ্প শোভিত বন উপবনে পরিবেষ্টিত পরম মনোহর এই ক্ষীর সরোবর তীরে আসিয়া উপবেশন করিলেন, সরোবরস্থ সলিলের অতিশয় সৌন্দর্য্য দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ মৃদু মন্দ হাঁসিতে হাঁসিতে শ্রীরাধাকে

বলিলেন শোন, প্রাণ প্রিয়ে! এই সরোবর প্রায় ক্ষীর সমুদ্রের তুল্য অতীব মনোহর! শ্রীনারায়ণ সেই ক্ষীর সমুদ্রে পরমানন্দে অনন্ত শয্যায় শায়িত আছেন, আর শ্রীলক্ষ্মীদেবী তাঁহার চরণ সেবা করিতেছেন। এই সরোবর দেখিয়া নারায়ণের কথা আমার মনে উদয় হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শুনিয়া শ্রীরাধা সানন্দে বলিল শ্রীনারায়ণ ক্ষীর সমুদ্রে অনন্ত শয্যায় কিরূপে শুইয়া আছেন? আর শ্রীলক্ষ্মীদেবীও বা কি প্রকারে তাঁহার চরণ সেবা করিতেছেন? ইহা শুনিতে আমার একান্ত বাসনা, তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিল প্রিয়ে! সে সব বৃত্তান্ত তুমি শুনিতে চাও, না দেখিতে চাও! শ্রীরাধা বলিল নাথ! যাহা সাক্ষাতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে শুনিবার উৎসাহ থাকে না। তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিল প্রিয়ে! আমি এই সরোবর মধ্যে শয়ন করি, আর তুমি আমার চরণ সেবা কর। তখন শ্রীরাধা বলিল এই সরোবর জলে পরিপূর্ণ, তাহাতে আবার প্রচুর তরঙ্গ, সুতরাং ইহাতে তোমার শয়ন এবং আমার পাদসেবা কিরূপে সম্ভব হইবে? তোমার বাক্যের অভিপ্রায় আমি কিছুই বুঝিতে পারছি না। শ্রীরাধার বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ বলিল শোন প্রিয়ে! এই সরোবর মধ্যে আমি শয়ন করিয়া তোমাকে এই অলৌকিক কার্য্য অবশ্যই দেখাইব, এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অনন্তকে স্মরণ করিবা মাত্র তিনি মনোহর ফণামণ্ডলে ঝলমল মণির সহিত ভূষিত হইয়া সরোবর মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত দেবকে দেখিয়া

সানন্দে নারায়ণ বেশে মূল ফণার মধ্যে শয়ন বিলাসে শোভিত হইয়া শ্রীরাধার প্রতি মধুর স্বরে বলিলেন প্রিয়ে! এস, চরণ সেবা কর, শ্রীরাধা তখন সহাস্য বদনে সখীগণের প্রতি ঈক্ষণ করিলে তাঁহারা মন্দ মন্দ হাঁসিতে হাঁসিতে বলিল সখি! যাও, তোমার প্রাণকান্তের চরণ সেবা কর। তদুত্তরে শ্রীরাধিকা বলিল সখি। কোথায় আমার প্রাণ কান্ত ইনিতো শঙ্খচক্র গদা-পদ্মধারী চতুর্ভূজ নারায়ণ। আমি কিরূপে ইহার চরণ সেবা করিব? তোমাদের অভিপ্রায় আমি কিছুই বুঝিতে পারছি না। তদুত্তরে সখীগণ বলিল—কোথায় নারায়ণ, ইনিতো মুরলীবদন শ্রীনন্দনন্দন, এখন দিব্য শয্যায় শয়নে আছেন। ইনি সিদ্ধ বিদ্যাবলে সকলকে এই নারায়ণ স্বরূপ দেখাইতেছেন, তবে যিনি নারায়ণ তিনিতো ক্ষীর সাগর মধ্যে লক্ষ্মীর সহিত শয়নে আছেন, তিনি এই সরোবর মধ্যে কিরূপে আসিবেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ সখীগণের বাক্যে লজ্জিত হইয়া সত্বর শ্রীনারায়ণ বেশ গোপন পূর্ব্বক তাঁহার সাহজিক কৃষ্ণ বেশ প্রকট করিলে শ্রীরাধা তদ্দর্শনে আনন্দিতা হইল এবং শ্রীকৃষ্ণ আপন ইচ্ছায় ভাসিতে ভাসিতে সরোবর তীরে গমন করিলেন, তখন ললিতা শ্রীরাধাকে সঙ্গে নিয়া তথায় গমন করিল এবং শ্রীরাধা লজ্জিতা ও হর্ষযুতা হইয়া প্রাণকান্তের চরণ প্রান্তে উপবেশন করিয়া সুকোমল হস্তে শ্রীকৃষ্ণ সুখকর মৃদুমন্দ ভাবে পদমর্দ্দণ করিতেছেন, কখনও বা নবনীত সুকোমল শ্রীকৃষ্ণ চরণ বক্ষে ধারণ করিতে-ছেন. কখনও বা ভয়ে ভয়ে পয়োধর যুগলে ধারণ করিতেছেন,

আবার কখনও প্রাণকান্তের মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করিয়া অতিরসে নিমগ্ন হইতেছেন। সখীগণ সরোবর তীরে অত্যাবিষ্ট হইয়া সেই শোভা দর্শন করতঃ নয়ন মন সফল করিতেছেন। যুগল-কিশোর সরোবর মধ্যে এইরূপে বিলাসানন্দে প্রমত্ত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে তীরে আসিয়া সখীগণের সঙ্গে মিলিত হইলে ললিতা বলিল শোন নাগর! তোমার এই লীলা অতি আশ্চর্য্যময় বটে, কিন্তু এই আশ্চর্য্যবিদ্যা তুমি কোথায় শিখিলে? ললিতার এই প্রশ্নে কৃষ্ণ বলিল—শোন ললিতে! আমি সর্ব্বারাধ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠতত্ত্ব, এই ব্রহ্মাণ্ডে কেহই সতন্ত্র নহে, সকলেই আমার বশীভূত দাস, আমার ইচ্ছামাত্রে ঈশ্বর সৃষ্ট্যাদি করিয়া থাকে, ধরণীধর মস্তকে ধরণী ধারণ করে, মহাদেব আমার গুণগানে সদা বিহ্বল, কিন্তু তোমরা গোপজাতি বলিয়া আমার বৈভব কিছুই জান না, সেই জন্য আমার এই অসমানোর্দ্ধ বৈভবকে আশ্চর্য্য বিদ্যা বলিতেছ। তদুত্তরে ললিতা বলিল—শোন চতুর শিরোমণি! গোপজাতিতে তোমার জন্ম, তোমার কার্য্যাবলী সখাসখী সঙ্গে বনে বনে রসরঙ্গ, আর তুমি গোপ রাজের নন্দন একথা ব্রজে কেবা না জানে? এখন তুমিই বল ঈশ্বর কে? তবে যাহারা গোপ নন্দন তোমার স্বরূপকে না জানে তাহারা তোমাকে ঈশ্বর বা নারায়ণ বলিয়া থাকে, কিন্তু আমাদিগকে তুমি ঐ সিদ্ধ বিদ্যায় ভুলাইতে পারিবে না। সখীগন শ্রীকৃষ্ণ ও ললিতার বাক্য শুনিয়া হাঁসিতে লাগিলেন। এইস্থানে এই প্রকার পরম রসময়ী লীলার

আবির্ভাব হওয়ায় ইহা শেষশায়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই অবধি এইস্থান শেষশায়ী বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। শেষশায়ী হইতে উজানী যাইবার দুইটি রাস্তা আছে, কেহ কেহ পূর্ব্বাভিমুখে বার্কা রূপনগর, মঝই তদনন্তর দক্ষিণ মুখী হইয়া রামপুর গ্রাম দিয়া উজানিতে গমন করিয়া থাকেন আবার কেহ কেহ রাসস্থলী দর্শন করিয়া উজানীতে গমন করেন। তাঁহাদের পক্ষে যথা—

খেরট—নামান্তর খেররা—শেষশায়ীর চারি মাইল দক্ষিণে কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব দিশা, এই স্থান শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ স্থল। ইহার পূর্ব্বে বাছৌলী গ্রাম।

বাছৌলী—খেররের আড়াই মাইল পূর্ব্বে এবং পঁয়গ্রামের চারি মাইল বায়ুকোণে অবস্থিত। এই গ্রাম শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার স্থল। এখান হইতে পূর্ব্বে উজানী যাইতে হইবে।

উজানী—ইহা বাছৌলীর ছয় মাইল পূর্ব্বে এবং পঁয়গ্রামের চারি মাইল ঈশানকোণে অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের সুললিত বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া শ্রীযমুনা উজান বহিয়াছিল। অদ্যাপি এই স্থানে যমুনা স্রোতের এক অপূর্ব্ব পরিপাটী দৃশ্য হইয়া থাকে। কেহ কেহ এই স্থান হইতে যমুনা পার হইয়া তীরে তীরে অথবা দৌতলপুর, চীনপাহাড়ী, ধেদ্‌না ও পিঠোরা শুরীর, বৈকুণ্ঠ পুর ও শ্যামলী গ্রাম দর্শন করিয়া ভদ্রবন অভিমুখে গমন করেন আবার কেহ কেহ যমুনার পশ্চিম তীরের লীলাস্থলী দর্শন করিবার জন্য খেলন বন অভিমুখে

গমন করিয়া থাকেন।

খেলন বন—নামান্তর সেরগড়—এই গ্রাম উজানীর দুই মাইল অগ্নিকোণে যমুনাতীরে অবস্থিত। সখাগণ সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলরামের বিবিধ খেলার স্থান। এখানকার বলরামকুণ্ড দর্শনীয় এখান হইতে পূর্ব্বদিকে রামঘাটে যাইতে হইবে।

শ্রীরামঘাট—সেরগড়ের দুই মাইল পূর্ব্বে যমুনা তীরে অবস্থিত। এখানকার গ্রামের নাম উবে, এখানে শ্রীবলরাম স্বীয় প্রেয়সী গণের সহিত দুই মাস ব্যাপী বিবিধ রাসলীলা করিয়াছিলেন। একদিন শ্রীবলদেব বারুণী মদে মত্ত হইয়া জলক্রীড়ার নিমিত্ত আহ্বান করায় যমুনা নিকটে না আসায় বলরাম অতিশয় ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক হলের দ্বারা যমুনাকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। যমুনা স্বীয় অপরাধ ক্ষমা ভিক্ষা করিবার জন্য শ্রীবলরামের শরণাপন্ন হইলে তিনি যমুনার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই অবধি যমুনা বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত রামঘাটে বক্র হইয়া বিরাজ করিতেছেন। রামঘাটে শ্রীবলরামের মন্দির অতি জীর্ণ অবস্থায় বিরাজ করিতেছেন। মন্দিরের পার্শ্বে একটি প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ আছেন। এই বৃক্ষ বলরামের সখা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানে শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু কিছু কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। রাম ঘাটের দেড় মাইল পূর্ব্বে বহিদপুর এই গ্রামের বায়ুকোণে ভূষণ বন। এখানে সখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে পুষ্প ভূষায় ভূষিত করিয়াছিলেন। বহিদ পুরের অগ্নিকোণে মিবার বন। রামঘাটের দেড় মাইল

নৈঋতকোণে বিহারবন অবস্থিত। এখানে সখাসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ বিহারের স্থান বিদ্যমান।

শ্রীঅক্ষয় বট—পূর্ব্ব নাম ভাণ্ডীরবট—এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম একদিন গোচারণ করিতে আগমন করিলে কংসের চর প্রলম্বাসুর তাঁহাদের অনিষ্ট কামনায় আপন বেশ গোপন করতঃ সখারূপে নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল। চতুর শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এই সময় এক অপূর্ব্ব খেলার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাহাতে পণ হইয়াছিল যে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের পক্ষে যে খেলা হইবে, তাহাতে যাঁহারা পরাস্ত হইবে, তাঁহাদিগকে জেতৃগণকে স্কন্ধে বহন করিয়া ভাণ্ডীরের নিকট লইয়া যাইতে হইবে। এইরূপে খেলিতে খেলিতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামের নিকটে এবং প্রলম্বাসুর বলরামের নিকট পরাজিত হইয়া শ্রীদামকে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবলরামকে প্রলম্বাসুর স্কন্ধে বহন পূর্ব্বক ভাণ্ডীরবন অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুষ্ট অসুর এই সুযোগে শ্রীবলরামকে বিভিন্ন স্থানে লইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। শ্রীবলরাম বাল্য খেলার আবেশে প্রথমে অসুরের ছলনা বুঝিতে পারে নাই, পরে অসুরের চাতুরী বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ উহার মস্তকে বামহস্তের মুষ্টিকাঘাত করিবামাত্র প্রলম্ব স্বীয় আসুরী মূর্ত্তি প্রকট করিয়া ভূতলে লম্বমান ভাবে পতিত হইল এবং রুধির বমন করিতে করিতে ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছিল। এই কশ্রথ খেলার পর হইতে অক্ষয়বটের পশ্চিম গ্রামের নাম কাশ্রট

বলিয়া সর্ব্ব সাধারণে বিখ্যাত হইয়াছে। কাশ্রটের দুই মাইল নৈঋতকোণে আগিয়ারো গ্রাম মুঞ্জাটবী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানে শ্রীকৃষ্ণ দাবানল পান করিয়া গো গোপ প্রভৃতিকে রক্ষা করিয়াছিলেন। মতান্তরে যমুনার পূর্ব্ব তীরবর্ত্তী ভাণ্ডীর বনই ভাণ্ডীরবট এবং এই স্থানের ছয় মাইল অগ্নিকোণবর্ত্তী আরা গ্রাম, যাহা মুঞ্জাটবী বলিয়া কথিত। এখানে হইতে পূর্ব্ব দিকে গোপীঘাট।

শ্রীগোপীঘাট—অক্ষয় বটের পুর্ব্ব ভাগে অবস্থিত, এখানে গোপীগণ কাত্যায়নী ব্রত করিয়াছিলেন সেব অবধি এই ঘাটের নাম তপোবন রাখা হইয়াছে

শ্রীচীরঘাট—ইহা গোপীঘাটের দুই মাইল দক্ষিণে এবং অক্ষয়বটের অগ্নিকোণে অবস্থিত। ঘাটের উপরে অতি প্রাচীন কদম্ববৃক্ষ বিরাজমান। কাত্যায়নী ব্রতের উদ্‌যাপন দিবসে গোপিকাগণ এখানকার যমুনাতীরে বস্ত্র রাখিয়া স্নান করিবার সময় শ্রীকৃষ্ণ অলক্ষিতভাবে তাঁহাদের বস্ত্র হরণ করিয়া এই কদম্ব বৃক্ষে উঠিয়াছিল। অবশেষে গোপীগণকে বাঞ্ছিত বর প্রদানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। নিকটে শ্রীকাত্যায়নী দেবী মন্দির বিরাজমান। গ্রামের নাম শিয়ারো, চীর নামের অপভ্রংশেই এই নাম রাখা হইয়াছে।

শ্রীনন্দঘাট—চীর ঘাটের দুই মাইল দক্ষিণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব দিশা, যাইবার সময় গাংগ্রলী গ্রাম হইয়া যাইতে হয়।

ভয়গাঁও—ইহা নন্দঘাটের সংলগ্ন গ্রাম। একদা

শ্রীব্রজরাজনন্দ একাদশী দিনে ব্রত ধারণ করিয়া রাত্রি জাগরণ করতঃ নিশান্তে যমুনায় স্নান করিয়া নিজ ইষ্টধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। এমন সময়ে বরুণ দেবের চরণ তাঁহাকে হরণ করিয়া বরুণ পুরীতে লইয়া যায়। এদিকে শ্রীব্রজরাজের সঙ্গীয় লোক তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত ভীতমনা হইয়া অবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম নিকটে দৌড়াইয়া গিয়া বিষয়টি জ্ঞাপন করিলেন। শুনিবামাত্র ভ্রাতৃযুগল সমস্ত ব্রজবাসী সহ নন্দঘাটে উপস্থিত হইলেন। এই সময় মাতা ব্রজেশ্বরী ও উপানন্দ প্রভৃতি যে কিরূপ বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন তাহা বর্ণনার অতীত। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজের উপর ব্রজবাসী-গণের রক্ষার ভার সমর্পণ পূর্ব্বক পিতাকে উদ্ধার কামনায় যমুনায় প্রবেশ করিলেন। বলরামের আশ্বাসে ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণের আগমন পথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বরুণা-লয়ে উপস্থিত হইলে পর বরুণদেব স্বীয় প্রভুকে নানা প্রকার স্তব স্তুতি ও পূজা করিয়া শ্রীব্রজরাজকে মহাসম্মানের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত করিলেন এবং নানাবিধ মণি ও রত্নদানে পরি তুষ্ট করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পিতাকে অগ্রে করিয়া অবি-লম্বে তীরে আগমন করিলেন। তদ্দর্শনে সমস্ত ব্রজবাসী যাবতীয় দুঃখ পরিতাপ ভুলিয়া অতুল আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। শ্রীব্রজরাজ ও তাঁহার সঙ্গীয় লোক এই স্থানে ভয় পাওয়ায় সেই অবধি এই গ্রামের নাম ভয়গাঁও বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

জয়েত পুর—এই গ্রাম নন্দঘাটের দুই মাইল দক্ষিণে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ বরুণ আলয় হইতে ব্রজরাজকে লইয়া উপস্থিত হইলে এখান হইতে দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি সহ জয়ধ্বনি করিয়াছিলেন, এই হেতু জয়েত পুর নাম।

হাজরা—জয়েত পুরের দেড় মাইল নৈঋতকোণে অবস্থিত। এখানে ব্রহ্মা গোপশিশু ও বৎসগণকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট হাজির করিয়াছিলেন অর্থাৎ উপস্থিত করিয়াছিলেন। এই হেতু হাজরা বলিয়া এই গ্রাম পরিচিত।

বারারা—নামান্তর বলিহারা—এখানে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সঙ্গে বরাহ খেলা করিতেন এবং এই স্থান হইতে ব্রহ্মা গোবৎস হরণ করিয়াছিলেন। এই গ্রাম হাজরার এক মাইল নৈঋতকোণে অবস্থিত।

বাজনা—বলিহারার এক মাইল নৈঋতকোণে অবস্থিত। ইহার দেড় মাইল পশ্চিমস্থ গ্রাম পাসৌলীতে অঘাসুর বধ হইলে দেবতাগণ এই স্থানে আনন্দে বাজনা অর্থাৎ বাদ্যধ্বনি করিয়াছিলেন।

জেওলাই—নামান্তর জনাই—অঘাসুর বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ এখানে সখাদের সঙ্গে ভোজন করিয়াছিলেন এবং এই স্থান হইতে ব্রহ্মা গোপশিশুকে হরণ করিয়াছিলেন। এই দিন শ্রীবলরাম স্বীয় জন্ম তিথি উপলক্ষে গৃহে ছিলেন। এই গ্রাম বাজনার দেড় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

শকরোয়া—ইহা জেওলাই গ্রামের আড়াই মাইল পূর্ব্বে, ইহা ইন্দ্রের স্থান বলিয়া পরিচিত।

আঠাস—শকরোয়ার দেড় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই স্থান অষ্টাবক্র মুনির তপস্যাস্থল বলিয়া সর্ব্বসাধারণের পরিচিত।

ছুন্‌রাক—আঠাসের সওয়া মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই স্থান সৌভরী মুনির আশ্রম। ইহার সওয়া মাইল পূর্ব্বে বৃন্দাবন এবং এক মাইল পশ্চিমে দেবী আঠাস।

শ্রীদেবী আঠাস—শ্রীকৃষ্ণ ভগ্নী শ্রীএকোনংশা দেবীর গ্রাম, দেবী এখানে অষ্টভুজারূপে বিরাজ করিতেছেন। একোনংশা দেবীর অপর নাম শ্রীবিন্ধ্যাবাসিনী ইনি শ্রীবিন্ধ্যাচল পর্ব্বতোপরি অষ্টভুজারূপে বিরাজমান।এই গ্রাম আঠাস গ্রামের এক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

পরখম—দেবী আঠাসের দুই মাইল বায়ুকোণে এবং জনাই গ্রামের এক মাইল পশ্চিমে কিঞ্চিৎ উত্তর দিশা অবস্থিত। জেওলাই অর্থাৎ জনাই এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণকে সখাসঙ্গে উচ্ছিষ্ট ফল ভোজন করিতে দেখিয়া ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধমনা হইয়াছিলেন। এই হেতু তিনি এখানে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণকে পরীক্ষা করিবার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ইহার পশ্চিমের গ্রাম চৌমুহা।

চৌমুহা—পরখমের সওয়া মাইল পশ্চিমে কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিশা। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে এখানে অশেষরূপে স্তুতি করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়াছিলেন। এই

দিন শ্রীবলরাম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে গৃহে ছিলেন। এই গ্রাম জৈতের চারিমাইল বায়ুকোণে অবস্থিত।

আজই—ইহা চৌমুহার এক মাইল দক্ষিণে কিঞ্চিৎ পশ্চিম দিশা। ব্রহ্মমোহনের পরক্ষণে সমস্ত গোপ শিশু এই স্থানে আগমন করিয়া ব্রজবাসীগণের নিকট বলিয়াছিল শ্রীকৃষ্ণ বনে আজ অঘাসুরকে বধ করিয়াছে। সেই অবধি এই স্থানের নাম আজই বলিয়া বিখ্যাত।

সিহানা—আজই গ্রামের দুই মাইল বায়ুকোণে অবস্থিত। এই গ্রাম চৌমুহার পশ্চিম। এই স্থানে ব্রজবাসীগণ অঘাসুর বধ সংবাদে অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে "সিহানা" অর্থাৎ চতুর বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই স্থানে শ্রীসনক, সনন্দ সনাতন ও সনৎকুমার চতুঃসনের বিগ্রহ এবং ক্ষীর সাগরতীরে পুড়ানাথজী নামক শ্রীনারায়ণদেব দর্শনীয়। এই গ্রামের ঈশানে পসৌলী।

পসৌলী—ইহা সিহানার চারি মাইল ঈশান কোণে অবস্থিত। এই গ্রামে যাইবার সময় আকবর পুর হইয়া যাইতে হয়। এই গ্রাম পরখমের দুই মাইল বায়ুকোণে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ এখানে অঘাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। এই হেতু কেহ কেহ এই গ্রামকে সর্পস্থলী বা সাপৌলী বলিয়াও উল্লেখ করেন। অঘাসুরের মুখ গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করার ফলে এই স্থানের নাম পসৌলী। এই দিনও শ্রীবলদেবজীউ জন্মতিথি উপলক্ষ্যে গৃহে ছিলেন। এই গ্রামের বায়ুকোণে বরলী।

বরলী—পসৌলীর দুই মাইল বায়ুকোণে অবস্থিত। যাইবার সময় পিঠরা গ্রাম হইয়া যাইতে হয়। এই গ্রাম শ্যামরির এক মাইল পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ উত্তর দিশা।

তরলী—এই গ্রাম বরলীর এক মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত।

এই—নামান্তর এওরী—তরলীর দেড় মাইল পূর্ব্ব ভাগে অবস্থিত।

সেই—ইহা এই গ্রামের দেড় মাইল অগ্নিকোণে অবস্থিত, এই স্থানে ব্রহ্মা কৃষ্ণ মায়ায় মোহিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা অপহৃত শিশু বৎস শ্রীকৃষ্ণ নিকটে দেখিয়া পুনর্ব্বার তাহাদিগকে যেই স্থানে রাখিয়াছিলেন, সেই স্থানে যাইয়া দেখিলেন সেই শিশু বৎস নিদ্রিত অবস্থায় কাল কাটাইতেছেন। তখন ব্রহ্মা একবার শ্রীকৃষ্ণ নিকটে এবং পুনর্ব্বার বৎস শিশু নিকটে যাওয়া আসা করিতে লাগিলেন এবং "এই সেই সেই এই" বলিতে বলিতে অবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণ চরণে শরণ গ্রহণ করিলেন। উভয় গ্রামের মধ্যদেশে বৎস বন অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন এই স্থান হইতে ব্রহ্মা গোবৎস হরণ করিয়াছিলেন। এই স্থান বৎসাসুর বধের স্থল।

মাই ও বসাই—ইহা সেই গ্রামের দেড় মাইল ঈশান কোণে অবস্থিত। এই মাই গ্রামের ঈশান কোণই বসাই গ্রাম। এই স্থানে দাঁড়াইয়া ব্রহ্মা প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকে অপহৃত শিশু বৎসের সহিত খেলা করিতে দেখিয়া আশ্চার্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। বসাই গ্রামের দুই মাইল ঈশানকোণে শ্রীনন্দ

ঘাট বিরাজমান। শ্রীপাদ জীব গোস্বামী একদা শাস্ত্র বিচারে কোন দিগ্বিজয়ীকে পরাস্ত করিলে শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহাকে বলিলেন এখনও তোমার প্রতিষ্ঠার লোভ রহিয়াছে—অতএব আমার নিকট থাকিও না। এই কথা শুনিয়া শ্রীজীব নন্দ ঘাটের নিকটস্থ জঙ্গলে মহাদুঃখে কাল কাটাইতে লাগিলেন এবং যৎকিঞ্চিৎ গোধুম চূর্ণ জলের সঙ্গে মিশাইয়া তদ্দ্বারা দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী ব্রজ পরিক্রমা ছলে নন্দঘাটে উপস্থিত হইলে ব্রজবাসীগণের মুখে শুনিয়া শ্রীজীবের নিকট গমন করেন এবং তাঁহার বাচনিক সমস্ত অবগত হইয়া আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। এই সময় শ্রীরূপ গোস্বামী জীবে দয়া সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ছিলেন। শ্রীসনাতন শ্রীরূপের মুখে শুনিয়া বলিলেন, তুমি অন্যকে শিক্ষা দিতেছ, কিন্তু নিজে প্রতিপালন করিতেছ না। শ্রীসনাতনের প্রহেলীর মর্ম্ম অবগত হইয়া শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীজীবকে শীঘ্র নন্দঘাট হইতে আনাইয়া বিশেষ কৃপা করিয়াছিলেন। এই নন্দঘাটে বসিয়া শ্রীজীব গোস্বামী ষড়সন্দর্ভ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীনন্দঘাট হইতে যমুনা পার হইয়া পূর্ব্বতীরে ভদ্রবন।

তস্মিন্ ভদ্রবনং নাম ষষ্ঠঞ্চ বনমুত্তমম্।
তত্র গত্বা তু বসুধে! মদ্‌ভক্তো মৎপরায়ণঃ॥
তদ্বনস্য প্রভাবেণ নাগলোকং স গচ্ছতি॥

শ্রীভদ্রবন—ইহা নন্দঘাটের দুই মাইল অগ্নিকোণে

শ্রীযমুনা তীরে অবস্থিত। এই বন দ্বাদশ বনের অন্যতম ষষ্ঠ বন। এই উত্তম বনে গমন করিলে আমার ভক্ত ও শরণাগতজন এই বনের প্রভাবে নাগলোক স্বর্গে গমন করে। এই বন শ্রীরাম কৃষ্ণের বিবিধ খেলা ও গোচারণ স্থল। ইহার দুই মাইল দক্ষিণে ভাণ্ডীরবন অবস্থিত।

একাদশস্তু ভাণ্ডীরং যোগিনাং প্রিয়মুত্তমম্।
তস্য দর্শন মাত্রেণ নরো গর্ভং ন গচ্ছতি॥

শ্রীভাণ্ডীরবন—ভদ্রবনের নিকটস্থ ভাণ্ডীর নামক একাদশ বনটি যোগিগণের প্রিয়। এই বন দর্শন করিলে আর গর্ভবাস করিতে হয় না। সংযত চিত্তব্যক্তি এই স্থানে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া ইন্দ্রলোকে গমন করেন। এখানকার ভাণ্ডীর কুণ্ড নামান্তর অভিরাম কুণ্ড ও তত্তীরবর্ত্তি মন্দিরে শ্রীদাম চন্দ্র দর্শনীয়। এই বনে বেণু কূপ বিরাজমান। কথিত আছে—রাসোৎসবের উন্মুখে রাসরসিক শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তমা শ্রীরাধার সহিত নিভৃতলীলা বিলাস করিবার নিমিত্ত সমস্ত ব্রজসুন্দরীগণকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাধাকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। নিভৃত লীলাবিলাসে উভয়েই পরিশ্রান্তা হইয়া শ্রীরাধা পিপাসার্ত্তা হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সেই পিপাসার্ত্তি নিবারণেচ্ছায় সেই সময় আশু বেণুবাদন করিয়াছিলেন। তাহাতে প্রেমময় সলিল পরিপূরিত বেণুকূপ আবির্ভাব হইয়াছিল। এই বনে শ্রীরাধিকা সুবলের বেশে গোষ্ঠে আগমন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়াছিলেন।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ ভাণ্ডীরবটে আগমন করতঃ বংশীধ্বনি করিলে তৎশ্রবণে শ্রীমতী রাধিকা অধৈর্য্য হইয়া সখীগণের সহিত তথায় আসিয়া মিলিত হইলেন। শ্রীরাধিকা প্রাণকোটি প্রিয়-তমের সহিত মিলিত হইয়া সানন্দে শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন সখাগণের সহিত এখানে কি লীলা হয় ? শ্রীরাধিকার প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণ গর্ব্বভরে বলিলেন আমি মল্লবেশ ধরিয়া সখা-গণের সহিত মল্লযুদ্ধ করি, কেহই আমার সহিত পারে না, আমি সকলকে পরাস্ত করি। শ্রীকৃষ্ণের গর্ব্বপূর্ণ বাক্য শুনিয়া ললিতা হাঁসিতে হাঁসিতেবলিল-আমরাও তোমার সহিত মল্লবেশে যুদ্ধ করিব দেখি কে আমাদিগকে হারাইতে পারে। ললিতার বাক্য শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ সগর্ব্বে শ্রীরাধাদির সহিত মল্ল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ভীষণ মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল, কিন্তু কেহই কাহাকেও পরাজয় করিতে পারিল না। এইরূপে সসখী শ্রীরাধা সানন্দে মদনমোহনের সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়া এখানে মদনের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। এই বনের ছয় মাইল অগ্নিকোণে আরা গ্রাম। তথায় দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া যখন গোপশিশু ও গোপগণকে সন্তপ্ত করিতে লাগিল তখন শ্রীকৃষ্ণ সখাদিগকে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিতে অনুমতি করিয়া তৎক্ষণাৎ অনল নির্ব্বাপণ করিলেন। এদিকে সখাগণ চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন গাভীগণ সহ তাঁহারা সকলেই শ্রীভাণ্ডীর বটের নিকটে অবস্থান করিতেছেন। ইহাতে সখাগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবকে বারংবার প্রশংসা করিতে করিতে অত্যন্ত আনন্দের সহিত

আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। এইবন শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের অত্যন্ত প্রিয়।

ছাহেয়ী—নামান্তর বিজৌলী—ইহা ভাণ্ডীর বনের পূর্ব্ব সংলগ্ন গ্রাম। ভাণ্ডীরবনে খেলার পরে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম সখা সঙ্গে এখানে ছায়ায় বসিয়া ভোজন করিয়াছিলেন, কেহ কেহ এই স্থানকে প্রলম্ব অসুর বধের স্থান উল্লেখ করেন।

মাঠবন—ভাণ্ডীর বনের দুই মাইল দক্ষিণ। শ্রীকৃষ্ণের খেলা ও গোচারণস্থল, এই স্থানে মৃত্তিকার বৃহৎ বৃহৎ মাঠ প্রস্তুত হয় বলিয়া এই গ্রামের নাম মাঠ রাখা হয়। এই মাঠবনের দুই মাইল দক্ষিণ শ্রীবৃন্দাবনের সওয়া মাইল উত্তরে যমুনার পর পারে বেলবন অবস্থিত।

বনং বিল্ববনং নাম দশমং দেবপূজিতম্।
তত্র গত্বা তু মনুজো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

শ্রীবেলবন—শ্রীবৃন্দাবনের উত্তরস্থিত বিল্ববন নামক দশম বন দেবতাগণের পূজ্য। মনুষ্য এই স্থানে আগমন করিলে ব্রহ্মলোকে পূজিত হয়। এই বন শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ স্থল। এই স্থানে শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীনন্দনন্দনের বিলাস লালসায় তপস্যা করিতেছেন। কোন সময়ে বৈকুণ্ঠেশ্বরী শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য দর্শন করিয়া তাঁহাতে লালসান্বিত হইয়া তিনি শ্রীনারায়ণের বক্ষঃবিলাসিনী প্রেয়সী হইয়াও বৈকুণ্ঠগত দিব্যভোগ অভিলাষ পরিত্যাগ ও ব্রত ধারণ পূর্ব্বক তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মীদেবীকে তপস্যারতা দেখিয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার তপস্যার কারণ কি ? শ্রীলক্ষ্মীদেবী বলিলেন, আমি গোপীরূপ ধারণ করিয়া তোমার সহিত বৃন্দাবনে বিহার করিব, ইহাই আমার একান্ত অভিলাষ। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন ইহা অতীব দুর্লভ। শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবী পুনরায় বলিলেন হে নাথ ! আমি স্বর্ণরেখার ন্যায় তোমার বক্ষঃস্থলে বাস করিতে ইচ্ছা করি, আমার এই অভিলাষ পূর্ণ করুন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন আচ্ছা তাহাই হইবে, তদবধি শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে স্বর্ণরেখারূপে অবস্থান করিতেছেন। এখানে শ্রীলক্ষ্মীদেবী দর্শনীয় এই স্থানে পৌষমাসের প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীবৃন্দাবনস্থ দেবালয়ের সেবাইত বৃন্দ তথা নাগরিক বৃন্দ মহা সমারোহের সহিত বন্যভোজনের আয়োজন করিয়া থাকেন। এইবন ও মাঠবনের মধ্যবর্ত্তী গ্রামকে ডাঙ্গৌলী গ্রাম বলে।

শ্রীমানসরোবর—ইহা বেলবনের সওয়া তিন মাইল পূর্ব্বে এবং ডাঙ্গৌলী গ্রামের অগ্নিকোণে অবস্থিত। কিংবদন্তী—কোন কারণ বিশেষে শ্রীমতী রাধারাণী মান বশতঃ এই স্থানে উপবেশন করিয়া অশ্রু বর্ষণ করিলে সেই অশ্রুই সরোবররূপে প্রকটিত হইয়াছিল। এই সরোবরের তীরে শ্রীরাস বেদী ও শ্রীরাধারাণীর মন্দির দর্শনীয়, সম্মুখের শ্রীমন্দিরে পদতলে বসিয়া স্তবরত শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত। সরোবরের পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী গ্রামের নাম পিপ্রৌলী। এই গ্রামের আড়াই মাইল ঈশানে আরা গ্রাম যাহা মুঞ্জাটবী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

পাণিগাঁও—মান সরোবরের দুই মাইল দক্ষিণে অবস্থিত, এই গ্রাম বৃন্দাবনের সওয়া মাইল অগ্নিকোণে যমুনার পূর্ব্বতীরে বিরাজিত। একদা শ্রীদুর্ব্বাসা মুনি একাদশীর পারণ উপলক্ষ্যে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিকট অন্ন ভোজনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া যমুনার পরপারে যাইয়া শ্রীভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের চমৎকারিত্ব উৎপাদক কোন লীলার অভিনয় করিয়া তাঁহাদিগকে যমুনা পার করাইয়া মুনিকে ভোজন করাইয়াছিলেন। গোপিকাগণ যে ঘাটে পার হইয়া মুনিকে ভোজন করাইয়াছিলেন সেই ঘাটের নাম পাণিঘাট এবং যে স্থানে বসিয়া মুনি ভোজন করিয়াছিলেন সেই স্থানের নাম পাণিগাঁও বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। গ্রামের মধ্যভাগে বৎসকুণ্ড বিরাজমান, এই স্থানে বসিয়া দুর্ব্বাসা গোপিকাগণের আনীত সমস্ত ভোজ্য দ্রব্য ভোজন করিয়াছিলেন। এই গ্রামের পাঁচ মাইল দক্ষিণে লৌহবন অবস্থিত।

লোহজঙ্ঘবনং নাম লোহজঙ্ঘেন রক্ষিতম্।
নবমং তু বনং দেবি! সর্ব্বপাতক নাশনম্॥

শ্রীলৌহবন—পাণি গাঁওয়ের দক্ষিণস্থ এই বন লোহজঙ্ঘাসুর কর্ত্তৃক রক্ষিত। লোহ জঙ্ঘ নামক এই নবম বন অতি মনোহর ও সর্ব্বপাতক নাশক। এই স্থানে জঙ্ঘাসুর বধ হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম সখাগণের সমভিব্যাহারে এই বনে গোচারণ করিয়া থাকেন। লোহ জঙ্ঘাসুর এই স্থানে বধ

হওয়ায় এই রমণীয় স্থানের নাম লৌহবন বলিয়া প্রসিদ্ধ। নানা পুষ্প সুগন্ধে পরম মনোহর এই লৌহবনের সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা বিবিধ বিহার করিয়া থাকেন। ইহার সন্নিকটস্থ যমুনা তীরে শ্রীরাধাগোবিন্দের অপূর্ব্ব নৌকা বিহার লীলা সম্পন্ন হইয়াছিল। একদিন শ্রীমতী বৃষভানু নন্দিনী নিজ সখী বৃন্দের সহিত দধি দুগ্ধের পসরা সাজাইয়া যমুনা পারের নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করেন, রাধাদি ব্রজবালার অপূর্ব্ব রূপ লাবণ্যের শোভা সন্দর্শনে সাতিশয় মুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ আজ এই ঘাটে নাবিক বেশে একখানি জীর্ণ তরীর উপর কপট নিদ্রিত ছিল, নিদ্রা—জড়িমায় অভিভূত সেই নাবিককে দেখিয়া সসখী শ্রীরাধা বারম্বার আহ্বান করিয়া বলিতেছেন হে নাবিক! আমাদিগকে পার করে দাও, আমরা শীঘ্রই পারে যাইব। তাহাদের আহ্বান শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ কিছুক্ষণ পর তাহাদিগকে আনন্দে নৌকায় তুলিয়া যমুনার মধ্যভাগে গিয়া বলিল নৌকা পারের মূল্য দাও। কিন্তু শ্রীরাধিকার নিকট পার মূল্য না থাকায় দুঃখে তাঁহার মুখকমল ম্লান হইয়া গেল। তাঁহার মুখম্লান দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিল প্রিয়ে? তোমার গব্যভারে আমার তরী নিশ্চল হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ বাক্যে শ্রীরাধা গব্যভার জলে নিক্ষেপ করিলেও নৌকা আদৌ চলে নাই। শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ বলিল তোমার কণ্ঠহার ও পয়োধর যুগলের বসন পরিত্যাগ না করিলে আমার এই জীর্ণ তরী কোন প্রকারেই চলিতে পারিবে না। শ্রীকৃষ্ণ বাক্যে শ্রীরাধা তদ্রূপ করিয়াও তরী

তীরে না যাইতে দেখিয়া অত্যন্ত ভীতা হইয়া বলিল হে নাবিক! তোমারই কথায় আমি গব্যভার ও কণ্ঠহার জলে নিক্ষেপ করিয়াছি, স্তনযুগলের বসনও দূর করিয়াছি তথাপি তরণি যমুনার তীর নিকটবর্ত্তী হইল না। ওহে নাবিক! এক তোমার এই জীর্ণতরী জলে পরিপূর্ণ তদুপরি বায়ুতে ঘূর্ণি-পাকে পড়িয়া গভীর জলে প্রবেশ করিতেছে হায় হায়! আজ আমার একি হল, আমার কি দুর্দ্দৈব আমি তোমার নৌকায় পা দিয়াছি। শ্রীরাধার এই দুরবস্থা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বার বার আনন্দে করতালি দিতেছে, এবার শ্রীরাধিকা অত্যন্ত ভীতা হইয়া বলিতেছেন হে কৃষ্ণ! দেখ আমার দুই হস্ত আর জল সেচন করিতে পারিতেছে না, তথাপি তোমার পরিহাস বাক্যের বিরাম নাই, শোন কৃষ্ণ! যদি বাঁচি তবে আর কোনদিন তোমার নৌকায় পা ধরিব না। হে সখীগণ! তোমরা স্বীয় ইষ্টদেবকে প্রণাম কর, যেন যমুনার জল জানু পর্য্যন্ত হয় এবং নাবিকও যেন অন্ত হয়। এই নৌকা একদিকে ঢাল, আবার নদীও গভীর, নন্দনন্দন নাবিকও অতি চঞ্চল, তাতে আমি অবলা, ভানুও অস্তাচল উন্মুখ, নগরও এখন বহুদূর বল সখি। এখন আমি কি করি? আরও বলি নন্দনন্দন স্তুতি কথাকে আদর করে না, মিনতি করিলেও শুনে না আবার চরণে বার বার প্রণাম করিলেও মানে না, বল সখি! এখন আমি কি উপায় করি। দেখ সখি! যমভগিনী যমুনা তরঙ্গ দ্বারা তীর লঙ্ঘন করিতেছে, নৌকাও জলে পরিপূর্ণ

হইয়াছে, নন্দনন্দন কলঙ্কের ভয় করে না। শ্রীরাধিকার বিলাপ বচন শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিল—হে সুন্দরি। হে রাধে! আজ তুমি আমার প্রতি কঠিনা হইও না, তোমার অনুগ্রহে আমি জীবিত আছি, হে প্রিয়ে পর্ব্বত গুহার আনন্দ উৎসব স্বরূপ পার মূল্য বিধান করিলে নৌকা শীঘ্রই তীরে গমন করিবে। এই স্থানে শ্রীরাধাগোবিন্দের এই প্রকার নিত্যই নূতন নূতন আনন্দোৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। পরিক্রমা কালে অগ্রে যাইবার সময় পাণিগাঁওয়ের দুই মাইল অগ্নি-কোণবর্ত্তী কল্যাণপুর হইয়া যাইতে হয়। লৌহবনের দুই মাইল ঈশানকোণে "রায়া" নামক স্থান ব্রজের সীমায় অন্তর্ভুক্ত।

শ্রীরাভেল ইহা লৌহবনের দুই মাইল দক্ষিণে যমুনার তীরবর্ত্তী গ্রাম। এই গ্রাম শ্রীকৃষ্ণ বল্লভা শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীরাধিকার জন্মস্থান। ভাদ্র শুক্লাষ্টমীর দ্বিপ্রহরে শ্রীরাধিকা শ্রীকীর্ত্তিদা মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইহেতু এই দিনে রাভেলে মহাসমারোহে মেলা বসিয়া থাকে।

গড়ুই—নামান্তর খেড়িয়া—রাভেলের চারি মাইল পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিশা, কুরুক্ষেত্র মিলনের পরে ব্রজরাজ শ্রীনন্দ নন্দীশ্বরে না যাইয়া এখানে শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ দহিতা নামক স্থানে দন্তবক্র অসুরকে বধ করিয়া এই স্থানে আগমন পূর্ব্বক পিতৃচরণে প্রণাম করিয়াছিলেন।

আয়রে—নামান্তর আলীপুর—ইহা গড়ুই গ্রামের অর্দ্ধ

মাইল উত্তরে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ দন্তবক্র বধ করিয়া আগমন করিলে সমস্ত ব্রজবাসী প্রেমে "আয়রে আয়রে" বলিয়া এই স্থানে মিলিত হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণপুর—নামান্তর গোপালপুর—ইহা আয়রে গ্রামের সওয়া মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। দীর্ঘ বিরহের পরে ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে পাইয়া অতুল আনন্দোৎসবে ব্রজকে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন।

বান্দী—কৃষ্ণপুরের দুই মাইল অগ্নিকোণে অবস্থিত। বান্দীকুণ্ড ও তাহার পূর্ব্বতীরে আনন্দী বান্দী দেবীদ্বয় দর্শনীয়।

শ্রীবলদেব—নামান্তর দাউজী—ইহা বান্দীর তিন মাইল দক্ষিণে কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব দিশা। এই গ্রাম শ্রীবলদেবের স্থান। মন্দিরে শ্রীরেবতী ও শ্রীবলদেবজীউ দর্শনীয়। মন্দিরের পশ্চিম ভাগে শ্রীসঙ্কর্ষণকুণ্ড নামান্তর ক্ষীরসাগর বিরাজমান। গ্রামের দক্ষিণে মতিকুণ্ড, উত্তরে রেণুক কুণ্ড ও রীঢ়া গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামকে বিক্রম বন বলিয়া উল্লেখ করেন।

হাতৌরা—বিক্রম বনের এক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। শ্রীনন্দ মহারাজের স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ।

শ্রীব্রহ্মাণ্ড ঘাট—হাতৌরার তিন মাইল পশ্চিম এবং শ্রীমহাবনের এক মাইল অগ্নিকোণে শ্রীযমুনার উত্তর তীরে অবস্থিত। এখানে শ্রীকৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণছলে আপন মুখগহ্বরে মাতা ব্রজেশ্বরীকে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করাইয়াছিলেন।

শ্রীচিন্তাহরণ ঘাট ইহা ব্রহ্মাণ্ড ঘাটের পূর্ব্বে অল্প

ব্যবধানে অবস্থিত। ঘাটের উপরিভাগে শ্রীচিন্তেশ্বর মহাদেব দর্শনীয়। এই ঘাটের বায়ুকোণে শ্রীমহাবন।

শ্রীগোকুল মহাবন

মহাবনঞ্চাষ্টমন্তু সদৈব হি মম প্রিয়ম্।
তস্মিন্ গত্বা তু মনুজ ইন্দ্রলোকে মহীয়তে॥

সহস্রদল বিশিষ্ট কমলাকৃতি চিন্তামণিময় শ্রীগোকুল নামক মহাবন শ্রীভগবানের নিত্যধাম। ইহা শ্রীনন্দ যশোদাদি নিত্য পরিকর বৃন্দের সহিত বাসযোগ্য মহান্তপুর। তাহার কর্ণিকায় তাঁহার স্থিতি। এই ধাম শ্রীবলদেবের অংশেই সদা আবির্ভূত এবং তাঁহার তন্মধ্যে নিবাসস্থল। এই অষ্টম বন শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়। মানব এই বনে আগমন করিলে ইন্দ্রলোকে পূজিত হয়। বর্ত্তমান ইহা প্রাচীন গোকুল বলিয়া প্রসিদ্ধ ইহা শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যলীলার বহুল স্মৃতি বিজৃম্ভিত। এখানকার বিশেষ বিশেষ দর্শনীয় স্থান যথা—

শ্রীনন্দমহারাজের দন্তধাবন টীলা, ইহার নিম্নদেশে শ্রীগোপিকাগণের হাবেলী, পুতনা মোক্ষণ স্থান। পুতনা এই স্থানে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কালকূট মিশ্রিত স্তন্য পান করাইবার চেষ্টা করিয়াছিল তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ যখন পুতনাকে সংহার করিবার জন্য দুগ্ধ পান করিতে করিতে পুতনার পঞ্চ প্রাণ আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল, তখন যন্ত্রনায় অস্থির হইয়া পুতনা "ছাড়্ ছাড়্" বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে ছদ্মবেশ

পরিত্যাগ করতঃ স্বীয় রাক্ষসীরূপ প্রকট করিয়া আকাশে লম্ফ প্রদান করিয়া মহাবনের পশ্চিম দিকস্থ রমণরেতী নামক স্থানে পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে। এই পুতনা বধ লীলা শ্রীকৃষ্ণ জন্মের সপ্তম দিবসে ঘটিয়াছিল।

শকট ভঞ্জন স্থান, এই লীলা শ্রীকৃষ্ণের তৃতীয় মাসে। তৃণাবর্ত্ত বধের স্থল, ইহা শকট ভঞ্জনের পরবর্ত্তী লীলা, ইহার অনতিদূরে শ্রীনন্দ মহারাজের সিংহপৌরী, শ্রীনন্দ ভবন দধি-মন্থন স্থল। শ্রীকৃষ্ণের ষষ্ঠী পূজাস্থল। আশী খাম্বা, তাহার পর শ্যামলার মন্দির, ইহা শ্রীকৃষ্ণের নাড়ী ছেদনের স্থল। নন্দকূপ, ইহার সন্নিকটে যমলার্জ্জুন ভঞ্জন স্থল ও উদুখল। ইহা শ্রীকৃষ্ণের দুই বৎসর তিন মাসের লীলা। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই শ্রীনন্দমহারাজ গোকুল মহাবন পরিত্যাগ করিয়া কিছুকাল সটীখরায় অবস্থান করিয়াছিলেন। এই স্থানে বৎসচারণ লীলা আরম্ভ করিয়া ক্রমে বৎসাসুর, বকাসুর ও অঘাসুর বধ করেন। অঘাসুর বধের দিন ব্রহ্মা গোপ শিশু ও গোবৎস হরণ করেন। তদনন্তর সম্বৎসর পরে ব্রহ্মসম্মোহনের পর দিবস হইতে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম পৌগণ্ড বয়সে পদার্পণ করিলে গোচারণলীলা আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে শ্রীবলরাম তালবনে ধেনুকাসুর বধ করেন।

অবশেষে একদিন পৌষ পূর্ণিমায় শ্রীবলরামের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে গৃহে ছিলেন। সেই দিন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনের কালীদহে কালীয়দমন লীলা করেন। তদনন্তর কার্ত্তিক শুক্লা

প্রতিপদ দিবসে দেবরাজ ইন্দ্রের পূজার পরিবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন পুজার নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন। তদনন্তর কার্ত্তিক শুক্লাতৃতীয়া হইতে নবমী পর্য্যন্ত ক্রমে সপ্তাহকাল ব্যাপী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ইন্দ্র প্রকোপ হইতে ব্রজবাসীগণকে রক্ষা করেন। এই ঘটনা শ্রীকৃষ্ণের সপ্তম বর্ষ বয়সে ঘটিয়াছিল। তৎপরবর্ত্তী একাদশী তিথিতে শ্রীব্রজরাজকে শ্রীনন্দঘাট হইতে বরুণের চর অপহরণ করায় দ্বাদশী তিথিতে প্রভাত সময়ে শ্রীবরুণালয় হইতে পিতাকে উদ্ধার করেন। ত্রয়োদশীতে গোবিন্দপদে অভিষিক্ত হন। তাহার পরবর্ত্তী কার্ত্তিক পূর্ণিমা দিবসে শ্রীকৃষ্ণ অক্রুর ঘাটে ব্রজবাসীগণকে স্নান করাইয়া বৈকুণ্ঠ ধাম দর্শন করাইয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে শ্রীনন্দ মহারাজ নন্দীশ্বরে এবং শ্রীবৃষভানু মহারাজ বর্ষাণে আসেন। এই সময় শ্রীবলরাম প্রলম্বাসুরকে ভাণ্ডীর বটের নিকট বধ করেন। এই দিনে শ্রীকৃষ্ণ মুঞ্জাটবীতে দাবানল ভক্ষণ লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ কাম্যবনে ব্যোমাসুরকে বধ করেন।

এদিকে কৈশোরে পদার্পণ করিলে ক্রমে ক্রমে নানা প্রকার বিচিত্র লীলা বিনোদে ব্রজবাসীগণকে বিমুগ্ধ করিতে লাগিলেন। অপর সুললিত বংশী বিদ্যায় নিপুণতা লাভ করিয়া তদ্দ্বারা ব্রজ মণ্ডলের স্থাবর জঙ্গমের ভাবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অবশেষে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের চমৎকারী শ্রীরাসলীলার শুভানুষ্ঠান দ্বারা গোপিকাগণের সহিত

অদ্ভুত কলাবিলাস প্রকাশ করিয়া বিশ্ব মোহন করিয়াছিলেন। অনন্তর অরিষ্টাসুর বধ, কেশি দৈত্য বধ, মথুরায় কংস বধ ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ কিছুকালের জন্য ব্রজের বাহিরে গমন করিয়াছিলেন। তদনন্তর দন্তবক্রকে বধ করিয়া পুনরায় ব্রজে আগমন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীগণকে অতুল আনন্দ সাগরে নিমগ্ন করিয়াছিলেন।

অপর যমলার্জ্জুন ভঞ্জন স্থানের পর শ্রীব্রজরাজের গোশালা। এখানে গর্গাচার্য্য আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের নামকরণ করিয়াছিলেন। তাহার পরে রমণরেতী। শ্রীবসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইয়া যমুনা পার হইয়া এখানে কিছু সময় উপবেশন করিয়াছিলেন এবং এই স্থানে মৃতা পুতনার বক্ষে শ্রীভগবান আনন্দে বিরাজ করিতেছিলেন। ইহার পর কয়লো ঘাট বিরাজমান। এই স্থানে শ্রীব্রজরাজের নির্দ্দেশক্রমে পুতনার মৃতদেহের সৎকার করা হইয়াছিল। এই ঘাট দিয়া শ্রীবসুদেব যখন পুত্রকোলে করিয়া পার হইতেছিল, তখন শ্রীযমুনা শ্রীকৃষ্ণচরণ স্পর্শ পাইবার লোভে জলরূপে বৃদ্ধি পাইতেছিলেন। শ্রীবসুদেব পুত্র রক্ষার জন্য ভীতমনা হইয়া "কোইলেও কোইলেও" বলিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন। সেই হেতু এই ঘাটের নাম কয়লো ঘাট এবং দক্ষিণ তীরবর্ত্তী গ্রামের নাম কয়লো বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। কয়লো ঘাটের দুইতীরে উথলেশ্বর মহাদেব ও পাড়েশ্বর মহাদেব বিরাজমান আছেন।

শ্রীগোকুল—ইহা মহাবনের দেড় মাইল উত্তর পশ্চিম ভাগে অবস্থিত। শ্রীবল্লভাচার্য্যের সন্তানগণ এই গ্রামে নিবাস করেন। এখানে গোপাল ঘাট, শ্রীবল্লভ ঘাট, শ্রীগোকুল নাথজীর বাগিচা, বাজনটীলা, সিংহপৌরী, যশোদা ঘাট, শ্রীবিঠ্ঠল নাথজীর মন্দির, শ্রীমদন মোহন মন্দির, শ্রীমাধব রায়ের মন্দির, ব্রহ্ম ছোক্‌রা বৃক্ষ, শ্রীগোবিন্দ ঘাট, শ্রীঠাকুরাণী ঘাট, শ্রীগোকুল চন্দ্রমার মন্দির, শ্রীমথুরা নাথজীর মন্দির, শ্রীনন্দ মহারাজের গাড়ী রাখিবার স্থান প্রভৃতি দর্শনীয়। এই কয়লো ঘাটের যমুনা পার হইলে বাদাই গ্রাম।

বাদাই—নামান্তর বাদ গ্রাম—ইহা কয়লো ঘাটের অনুমান দুই মাইল নৈঋতকোণে অবস্থিত। এই গ্রাম শ্রীপাদ হরিবংশের জন্মস্থান। অপর কয়লা ঘাটের দেড় মাইল বায়ু-কোণে নারাঙ্গাবাদ গ্রাম, ইহার পাঁচ মাইল উত্তরে মথুরা।

শ্রীমথুরা।

অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী।
দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে॥

মধুনামক দৈত্য কঠোর তপস্যা করিয়া মহাদেবের নিকট হইতে অদ্ভুত শক্তিযুক্ত এক শূল লাভ করিয়াছিলেন। সেই শূলের প্রভাব ছিল যতদিন শূল তাহার পুত্রের নিকট থাকিবে তত-দিন তাহাকে কেহই বধ করিতে পারিবে না। মহাদেবের বাক্য অন্যথা হইতে পারে না, যথাকালে তাঁহার স্ত্রী কুম্ভনসী এক

পুত্র প্রসব করেন, পুত্রের নাম লবণ, কিন্তু দৈবের এমনই পরিহাস, পুত্র যতই বড় হইতে লাগিল ততই সে অত্যন্ত দুর্বিনীত ও অবাধ্য হইয়া উঠিল। অবশেষে মধুদৈত্য পুত্রের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাকে শূল অর্পণ করিয়া বরুণালয়ে চলিয়া যায়। দৌরাত্ম্য লবণ দৈত্য শূল লাভ করিয়া তপবনবাসী ঋষি গণের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল, তাঁহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া ভগবান শ্রীরাম চন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের দুঃখের কথা নিবেদন করিলেন, প্রভু শ্রীরামচন্দ্র লবণ দৈত্যকে বিনাশের নিমিত্ত শত্রুঘ্নকে পাঠাইয়া দেন। শত্রুঘ্ন ও লবণ দৈত্যের ভীষণ যুদ্ধ হয়, অবশেষে শত্রুঘ্ন লবণ দৈত্যকে বধ করিলেন। তৎপর শত্রুঘ্ন সেনাদি আনাইয়া পৌরজনপদ স্থাপন করিলেন। শত্রুঘ্নের বংশ লোপ হইলে মথুরায় শূরসেন গণের আধিপত্য হয়। মথুরায় কংস রাজধানী করিয়া আধিপত্য বিস্তার করিলে যদুকুল তিলক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কংসকে বিনাশ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তি কালে যুধিষ্ঠির মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র শ্রীবজ্রনাভকে মথুরায় রাজ্যাভিষেক করিয়া মহা প্রস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীবজ্রনাভ মথুরা মণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বহু লীলাস্থলী ও শ্রীভগবন্মূর্ত্তি প্রকট করিয়াছিলেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই মধুপুরী শ্রীবৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও গরীয়সী এবং ধন্যা। যেহেতু এই শ্রীমধুপুরীতে একদিন বাস করিলেই শ্রীকৃষ্ণে ভক্তির উদয় হয়। বিধাতার সকল প্রকার

সৃষ্টি হইতেও শ্রীমথুরা সৃষ্টি একটু বিচিত্র প্রকারের, যেহেতু মথুরার গুণরাজি বর্ণন করিতে শ্রীভগবানও সমর্থ নহেন। এই পুরী শ্রীবিষ্ণুচক্রের উপরিভাগে সংস্থিত এবং পদ্মাকৃতি বিশিষ্ট ও ত্রিকাল সত্য। ইহা বিংশতি যোজন বিস্তীর্ণ। ইহার যে কোন স্থানে স্নান করিলেই মানবগণ সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। পদ্মাকৃতি মথুরার কর্ণিকায় শ্রীকেশবদেব জীউ, পশ্চিম পত্রে শ্রীহরিদেবজীউ, উত্তর পত্রে শ্রীগোবিন্দদেবজীউ, পূর্ব্বপত্রে শ্রীবিশ্রান্তিদেব এবং দক্ষিণ পত্রে শ্রীবরাহদেব জীউ বিরাজ করিতেছেন। সূর্য্যের উদয় কালে শ্রীভগবৎ জ্যোতি শ্রীবিশ্রান্তি তীর্থে, মধ্যাহ্ন কালে শ্রীদীর্ঘ বিষ্ণুতে এবং দিবসের চতুর্থভাগে শ্রীকেশবদেবে অবস্থিত। মথুরায় কেহ একবার মাত্র শ্রীদীর্ঘ বিষ্ণু, শ্রীপদ্মনাভ এবং শ্রীস্বয়ম্ভুদেবকে দর্শন করে তাহার সমস্ত অভীষ্ট অচিরেই সিদ্ধ হয় তথা শ্রীএকোনংশা দেবী, শ্রীযশোদা দেবী, শ্রীদেবকী দেবী ও শ্রীমহাবিদ্যেশ্বরীকে দর্শন করিলে ব্রহ্মহত্যা পাতক হইতে উদ্ধার লাভ করে এবং ক্ষেত্রপাল শ্রীভূতেশ্বর মহাদেব দর্শনে মথুরা ক্ষেত্র দর্শনের ফল লাভ হইয়া থাকে। এই মথুরা পুরীতে দর্শনীয় শ্রীবিগ্রহ সহস্র সহস্র বিরাজমান, তথাপি মধুপুরী মধ্যস্থ শ্রীকেশব দেব, শ্রীপদ্মনাভ, শ্রীদীর্ঘ বিষ্ণু, শ্রীগতশ্রমদেব, শ্রীস্বয়ম্ভু মহাদেব ও শ্রীবরাহদেব ইহারাই মথুরার প্রসিদ্ধ দেবতা। শ্রীবরাহদেব সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস -- কপিলদেব নামক কোন ব্রাহ্মণ হইতে ইন্দ্র শ্রীবরাহদেবকে মর্ত্ত্যলোক হইতে দেবলোকে লইয়া

যান। রাবণ ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া শ্রীবরাহদেবকে লঙ্কায় আনয়ন করেন। তদনন্তর শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে জয় করিয়া অযোধ্যাপুরীতে আনয়ন করেন। শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে শত্রুঘ্ন দেব লবণ অসুরকে বধ করিবার জন্য মথুরায় আগমন করেন এবং ঐ অসুরকে বধ করিয়া মথুরাপুরী স্থাপন করতঃ বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণের বাসের ব্যবস্থা করিয়া অযোধ্যায় যাইয়া অগ্রজ শ্রীরামের চরণে সমস্ত বর্ণন করেন তাহাতে শ্রীরামচন্দ্র শত্রুঘ্নের প্রতি প্রসন্ন হইয়া শ্রীবরাহদেব অর্পণ করেন। তদনুসারে শত্রুঘ্নদেব শ্রীবরাহদেবকে মথুরায় আনয়ন করিয়া সেবা স্থাপন করেন। সেই অবধি শ্রীবরাহদেব মথুরায় বিরাজ করিতেছেন। এখানকার তীর্থও গণনাতীত, শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে পৃথিবীর ধূলিকণা গণনা করা যায় কিন্তু মথুরার তীর্থ সকল গণনা করা যায় না। তথাপি তন্মধ্যে নিম্নোক্ত ২৪টি তীর্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ, ইহারা মহাতীর্থ বলিয়া বিখ্যাত।

শ্রীঅবিমুক্ত তীর্থ—এই তীর্থে স্নান করিলে মুক্তিলাভ হয়। ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আর এইস্থানে কেহ প্রাণ ত্যাগ করিলে বিষ্ণুলোকে গমন করেন।

বিশ্রান্তি তীর্থ—এই স্থানে স্নান করিলে বিষ্ণুলোকে পূজিত হয়।

গুহ্য তীর্থ—এই তীর্থের স্নানে সংসার নাশ হয় ও বিষ্ণুলোকে পূজিত হয়।

প্রয়াগ তীর্থ—এই তীর্থ দেবতাগণেরও দুর্লভ, ইহার

স্নানে অগ্নিযজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং এখানে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিলে পুনঃ জন্মের সম্ভাবনা নাই।

কন্‌খল তীর্থ— এই তীর্থে স্নান করিয়া মানবগণ স্বর্গে গমন করিয়া আনন্দিত হয়।

তিন্দুক তীর্থ—নামান্তর বাঙালী ঘাট— পরম গোপনীয় এই তীর্থে স্নান করিলে বিষ্ণুলোকে পূজিত হয়।

সূর্য্য তীর্থ—নামান্তর বড় বালা- বিরোচনের পুত্র বলিমহারাজ এখানে শ্রীসূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন ইহাতে স্নান করিলে মানবের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। রবিবার সংক্রান্তি ও গ্রহণের স্নানে বিশেষ মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে।

বটস্বামী তীর্থ—যে ব্যক্তি রবিবারে ভক্তি পূর্ব্বক এই তীর্থের সেবা করে, সেই ব্যক্তি আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য ও অন্তে উত্তমা গতি লাভ করে।

ধ্রুবতীর্থ—এই তীর্থের স্নানে ধ্রুবলোকে পূজিত হইয়া থাকে এবং পিণ্ড দান করিলে গয়ার শতগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে এবং আশ্বিন মাসের কৃষ্ণ পক্ষে স্নান ও তর্পণ বিশেষ প্রশস্ত শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

ঋষিতীর্থ—ইহা ধ্রুব তীর্থের দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে স্নান করিলে বিষ্ণুলোকে পূজিত হয় এবং শ্রীহরিতে পরমা ভক্তির উদয় হয়।

মোক্ষ তীর্থ—ইহা ঋষি তীর্থের দক্ষিণ, এই তীর্থে

স্নান করিলে মানুষ মোক্ষ লাভ করে।

কোটিতীর্থ – দেব দুর্লভ এই তীর্থের স্নানে ও দানে মানব আমার লোকে পূজিত হয়। এই ঘাটে বসিয়া রাবণ তপস্যা করিয়াছিলেন। জৈষ্ঠ একাদশীর স্নানে বিশেষ ফলপ্রদ। এখানে রাবণ কুটী প্রসিদ্ধ।

বোধতীর্থ – এই তীর্থে পিণ্ড দান করিলে পিতৃলোকে গমন করে। এই বারটি তীর্থ দেবতাগণের দুর্লভ। ইহার স্মরণ মাত্রই মানব সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। এই দ্বাদশতীর্থ বা ঘাট বিশ্রাম ঘাটের উত্তরে অবস্থিত।

নরতীর্থ – এই তীর্থ হইতে উৎকৃষ্ট তীর্থ কখনও হয় নাই, হইবেও না।

সংযমনতীর্থ – নামান্তর স্বামীঘাট কিম্বা বসুদেবঘাট— কংসের কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া শ্রীবসুদেব মহাশয় এই ঘাটে স্নান করিয়াছিলেন এই তীর্থের স্নানে মানব বিষ্ণু-লোকে গমন করে।

ধারাপতন তীর্থ—ইহার স্নানে মানব স্বর্গলোকে গমন করে।

নাগতীর্থ—এই তীর্থের স্নানে মানব স্বর্গে গমন করে এবং এখানে দেহ ত্যাগ করিলে বিষ্ণুলোকে গমন করে।

ঘণ্টাভরণক তীর্থ – সর্ব্বপাতক নাশন এই তীর্থের স্নানে মানব সূর্য্যলেকে পূজিত হয়।

ব্রহ্মলোক তীর্থ সংযতচিত্ত মিতাহারী ব্যক্তি এই

তীর্থে স্নান এবং জলপান করিলে ব্রহ্মার আজ্ঞা লাভে বিষ্ণু লোকে গমন করে।

সোম তীর্থ—নামান্তর গোঘাট—এই ঘাটের উপর সোমেশ্বর মহাদেব দর্শনীয়। স্ব স্ব কর্ত্তব্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই জলে অভিষেক করিলে সোমলোকে আনন্দিত হয়।

সরস্বতীপতন তীর্থ সর্ব্বপাতক নাশন এই তীর্থের স্নানে শূদ্রাদিও সন্ন্যাসীর ন্যায় পূজিত হয়।

চক্র তীর্থ—যে ব্যক্তি ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া ইহাতে স্নান করে সেইব্যক্তি স্নানমাত্রই ব্রহ্মহত্যা পাতক হইতে মুক্তহয়।

দশাশ্বমেধ তীর্থ—ইহাতে স্নান করিলে সংযত ব্যক্তি স্বর্গ লাভ করে।

বিঘ্নরাজ তীর্থ—এই তীর্থে স্নান করিলে বিঘ্নরাজ আর কখনও পীড়া দেয় না। এই ঘাটে শ্রীগণেশজীউ দর্শনীয়।

কোটি তীর্থ—ইহাতে স্নান করিলে কোটি গোদানের ফল লাভ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি মহাতীর্থ বিরাজ করিতেছেন। যথা—অসিকুণ্ড তীর্থ, বৈকুণ্ঠতীর্থ প্রভৃতি।

কৃষ্ণগঙ্গা তীর্থ—ইহাদের সকলের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গার মহিমা বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মানব পঞ্চতীর্থে স্নান করিয়া যে ফল লাভ করে কৃষ্ণগঙ্গা তদপেক্ষা দশগুণ ফল দান করেন। স্নানান্তে ঘাটের উপর শ্রীকালিন্দীশ্বর দর্শনীয়।

শ্রীবৃন্দাবনে যেমন পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা প্রসিদ্ধ, তদ্রূপ মথুরার পরিক্রমাও প্রসিদ্ধ, পরিক্রমা কালে পূর্ব্বোক্ত তীর্থসমূহ

প্রায়ই দর্শন হইয়া থাকে। পরিক্রমার পর্য্যায়ানুসারে দর্শনীয় স্থান বর্ণিত হইতেছেন—

শ্রীবিশ্রামতীর্থ বা ঘাট হইতে শ্রীমথুরা পরিক্রমার প্রারম্ভ—শ্রীবিশ্রাম ঘাট, পপুলেশ্বর মহাদেব, বটুক ভৈরব, শ্রীবেণীমাধব, শ্রীরামেশ্বর মহাদেব, শ্রীবলভদ্র ও শ্রীমদনমোহনজীউ, গলির ভিতর শ্রীরামজীউ ও শ্রীগোপালজীউ, তিন্দুকতীর্থ, সূর্য্যতীর্থ, এখানকার দর্শনীয়।

ধ্রুবতীর্থ—কথিত আছে মহারাজ উত্তানপাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র ধ্রুব পাঁচ বৎসর বয়সে বিমাতার বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া স্বীয় জননী সুনীতি দেবীর নিকট ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় অবগত হইয়া পিতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ রাজ্য লাভের অভিলাষে তপস্যায় বহির্গত হন। ধ্রুব মহাশয় কোথায় পদ্মপলাশ লোচন শ্রীহরি এইনামে ব্যাকুলভাবে শ্রীহরিকে ডাকিতে ডাকিতেতন্ময়তা লাভ করিলে শ্রীহরির প্রেরণায় শ্রীনারদ মহাশয় প্রথমে উত্তান পাদের রাজধানীতে, পরে হিংস্রজন্তু সমাকীর্ণ জঙ্গলে ধ্রুবের সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীনারদ ধ্রুবকে অনেক পরীক্ষা করিয়া তাহার ভজন নিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়া দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র প্রদান করেন। ধ্রুব নারদের উপদেশানুসারে মধুবনে কঠোর তপস্যা করিয়া শ্রীনারায়ণকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন ধ্রুব মহাশয় যমুনার যেঘাটে স্নান করিতেন তাহা প্রসিদ্ধ ২৪ ঘাটের অন্যতম এবং পুরাণাদি শাস্ত্র ধ্রুবঘাটের প্রভূত মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন, টীলার উপরে শ্রীধ্রুবজী এবং ঐ মন্দিরের পার্শ্বে

অটল গোপাল। ঋষি তীর্থ টীলার উপরে সপ্তর্ষি, বলী টীলায় শ্রীবলিমহারাজ ও বামনদেব। কলিযুগ টীলায় মহাবীর, রঙ্গ-ভূমিতে চানুর মুষ্টিক ও কুবলয় পীড় বধের প্রতি মূর্ত্তি রঙ্গেশ্বর মহাদেব, তাহার উত্তরে কংসটীলা, কংস আখরা ও কংসবধ স্থল, উগ্রসেন মহারাজ, শিবতাল, কঙ্কালীদেবী, শ্রীজগন্নাথদেব, উদ্ধবজী ও গোপিকাস্থল, বলভদ্র কুণ্ড ও শ্রীবলদেবজীউ দর্শনীয়, শ্রীনৃ-সিংহদেব, শ্রীবদরীনাথ, ভূতেশ্বর মহাদেব ও পাতালদেবী, পুতরা কুণ্ড, শ্রীকেশবদেবজীউ, জন্মভূমি, সম্মুখে মালপুরা অর্থাৎ কারা-গারে শ্রীবসুদেব ও দেবকী দেবীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত মল্লগণের উপবেশন স্থল। মহাবিদ্যা দেবী, মহাবিদ্যা কুণ্ড, সরস্বতী কুণ্ড, ইহা অম্বিকা বনে অবস্থিত। একদা শ্রীনন্দমহা-রাজ শ্রীগোকর্ণেশ্বর মহাদেব দর্শন করিয়া রাত্রিতে কুণ্ডতীরে শয়ন করিলে সুদর্শন নামে কোন বিদ্যাধর শাপ ভ্রষ্ট হইয়া সর্প-দেহ প্রাপ্ত হইাছিল সেইসর্প শ্রীব্রজরাজের চরণ গ্রাস করিতে আরম্ভ করিলে শ্রীকৃষ্ণ আগমন পূর্ব্বক তাহার উপর স্বীয় চরণ অর্পণ করিয়া সর্প যোনি হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। এই হেতু এই কুণ্ডকে সুদর্শন মোক্ষণ কুণ্ডও বলা হয়। অনন্তর সরস্বতীদেবী, চামুণ্ডাদেবী, রজকবধটীলা, গোকর্ণ তীর্থ, গোকর্ণ মহাদেব, অম্বরীষ টীলা, চক্রতীর্থ, কৃষ্ণগঙ্গা, সোম তীর্থ, ঘণ্টা-ভরণতীর্থ ধারা পত্তনতীর্থ, বৈকুণ্ঠতীর্থ, বসুদেব ঘাট, বরাহ ক্ষেত্র, কর্কটিকা নাথ, মহাবীর, গণেশ, শ্রীনৃসিংহ মণি, কর্ণিকা, অবিমুক্ত তীর্থ, এবং বিশ্রাম ঘাট বা বিশ্রামতীর্থ। শ্রীমথুরা

দর্শনের পর শ্রীবৃন্দাবনে গমনের পথে অক্রুর তীর্থ।

শ্রীঅক্রুর তীর্থ—ইহা মথুরার চারি মাইল উত্তরে অবস্থিত। গ্রামের পূর্ব্বদিকস্থ ঘাটের নাম অক্রুর ঘাট। কথিত আছে - শ্রীঅক্রুর মহাশয় কংসের আদেশে শ্রীনন্দালয়ে গমন পূর্ব্বক শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া প্রেমে পুলকিত হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিলে পর অক্রুর কংসের কুমন্ত্রণা প্রকাশ করিলে শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্য বদনে মহারাজ নন্দকে কংসের আদেশ জ্ঞাত করাইলেন। শ্রীনন্দ মহারাজ বিবিধ উপঢৌকন ও গোপবৃন্দ সহ মথুরায় কংস যজ্ঞে গমন করিতে অনুমতি দিলেন। পর দিবস প্রত্যূষে অক্রুর শ্রীরামকৃষ্ণকে রথে আরোহণ করাইয়া ব্রজবাসী গণকে শোক সাগরে নিমজ্জিত করতঃ রথ চালনা পুর্ব্বক এই স্থানে আসিয়া রথ স্থাপন করিলেন। তদনন্তর অক্রুর সন্ধ্যা বন্ধনাদি করিবার নিমিত্ত শ্রীরাম কৃষ্ণের অনুমতি লইয়া শ্রীযমুনার জলে নিমগ্ন হইয়া জপ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন শ্রীরামকৃষ্ণ জলের মধ্যে বসিয়া আছেন। তখন অক্রুর ভাবিলেন—এ কি শ্রীরামকৃষ্ণ তো রথোপবিষ্ট, তাঁহারা এখানে আসিলেন কিরূপে? তখন শীঘ্র রথ সন্নিধানে গমন করিয়া দেখিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ রথে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। তখন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পুনরায় জলে মগ্ন হইয়াদেখিলেন অনন্তদেবের ক্রোড়ে ভুবনমোহন চতুর্ভুজ নারায়ণ স্বরূপের অনুচরবৃন্দ আনত মস্তকে তাঁহার স্তব করিতেছেন।

ভক্তপ্রবর অক্রুর মহাশয় এইরূপ দর্শন করিয়া প্রেমভরে বহুশঃ স্তুতি করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীগণকেও এই ঘাটে স্নান করাইয়া গোলোকধাম দর্শন করাইয়াছিলেন। এই ঘাটের অপর নাম ব্রহ্মহ্রদ। বরুণালয় হইতে শ্রীব্রজরাজকে আনয়নের পর শ্রীকৃষ্ণ এই লীলার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবনে আগমন করিয়া যে কতদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ অপরাহ্ণ সময়ে এই অক্রুর গ্রামে আসিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন, ইহার কিঞ্চিৎ ব্যবধানে ভাতরোল অবস্থিত।

শ্রীভোজনস্থলী—নামান্তর ভাতরোল—ইহা অক্রুর ঘাটের সামান্য দক্ষিণ, বর্ত্তমান বিরলা মন্দিরের সন্নিকটে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজের সহিত গোচারণ করিতে আসিয়া এই স্থানে অন্ন ভিক্ষা ছলে যাজ্ঞিক পত্নীগণকে কৃপা করিয়াছিলেন! একদিন কার্ত্তিক পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম সখাগণ সমভিব্যাহারে গোচারণ করিতে করিতে এই স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন,তখন সখাগণ বলিলেন আমরা ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছি শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন মুনিগণ মথুরায় যজ্ঞ করিতেছেন, তোমরা তথায় গমন পূর্ব্বক আমাদের নাম করিয়া তাহাদের নিকট অন্ন প্রার্থনা করিবে। শ্রীকৃষ্ণের কথায় রাখালগণ যজ্ঞ স্থানে উপস্থিত হইয়া অন্ন প্রার্থনা করিলে মুনিগণ হ্যাঁ না কিছুই উত্তর করিলেন না। তখন তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে সমস্ত জ্ঞাপন করিলে শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে পুনরায়

মুনিদিগের পত্নীগণের নিকট অন্ন যাচ্ঞা করিতে পাঠাইলেন। মুনি পত্নীগণের সমীপে উপস্থিত হইয়া আগমণের কারণ বিজ্ঞাপন করিলেন, মুনিপত্নীগণ এতদিন যাহা প্রার্থনা করিয়া আসিতেছেন আজ তাহাদের সেই মনোরথ সিদ্ধ হইল বিবেচনায় প্রফুল্ল চিত্তে চব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় প্রভৃতি দ্রব্যাতে পাত্র সাজাইয়া দ্রুতবেগে শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হইয়া সমস্ত ভোজ্য দ্রব্য অর্পণ করিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমানন্দে সখাগণ সহ ভোজন করিলেন। এই হেতু এই স্থানের নাম ভোজনস্থলী বা ভাতরোল বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার অনতিদূরে পঞ্চক্রোশ ব্যাপী দ্বাদশবন সমন্বিত শ্রীবৃন্দাবন অবস্থিত।

বৃন্দাবনং দ্বাদশমং বৃন্দয়া পরিরক্ষিতম্।
মম চৈব প্রিয়ং ভূমে! সর্ব্বপাতকনাশনম্॥

শ্রীবৃন্দাবন—হে বসুধে! বৃন্দাবন দ্বাদশবন, ইহা বৃন্দাদেবী কর্ত্তৃক সুরক্ষিত, এই বন আমারও অতি প্রিয় এবং সর্ব্বপাতক নাশন। আমি এইস্থানে নিত্য গোপীও গোপগণ সহক্রীড়া করিয়া থাকি। ইহা অক্রুর তীর্থের দেড় মাইল উত্তরে অবস্থিত। শ্রীবৃন্দাবনের পঞ্চক্রোশি মধ্যে দ্বাদশটি বন বিরাজমান। পর্য্যায় অনুসারে সেই বনসমূহের নাম বর্ণিত হইতেছে—

শ্রীঅটলবন—শ্রীবৃন্দাবনের দক্ষিণে অবস্থিত। এই বনে শ্রীঅটলতীর্থ ও শ্রীঅটল বিহারী বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণ ভাতরোল হইতে ভোজন করিয়া এখানে আগমন করিলে পর সখাগণ ভোজন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীকৃষ্ণ আহ্লাদের

সহিত বলিয়াছিলেন অটল হইয়াছে। সেই অবধি এই বনের নাম অটল বন বলিয়া বিখ্যাত। এই বনের পূর্ব্বে শ্রীবলদেব-জীউর দর্শনীয় শ্রীমূর্ত্তি বিরাজমান।

শ্রীকেবারিবন—ইহা অটল বনের বায়ুকোণে অবস্থিত। এখানে দাবানল কুণ্ড বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণ যেদিন কালীয় দমন করেন, সেই দিবস রাত্রে সমস্ত ব্রজবাসী কালীয়হ্রদের অর্দ্ধ মাইল দূরবর্ত্তী এই মনোরম স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন। মধ্য রাত্রিতে দুষ্ট কংসের চরগণ সুযোগ পাইয়া এক সঙ্গে চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রয়োগ করিয়াছিল। সেই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উদ্দীপ্ত হইতে আরম্ভ করিলে প্রাণ রক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীগণকে দাবানল হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আশ্বাস প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে চক্ষু মুদ্রিত করিতে অনুরোধ করিলেন এবং স্বীয় অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তৎক্ষণাৎ অনল নির্ব্বাপণ করিলেন। ব্রজবাসীগণ চক্ষু উন্মীলন করিয়া অগ্নি দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন—"কে নিবারি"? সেই অবধি এই বনের নাম কেবারিবন এবং অগ্নি নির্ব্বাপণ স্থানের নাম দাবানলকুণ্ড, এই কুণ্ডের বায়ুকোণে শ্রীমতীঝিল।

শ্রীবিহারবন—কেবারি বনের নৈঋত কোণে এইবন অবস্থিত। এখানে শ্রীরাধাকূপ বিরাজমান। পরিক্রমা যাত্রীকগণ এই কূপের নিকট যাইয়া উচ্চধ্বনিতে রাধে রাধে, কিম্বা

শ্রীরাধেশ্যাম এই নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

শ্রীগোচারণ বন - বিহার বনের পশ্চিম ভাগে প্রাচীন যমুনাতীরে এই বন অবস্থিত। এখানে শ্রীশ্রীবরাহদেব বিরাজমান। এই স্থানে শ্রীগৌতম মুনির আশ্রম বিরাজিত। এই স্থানকে বরাহ ঘাটও বলা হয়!

শ্রীকালীয়দমন বন—ইহা গোচারণ বনের উত্তরে অবস্থিত। এখানে প্রাচীন কদম্ব বৃক্ষ প্রাচীন যমুনা তীরে বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণ কালীয় দমন অভিপ্রায়ে এই বৃক্ষের শাখা হইতে ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন। সেই অবধি এই বৃক্ষ "কালিকদম্ব" বলিয়া পরিচিত। এই বৃক্ষের কিছু উত্তরে শ্রীকালীয় মর্দ্দণের মন্দির বিরাজমান, ইহার অনতিদূরে শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীর সমাজ বিরাজমান।

শ্রীগোপাল বন ইহা কালীয়দমন বনের উত্তরে অবস্থিত। এখানে শ্রীনন্দ যশোদার মূর্ত্তি বিরাজমান। কালীয়দমনের অব্যবহিত পরে শ্রীব্রজরাজ শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল কামনায় ব্রাহ্মণ গণকে বহু গাভী দান করিয়াছিলেন। এই স্থানকে গোপাল ঘাটও বলা হয়।

শ্রীনিকুঞ্জ বন - নামান্তর সেবাকুঞ্জ—ইহা গোপাল বনের ঈশানকোণে অবস্থিত। এই কুঞ্জে শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যই নৈশ বিহার সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই বনে শ্রীললিতা কুণ্ড শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন, একদা শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ সখীগণ সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিলেন, সেই কালে প্রধানা সখী শ্রীললিতা

তৃষ্ণার্ত্তা হইয়া বলিলেন হে শ্যামসুন্দর! আমি পিপাসায় কাতর, আমাকে জল পান করাও, তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন— ললিতে! অদূরেই শ্রীযমুনা, তাহার স্বচ্ছ শীতল জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ কর, তখন ললিতা বলিলেন আমি যমুনায় যাইতে পারিব না, তুমি এখানে আমাকে জল পান করাও, তৎশ্রবণে লীলাময় শ্রীভগবান্ বংশীদ্বারা ভূপৃষ্ঠে আঘাত করিবামাত্র ভূগর্ভ হইতে গঙ্গাধারা উত্থিত হইলে শ্রীললিতা ও অন্যান্য সখীগণ বিবিধ কৌতুকের সহিত জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন। অপর একটি কিংবদন্তী সবিশেষ প্রচারিত আছে— যে এই বনে কেহ রাত্রি যাপন করিলে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। এইহেতু সর্ব্বপ্রকার দর্শনার্থী সন্ধ্যা আগমনেই দর্শন করিয়া বনের বাহিরে আগমন করেন, অপর ইহার পার্শ্বে শ্রীঅন্নপূর্ণাদেবীর এবং পূর্ব্বে শ্রীপৌর্ণমাসী দেবীর মন্দির অবস্থিত। এই বনের পশ্চিমে শ্রীশ্রীসীতানাথ প্রভুর মন্দির বিরাজমান। শ্রীঅদ্বৈত সন্তান কর্ত্তৃক শ্রীসীতানাথ প্রভু ও শ্রীমদনগোপাল দেবের সেবা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে

শ্রীনিধুবন— **নিকুঞ্জ** বনের উত্তরে এই বন বিরাজমান। শ্রীরাধারমণ মন্দির ও সাহাজী মন্দির ইহার সন্নিকটে। এই বনে শ্রীবিশাখাকুণ্ড অবস্থিত। শ্রীবঙ্ক বিহারীজীউ এইবন হইতে প্রকট হইয়াছিলেন, এই স্থানটি গোলাকারে প্রস্তর খচিত হইয়া সকলের দৃশ্য হইতেছেন, এই বনে প্রবেশ কালে সম্মুখের দক্ষিণ ভাগে শ্রীহরিদাস স্বামীর ভজন কূটী ও সমাধিস্থল দর্শন

হইয়া থাকে। শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু এই বনে শ্রীমতীবৃষভানু নন্দিনীর শ্রীচরণের নুপুর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু প্রত্যহ মার্জ্জনী সেবা করিতেন, একদিন তিনি মার্জ্জনী বা ঝাড়ু করিতে করিতে ভানু নন্দিনীর শ্রীচরণের নুপুর প্রাপ্ত হইলে তিনি সেই নুপুর মস্তকে ধারণ করিলেন তাহাতে তাঁহার ললাটে নুপুরের চিহ্ন হইয়াছিল, সেই অবধি শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য প্রশিষ্যাদিতে শ্রীরাধিকার নুপুর তিলক প্রবর্ত্তিত হইল।

শ্রীরাধাবাগ—ইহা বৃন্দাবনের ঈশানকোণে শ্রীযমুনা-তীরে অবস্থিত। এই বাগকে রাধাবাগ ঘাটও বলা হয়। ইহার পূর্ব্ব দিকে শ্রীযমুনার দুই ধারার মধ্যবর্ত্তী মনোরম বালুকা পূর্ণ স্থান শ্রীযমুনা পুলিন অবস্থিত। ধীর সমীর ও রাধাবাগের মধ্যবর্ত্তী স্থলকে শ্রীরাস পুলিন বলা হয় এখানে গোপকূয়া বিরাজমান। ইহার অনতিদূরে শ্রীকাত্যায়নী মন্দির দর্শনীয়।

শ্রীঝুলন বন—শ্রীরাধাবাগের দক্ষিণ ভাগে এই বন অবস্থিত এখানে রাধা কৃষ্ণের ঝুলন লীলা হইয়া থাকে।

শ্রীগহ্বর বন—ঝুলন বনের দক্ষিণে অবস্থিত। পাণি ঘাট ইহার অতি সন্নিকটে।

শ্রীপপড় বন—ইহা গহ্বর বনের দক্ষিণে অবস্থিত। এই স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে আদি বদ্রীনাথ দর্শন করাইয়াছিলেন। অপর শ্রীবৃন্দাবনের পূর্ব্বভাগে শ্রীগোবিন্দ কুণ্ড অবস্থিত। শ্রীরাধাগোবিন্দের বিহারস্থল।

শ্রীবৃন্দাবনে পঞ্চক্রোশির মধ্যে প্রসিদ্ধ যে আঠারটি ঘাট, পরিক্রমার পর্য্যায়ক্রমে তাঁহাদের নাম বর্ণিত হইতেছে যথা—

শ্রীবরাহ ঘাট—এই ঘাট শ্রীবৃন্দাবনের পশ্চিম দক্ষিণ কোণে প্রাচীন যমুনা তীরে অবস্থিত। সন্নিকটে শ্রীবরাহদেব দর্শনীয়। এখানে শ্রীগৌতম মুনির আশ্রম দর্শনীয়।

শ্রীকালিয়দমন ঘাট বা কালিদহ—ইহা বরাহ ঘাটের প্রায় অর্দ্ধ মাইল উত্তরে প্রাচীন যমুনা তীরে অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের আশ্চর্য্য বিলাস বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ কালিন্দীতীরস্থ কেলিকদম্বে আরোহণ করিয়া জলে লম্ফ প্রদান করতঃ কালিনাগকে দমন করিয়াছিলেন। এক সময় গরুড়ের ভয়ে শতফণাবিশিষ্ট অতি বলবান কালিনাগ পরিজন সমভিব্যাহারে বহুদিন ইহতে এখানে বাস করিতেছিল। তাহার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস অগ্নিতুল্য, ফলে তাহার বায়ুস্পর্শে বৃক্ষাদি দগ্ধ হইয়া যাইত এবং হ্রদের উপর দিয়া কোন পক্ষী উড়িয়া গেলে সেও দগ্ধ হইয়া যাইত একদিন শ্রীকৃষ্ণ সখাগণকে সঙ্গে লইয়া নন্দীশ্বর হইতে গোচারণ রঙ্গে বৃন্দাবনে আসেন। দৈবে সেদিন কোন কারণে শ্রীবলদেব সঙ্গে আসেন নাই। গোচারণ করিতে করিতে সখাগণ পিপাসার্ত্ত হইয়া এই হ্রদের তীরে আসিয়া জল স্পর্শ করিবার সঙ্গেই ধেনু সহ সকলে প্রাণ ত্যাগ করিল। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড নায়ক শ্রীকৃষ্ণ ইহা অবগত হইয়া নেত্রামৃতে জীবিত করিলে শীঘ্রই তীরে আসিল এবং একে অন্যকে নিরীক্ষণঃ করতঃ অত্যন্ত বিস্মিত হইল এবং ইহা

শ্রীগোবিন্দের করুণা অনুভব করিলেন। স্বয়ং ভগবান্ দেখিলেন অতি খল কালিনাগ গরুড়ের ভয়ে রমণক দ্বীপ ত্যাগ করিয়া এই হ্রদে আশ্রয় লইয়াছে অতএব এই খলকে দণ্ড বিধানে নিগ্রহ করিয়া কালিন্দীর জলকে শোধন করিতে হইবে। তখন শ্রীকৃষ্ণ তীরস্থ কেলি কদম্বে আরোহণ করিয়া হ্রদে লম্ফ প্রদান করিলে হ্রদের জল শত ধনু ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল। সেই শব্দে স্বগৃহের অভিভব দেখিয়া কালিনাগ অত্যন্ত ক্রোধে অতি-সুকোমল শ্রীকৃষ্ণের চরণে দংশন করিল এবং শতফণা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আচ্ছাদিত করিল। শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে অতি ব্যাকুল সখাগণ উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিল এবং ধেনু, বৎস, বৃষ প্রভৃতি উচ্চস্বরে হাম্বা হাম্বা রব করিতে লাগিল।

এদিকে ব্রজেও ভূমিকম্প, উল্কাপতি, নেত্রস্পন্দন এই ত্রিবিধ উৎপাত আরম্ভ হইল। মাতা ব্রজেশ্বরী উদ্বিগ্নে অতি কাতর হইয়া বলরামকে বলিলেন বাপ্, বলরাম! আজ কেন আমার দক্ষিণাঙ্গের স্পন্দন হইতেছে এবং প্রাণ আকুলি বিকুলি হইতেছে, আমার মনে হয় বনে কোন প্রমাদ ঘটিয়াছে। বিশুদ্ধ মাধুর্য্য ভাবাবগাহী ব্রজবাসীগণ নিশ্চয় করিলেন যে বলরাম সঙ্গে না যাইবার ফলে কৃষ্ণের কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে তখন ব্রজের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলকে দুঃখিত দেখিয়া কৃষ্ণ প্রভাব বিদ শ্রীবলরাম ঈষৎ হাস্য করিয়া সকলকে সঙ্গে নিয়া কৃষ্ণপদ চিহ্নিত ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া সেই পথে যমুনা তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। যমুনা তীরেও গোবৎস শিশুগণকে

রোদন করিতে দেখিয়া মা যশোদা অতি আর্ত্ত হইয়া শিশুগণকে বলিলেন—বাছা আমার প্রাণ গোপাল কোথায়? মায়ের বাক্যে শিশুগণ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন মাগো—তোমার গোপাল কালিদহে ঝাঁপ দিয়াছে, ইহা শুনিবামাত্রই সমস্ত ব্রজজন অতি আর্ত্তনাদ সহ বিবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং সগোষ্ঠী ব্রজরাজ কালিদহে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইলে শ্রীবলরাম তাঁহাদিগকে নিষেধ করিয়া বলিলেন—আপনাদের কোন চিন্তা নাই, আপাদিগকে ছাড়িয়া কৃষ্ণ কোথাও যাইবে না, ক্ষণেক বিলম্ব করুন, সত্বর এখানেই কৃষ্ণকে দেখিতে পাইবেন। বলরামের সুমধুর বাক্যে সকলে কিছু স্থির হইল। তখন ব্রজজীবন কৃষ্ণ ব্রজজনকে বিপন্ন ও শোকাকুলা দেখিয়া স্বেচ্ছানুসারে দেহবৃদ্ধি করিলে কালীয় অতি পীড়িত হইয়া কৃষ্ণকে ত্যাগ করিলে সেই অবসরে শ্রীকৃষ্ণ দ্বীপের উপর তাহার চতুর্দ্দিকে ত্বরিত গতিতে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে কালীয় ক্ষীণতেজ হইয়া পড়িলে অকস্মাৎ কালীনাগের মস্তকে আরোহণ করিয়া অখিল কলাগুরু তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নর্ত্তনে নাগের সহস্রফণা বিদীর্ণ হয় এবং রক্ত বমন করিতে করিতে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িলে তৎকালে তাহার দিব্যজ্ঞানের উদয় হইল। তখন কালীয় শ্রীকৃষ্ণকে চরাচরের আদি গুরু পুরাণ পুরুষ জানিয়া মনে মনে তাঁহার শ্রীচরণে শরণাপন্ন হইল এবং নাগপত্নীগণও পতির আসন্ন মৃত্যু দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণত হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে বহুশঃ

স্তুতি করিয়া পতির অপরাধ মার্জ্জনার প্রার্থনা করিলেন। নাগপত্নীগণের স্তবাদি শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ ভগ্নশির মূর্চ্ছাপন্ন কালিয়কে ত্যাগ করিলেন। কালীয় নাগও পারমৈশ্বর্য্য দ্যোতক বহুশঃ স্তুতি করিল। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—শোন সর্প! গো মনুষ্য সকলে এই কালিন্দীর জল পান করে, অতএব তুমি এখান হইতে শীঘ্রই পরিজনকে লইয়া তোমার সেই রমণক দ্বীপে গমন কর, আর যার ভয়ে এই হ্রদ আশ্রয় করিয়াছ সেই গরুড় তোমার মস্তকে আমার চরণ চিহ্ন দেখিলে ভক্ষণ করিবে না। নাগপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেন। অনন্তর কালিনাগ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে দারাপত্যাদি লইয়া শ্রীকৃষ্ণকে পরিক্রমা করতঃ রমণক দ্বীপে গমন করিল। শ্রীকৃষ্ণও হ্রদ হইতে তীরে আগমন করিয়া নিকটস্থ টীলায় আরোহণ করিলে সমস্ত ব্রজবাসী শ্রীকৃষ্ণ নিরীক্ষণে দেহে প্রাণ পাইলেন। বলরাম শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সানন্দে আলিঙ্গন করিলেন, সখাগণ ভাইয়া ভাইয়া বলিয়া কৃষ্ণকে স্পর্শ করিল, ব্রজরাজ শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া নাচিতে লাগিলেন, মা যশোদা গোপালকে কোলে লইয়া মুখ চুম্বন করিয়া মস্তক আঘ্রাণ করিলেন, গাভীগণ শ্রীকৃষ্ণ নিকটে আসিয়া হাম্বা হাম্বা রব করিতে লাগিলেন, ব্রজপূজ্য বিপ্রগণ সস্ত্রীক কৃষ্ণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, ব্রজরাজ ও সানন্দে ব্রাহ্মণগণকে গো হিরণ্য দান করিলেন। এইরূপে এখানে অপরাহ্ণ ব্যতীত হওয়ায় পরিশ্রান্ত সমস্ত ব্রজবাসী এই দিন রাত্রে এখানে বিশ্রাম করিলেন।

শ্রীগোপাল ঘাট—ইহা কালিদহের উত্তরে অবস্থিত। শ্রীব্রজরাজ ও মা যশোদা এই ঘাটে উপবেশন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কালিনাগ দমনের পর তীরে উঠিলে শ্রীব্রজরাজ ও ব্রজেশ্বরী নয়ন জলে আর্দ্র চিত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে কোড়ে লইয়া সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবলোকন করতঃ এই ঘাটে বসিয়া শ্রীনন্দ শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণের নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণকে বহুগাভী দান করিয়াছিলেন।

শ্রীসূর্য্য ঘাট বা দ্বাদশাদিত্য ঘাট ইহা গোপাল ঘাটের উত্তরে অবস্থিত। ঘাটের উপরিস্থ টীলাকে দ্বাদশাদিত্য টীলা বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ কালীয় দমন করিয়া তীরে আসিয়া এই টীলায় উপবেশন করিলে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শনে দেবতাগণ আনন্দিত হইলেন। তখন সূর্য্যদেব শ্রীকৃষ্ণকে শীতার্ত্ত জানিয়া তাঁহার সেবায় নিমিত্ত ভক্তিভরে উগ্র তাপদানে সেবা করিতেছিলেন। উদার চরিত শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহন রূপ প্রকাশ করিয়া নিশ্চল ভাবে সেবা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন দ্বাদশাদিত্যের উগ্ররশ্মি বিকীর্ণ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ হইতে স্বেদবিন্দু নির্গত হইয়া ধারারূপে যমুনায় পতিত হওয়ায় দ্বাদশ আদিত্যের ঘাট প্রস্কন্দন তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। এই ঘাটে স্নাত ব্যক্তি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং যে ব্যক্তি এই স্থানে প্রাণ ত্যাগ করে সেই ব্যক্তি বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে।

শ্রীযুগল ঘাট ইহা দ্বাদশাদিত্য ঘাটের উত্তরে অবস্থিত। এখানে শ্রীযুগল বিহারীর প্রাচীন মন্দির চূড়াহীন অবস্থায় বিরাজমান। এই মন্দির প্রতাপাদিত্যের খুড়া

শ্রীবসন্ত রায়ের অর্থে প্রস্তুত।

শ্রীবিহার ঘাট—এই ঘাট যুগল ঘাটের উত্তরে অবস্থিত

শ্রীআন্ধের ঘাট—ইহাও যুগল ঘাটের উত্তরে, এই ঘাটের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাগণের নেত্রে অঙ্গুলিবদ্ধ ক্রমে লুকলুকানি খেলা করিয়াছিলেন।

ইমলিতলা ঘাট—ইহা আন্ধের ঘাটের উত্তরে অবস্থিত এই ঘাটের উপরিস্থ ইমলি বৃক্ষ অতি প্রাচীন। শ্রীকৃষ্ণ লীলার সমসাময়িক বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীরাধিকার বিরহে শ্রীকৃষ্ণ অধীর হইয়া এই ইমলি তলার কুঞ্জে উপবেশন করিয়া বিহ্বল অন্তরে শ্রীরাধানাম জপ করিয়াছিলেন। একদা রসিক শেখর শ্রীকৃষ্ণ যমুনা তীরে ব্রজরামাগণের সমভিব্যাহারে রাস-ক্রীড়ায় বিবিধ রসোপভোগে প্রমত্ত হইলেন, কিন্তু সকল গোপীর প্রতি একই প্রেম ব্যবহার দর্শন করিয়া মাদনাখ্য মহা-ভাববতী শ্রীরাধিকার বাম্য স্বভাবে মানের উদয় হওয়ায় তিনি নিজ সখীগণকে সঙ্গে লইয়া রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া আত্মগোপন করিলেন। লীলামগ্ন শ্রীকৃষ্ণ কিয়ৎপরে শ্রীরাধার অদর্শনে অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। অনন্তর শ্রীরাধার বিরহে মদন পীড়িত মদনমোহন বিহ্বল অন্তরে রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া রাস লীলার শৃঙ্খলা শ্রীরাধিকার অন্বেষণে শ্রীরাধানাথ বহির্গত হইলেন। শ্রীরাধার বিরহে মদন পীড়িত মদনমোহন অতি বিহ্বল অন্তরে কুঞ্জে কুঞ্জে হা রাধে দেখা দাও, প্রেমময়ি দেখা দাও, তোমার অদর্শনে প্রাণে মরি একবার দেখা দাও এইরূপে

আর্ত্ত মদনমোহন কোথাও শ্রীরাধিকার সন্ধান করিতে না পারিয়া অবশেষে যমুনার তীরে এই ইমলিতলার কুঞ্জের মধ্যে উপবেশন করিয়া বিহ্বল অন্তরে শ্রীরাধামন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। প্রেমাতিশয্যে প্রেমবিহ্বল শ্রীকৃষ্ণ তখন যেদিকে নিরীক্ষণ করিতেছেন সেই দিকেই রাধাময় দর্শন করিতেছেন। এইরূপ দর্শন করিতে করিতে তন্ময় হইয়া শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাব-দ্যুতি সুবলিত শ্রীগৌরাঙ্গরূপ ধারণ করতঃ বিপ্রলম্ভ রস আস্বাদন পূর্ব্বক মহানন্দে সমাধিস্থ হইলেন। ইত্যবসরে শ্রীরাধিকা সখীগণ সহ তথায় উপস্থিত হইয়া অতিমনোরম গৌরাঙ্গরূপ দর্শনে আশ্চার্য্বিতা হইলেন। অনন্তর সখীগণের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ স্পর্শ করিবামাত্র শ্রীকৃষ্ণ চকিত হইয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং সখীগণের সহিত শ্রীরাধাকে দর্শন করিলেন। সখীগণও যুগল স্বরূপ দর্শনে পরমানন্দিতা হইলেন। এই ইমলি তলাতে শ্রীগৌর লীলার প্রথম সূচনা। ইনি কলিযুগে শ্রীরাধাভাব আস্বাদিতে শচীগর্ভ সিন্ধু মাঝে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করতঃ এই পরম চিক্কন পিড়ি বাঁধা প্রাচীন তেঁতুল তলে উপবেশন পূর্ব্বক শ্রীহরিনাম জপ ও কালিন্দীর শোভা দর্শন করিতেন। এই ইমলি বৃক্ষের নিম্নে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ ও শ্রীমূর্ত্তি শোভা বর্দ্ধন করিতে-ছেন ও সম্মুখস্থ শ্রীমন্দিরের প্রথম প্রকোষ্ঠে শ্রীরাধাগোপীনাথ জীউ, দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে শ্রীনিতাই গৌর ও তৃতীয় প্রকোষ্ঠে গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

দর্শনীয়। তিনিই কলিযুগে শ্রীরাধাভাব আস্বাদিতে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপে অবতীর্ণ হইয়া যখন শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়াছিলেন, সেই সময় এই ইমলি বৃক্ষের তলে উপবেশন করিয়াছিলেন। সেই অবধি এই ঘাটের নাম ইমলি ঘাট বা শ্রীগৌরাঙ্গ ঘাট বলিয়া প্রসিদ্ধ।

শ্রীশিঙ্গার ঘাট—নামান্তর শিঙ্গারবট—ইহা ইমলি-ঘাটের উত্তরে অবস্থিত। পরম রমণীয় এই বৃক্ষের মূল প্রস্তর বেদীতে নিবদ্ধ। চতুর্দ্দিক বিবিধ কাননে পরিপূর্ণ। শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া এই স্থানে উপবেশন করতঃ অমৃতবাহিনী শ্রীযমুনার পরম শোভা দর্শন করিয়াছিলেন। প্রভু শ্রীনিতাই চাঁদ বাল্যলীলার আবেশে প্রত্যহ এই স্থানে ধুলি খেলা খেলিতেন। শ্রীকৃষ্ণ রাস রজনীতে এই ঘাটে উপবেশন করিয়া শ্রীরাধিকার বেশ রচনা করিয়াছিলেন। এই স্থানে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর বংশধর কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরের সেবা পরম সমাদরে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছেন। এই স্থানে নিবাসে শ্রীনিতাই চাঁদের কৃপা লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীগোবিন্দ ঘাট—ইহা শিঙ্গার বটের উত্তরে অবস্থিত। শ্রীগোবিন্দ রাসমণ্ডলে অন্তর্দ্ধান হইলে এই স্থানে গোপীগণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীচীর ঘাট—ইহা গোবিন্দ ঘাটের উত্তরে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ জলক্রীড়া করিবার সময় কৌতুক করিয়া বসন অপহরণ করিয়া এই স্থানে কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই

হেতু এই ঘাটের উপরিস্থ কদম্ব বৃক্ষকে চীর কদম্ব বলিয়া উল্লেখ করা হয়। শ্রীবৃন্দাবনে সাধারণতঃ তিন কদম্বই প্রসিদ্ধ যথা—কালী কদম্ব, চীর কদম্ব, ও দোলা কদম্ব। শ্রীকৃষ্ণ কেশিদৈত্যকে বধ করিয়া এই ঘাটের উপর উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এই হেতু এই ঘাটের অপর নাম চেহন ঘাট।

শ্রীভ্রমর ঘাট—ইহা চীর ঘাটের উত্তরে অবস্থিত; এই ঘাটের তীরস্থ উদ্যান অতি রমনীয় কদম্ব ও বিভিন্ন পুষ্প রাজিতে সুশোভিত, এই স্থানের বিকশিত পুষ্পসমূহের সৌরভে মধুলোভী মধুকর আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যহ আগমন করে, ভ্রমর গুঞ্জণে মুখ রত, ফলফুলে সমৃদ্ধিশালী এই কানন সতত চতুর্দ্দিক গন্ধে আমোদিত করে, নন্দন কানন তিরস্কৃত অতুলনীয় শোভায় সুশোভিত শ্রীরাধাগোবিন্দ এই কাননে বন বিহারে আগমন করিলে শ্রীরাধিকার স্বাভাবিক অঙ্গ সৌরভে ভ্রমরগণ উন্মত্ত হইয়া শ্রীরাধা অঙ্গে পতিত হইত, শ্রীরাধা হস্ত কমল দ্বারা বিতাড়িত করিতে থাকিলে তাঁহার প্রচেষ্টা বৃথাই হইত কারণ পদ্ম গন্ধি শ্রীরাধা ভ্রমরকে নিবারণের যতই চেষ্টা করিতেন তাহাতে তাঁহার উছলিত অঙ্গগন্ধে দিগন্ত মুখরিত হওয়ায় ভ্রমরগণ উন্মত্ত হইয়া শ্রীরাধা অঙ্গে পতিত হইত, অবশেষে শ্রীরাধা নিরূপায় হইয়া শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয়েরমধ্যে লুকায়িত হইতেন। তখন রসিকবর সানন্দে শ্রীরাধাকে চুম্বনালিঙ্গনে আবদ্ধ করতঃ বিবিধ রসলীলার উদ্ভাবন পূর্ব্বক বিহার করিতেন।

এখানে শ্রীরাধাগোবিন্দের অঙ্গ সৌরভে ভ্রমরগণ অতি মত্ত হইয়া উড়িতেছিল, এই হেতু ভ্রমর ঘাট বলিয়া প্রসিদ্ধ

কেশী ঘাট—ইহা ভ্রমর ঘাটের উত্তরে এবং শ্রীবৃন্দাবনের উত্তর পশ্চিম কোণে, এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ কেশীদৈত্যকে নিধন করিয়াছিলেন। ব্রজপুরে শ্রীকৃষ্ণ অরিষ্টাসুরকে নিধন করিলে কংস ইহা নারদের নিকট শ্রবণ করিয়া সক্রোধে ময়দানবের পুত্র কেশীনামক অসুরকে শ্রীরামকৃষ্ণ ভ্রাতৃদ্বয়ের নিধনের নিমিত্ত প্রেরণ করেন। কেশীদৈত্য বিশাল অশ্বের রূপ ধারণ করিয়া ব্রজপুরে উপস্থিত হইলে সমস্ত ব্রজবাসী ভয়ে ব্যাকুলিত হইয়াছিল। বাল্যলীলায় গোচারণ রত শ্রীকৃষ্ণকে কংসচর কেশী আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে প্রচণ্ড বেগে প্রত্যাঘাত করিলেন এবং অশ্বের পদদ্বয়কে স্বীয় হস্তে ধারণ পূর্ব্বক ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলে অচেতন হইয়া ধরাশায়ী হইল। পরে চেতনা লাভ করিয়া অশ্ব পুনরায় আক্রমণে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহার মুখে হস্ত প্রবেশ করাইলেন, কেশী শ্রীকৃষ্ণের হস্ত চর্ব্বণ করায় তাহার সমস্ত দন্ত উৎপাটিত হইয়া যায়। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের হস্ত প্রহারে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া কেশীদৈত্য প্রাণ ত্যাগ করিল। অসুরের মৃত্যুতে সখাগণ আনন্দিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসা করিলে সখাগণের আনন্দে শ্রীকৃষ্ণ বলরামও আনন্দিত হইলেন। কেশীদৈত্যের রুধির লিপ্ত হস্ত যুগল শ্রীকৃষ্ণ এই ঘাটে ধৌত করিয়াছিলেন এই হেতু ইহা কেশীঘাট নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থানে স্নান করিলে গঙ্গা স্নান

হইতেও শতগুণ ফললাভ হয়। এখানে পিণ্ড প্রদানে গয়া-পিণ্ডের ফল লাভ হয়। এই ঘাটের সন্নিকটে শ্রীপ্রাণ গৌর নিত্যানন্দ মন্দির এবং গৌর গদাধরের প্রাচীন মন্দির। এই মন্দিরে শ্রীগদাধর গোস্বামীর দন্ত সমাজ এবং রাস্তার অপর পার্শ্বে শ্রীগৌর শিরোমণি মহাশয়ের সমাধি অবস্থিত।

শ্রীধীর সমীর—ইহা কেশীঘাটের পূর্ব্বে ও বৃন্দাবনের উত্তর দিশায় অবস্থিত। শ্রীযমুনার সমীপস্থ পরম শোভনীয় শ্রীরাধাগোবিন্দের সুখবিহারের একান্ত স্থান। যুগল কিশোরের সেবার নিমিত্ত মলয় সমীর এই স্থানে ধীরে প্রবাহিত হইয়াছিল। একদিন শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে আগমন করতঃ নানা—বর্ণের বিকশিত পুষ্পরাজির আঘ্রাণ ও যমুনার কর্পূর সন্নিভ সুকোমল বালুকা রাশি দর্শন করিয়া তাঁহার প্রিয়ার কথা মনে উদয় হয়, তাহাতে তিনি সহসা বিচলিত হইয়া বলিতে লাগিলেন হে বৃন্দে! তুমি আমাকে বল আমি কিরূপে তাহার সহিত মিলিতে পারে? এই স্থানে আমি একাকী ভ্রমণ করিতেছি. ইহাতে মদন আমাকে দুর্ব্বল মনে করিয়া অতীব পীড়া দান করিতেছে। মদনের বাণে আমাকে সাতিশয় জর্জ্জরিত করিতেছে, আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না, আর দেখ সখি! মন্দ মন্দ বায়ুর স্পর্শে কাননের প্রফুল্লিত, পুষ্পরাজি গন্ধ ছড়াইতেছে, মধুকর পুষ্পের মধুপানে প্রমত্ত, কোকিলের কুহু তান বিহঙ্গের ঝঙ্কার, জ্যোৎস্না সম্পাতে যমুনার তরঙ্গ সতই উদ্বেলিত হইতেছে, ইহা দর্শনে আমি অত্যন্ত চঞ্চল,

বৃন্দে! প্রিয়াবিহীন আমি আর ক্ষণ কালও বাঁচিতে পারিব না। হে বৃন্দে! তুমি যে কোন প্রকারে প্রিয়াকে আমার সহিত মিলিত করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর। মদনমোহন আজ মদন বাণে খিন্ন হইয়া যমুনার বনে বনে প্রিয়তমকে অন্বেষণ করিতেছেন, কখনও বা উচ্চস্বরে রাধা রাধা বলিয়া আহ্বান করিতেছেন, আবার কখনও বা রাধা রাধা বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে ধুলায় গড়াগড়ি যাইতেছেন, আবার কখনও অতি ব্যগ্র হইয়া কুঞ্জে যাইতেছেন, কিন্তু তথায় শূন্য কুঞ্জ দেখিয়া আবার বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন। অবশেষে তিনি এক কুঞ্জ কুটীরে প্রবেশ করিয়া ক্রীড়ার উপযুক্ত স্থান দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলেন এবং বিবিধ কলা কৌশলের সহিত বিলাসোচিত শয্যা সাজাইতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীমদন মোহন আজ বৃক্ষ হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া স্বয়ংই শয্যা রচনা করিতেছেন। কুঞ্জের চতুর্দ্দিকে বিবিধ কুসুমের বন্ধন মালা বাঁধিলেন! আবার গুয়া প্রভৃতি দ্বারা তাম্বুল প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। শ্রীমদনমোহন আজ এই রূপে মনোযোগের সহিত শয্যা রচনা করিতে করিতে কোন শব্দ শুনিলে প্রিয়তমার আগমন জানিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসেন, আবার কখনও বা ভাবাবেশে রাই রাই বলিয়া সম্বোধন করিতে থাকেন বৃন্দাদেবী, শ্রীকৃষ্ণের এই ব্যাকুলতা দেখিয়া সত্বরই শ্রীরাধিকার নিকট উপনীত হইলেন। শ্রীমতী বৃষভানু নন্দিনী বৃন্দাদেবীকে নিরতিশয় ব্যাকুলা ও চিন্তিতা

দেখিয়া বলিলেন বৃন্দে! বল বল তুমি এতই ব্যাকুল হয়েছ কেন? বৃন্দা অধোবদনে সাশ্রুনয়নে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলে শ্রীরাধিকা প্রাণ কোটি প্রিয়তমের সেই অবস্থা শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে মূর্চ্ছিতা হইলেন এবং বাক্‌রোধ ও বাহ্যস্মৃতি হারাইলেন। রাধিকার অবস্থা দেখিয়া সখীগণ বহুরূপে সেবা শুশ্রুষা করিতে লাগিলেন কিন্তু কোন প্রকারেই তাঁহার বাহ্যস্মৃতি ফিরে আসে নাই, বৃন্দাদেবীও কোন উপায় না দেখিয়া সকলেই চিন্তা সাগরে নিমজ্জিত হইলেন। সখী-গণের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেল, কারণ শ্রীমতী ভানু নন্দিনী সকলের অলক্ষ্যে প্রিয়তমের নিকট অভিসার করিয়া-ছেন। অবশেষে বৃন্দাদেবী উপায়ান্তর না দেখিয়া শ্রীরাধার কর্ণে শ্রবণ সুখকর শ্রীকৃষ্ণ নাম করিতে লাগিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন গাও, গাও, আমার বঁধুর গুণ গান গাও তখন বৃন্দাদেবী বলিলেন—হে রাধে তুমি এত বিলম্ব করিতেছ কেন? শ্রীনন্দ নন্দন, তোমার নিমিত্ত কুঞ্জ সাজাইয়া অতি আর্ত্ত ভাবে তোমার গুণগান করিতেছেন এবং অনুক্ষণ তোমার ধ্যান, তোমার মন্ত্র জপ করিতেছেন, তোমার অঙ্গ সঙ্গ দানে সত্বরই তাঁহার জীবন দান কর। শ্রীরাধিকা প্রিয়তমের অবস্থা শ্রবণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পুনরায় বৃন্দা বলিলেন—শ্রীনন্দনন্দন রতি সুখাভিলাষে অভিসার করিয়া মৃদু মন্দ মলয় সমীর প্রবাহিত যমুনার নির্জ্জন কুঞ্জ কুটীরে শয্যা সাজাইয়া অপেক্ষা

করিতেছেন। ওই শোন তোমার বঁধু তোমার নাম ধরিয়া বেণু ধ্বনি করিয়া বলিতেছেন হে প্রিয়ে। আমি তোমার জন্য কুঞ্জে শয্যা সাজাইয়া নিবিড় ধীর সমীরে একতান চিত্তে তোমার দিকে তাকাইয়া আছি। আমাকে আলিঙ্গন দানে সুখী কর,তোমার অধর সুধা পান করাইয়া মদন তাপিত দেহকে সরস কর। অতএব হে রাধে! তুমি অতি সত্বর অভিসার কর, এবং তোমার এই শুভ্র বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নীলাম্বর ধারণ কর, হে পঙ্কজনয়নে। অর্দ্ধরাত্র অতিবাহিত প্রায় অতিসত্বর বেশভূষা রচনা করিয়া অভিসার কর নতুবা অবশেষ রাত্রও গত হইয়া যাইবে। বৃন্দার বাক্যে শ্রীরাধিকা অতি উৎকণ্ঠিতা হইয়া বলিলেন হে ললিতে! আমি আর ক্ষণকাল স্থির থাকিতে পারছি না,আমি এখনই অভিসার করিব তুমি আমাকে সাজাইয়া দাও। তখন সখীগণ পরমানন্দে শ্রীরাধিকাকে সাজাইয়া দিলে মন্থর গতিতে বৃন্দাদেবীর সহিত অভিসার করিলেন। শ্রীরাধা ধীরে ধীরে ধীরসমীরে উপনীত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জ হইতে শ্রীরাধাকে দেখিয়া তাঁহার আনন্দসাগর উথলিয়া উঠিল। সত্বর অগ্রেগিয়া শ্রীরাধাকে ভূজলতায় আবদ্ধ করিলেন,শ্রীরাধাও প্রাণ প্রিয়কে গাঢ় আলিঙ্গনে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। সাত্বিকভাবে যুগলকিশোরের নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু প্রবাহিতহইয়া ভূমিতলকে ক্লিন্ন করিতেছে, অপরূপ যুগলস্বরূপ দর্শনে সখীগণ আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইলেন, শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বংশধরগণ এখানে বাস করিতেছেন। আচার্য্য প্রভুর এই কুঞ্জে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর

দর্শনীয় অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি বিরাজমান। এইমন্দিরের সম্মুখে শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের সমাজ বিরাজমান।

শ্রীরাধাবাগ ঘাট—এইঘাট ধীরসমীরের পূর্ব্বে ও বৃন্দাবনের ঈশানকোণে অবস্থিত। শ্রীযমুনাতীরস্থ পরম শোভনীয় নির্জ্জন এই স্থানের দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ লীলার স্মৃতি জাগাইয়া দেয়।

শ্রীপাণি ঘাট—এই ঘাট রাধাবাগের দক্ষিণ এবং বৃন্দাবনের পূর্ব্ব ভাগে অবস্থিত। ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশে শ্রীদুর্ব্বাসা মুনিকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত এইঘাটে শ্রীযমুনা পার হইয়া পর পারে গিয়াছিলেন।

শ্রীআদি বদ্রীঘাট-ইহা পাণিঘাটের দক্ষিণ এবং বৃন্দাবনের দক্ষিণ পূর্ব্বকোণে প্রাচীন যমুনাতীরে অবস্থিত। এইঘাটে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে শ্রীআদি বদ্রীনাথকে দর্শন করাইয়াছিলেন।

শ্রীরাজঘাট-ইহা আদি বদ্রীঘাটের দক্ষিণ এবং শ্রীবৃন্দাবনের দক্ষিণ পূর্ব্বকোণে প্রাচীন যমুনাতীরে অবস্থিত। এইঘাটে শ্রীকৃষ্ণ নাবিক হইয়া শ্রীমতী শ্রীরাধিকাকে যমুনা পার করিয়াছিলেন। এই ঘাটের উপরিভাগে শ্রীবলদেবজীউ দর্শনীয়।

ইতি শ্রীহরিভক্ত দাস কর্ত্তৃক সংগৃহীত
শ্রীশ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্য সমাপ্ত।

বৃন্দাবনস্য মাহাত্ম্যং সর্ব্বতীর্থ শিরোমণেঃ
দীনেন হরিভক্তেন সঙ্কলিতমিদং পরম্॥

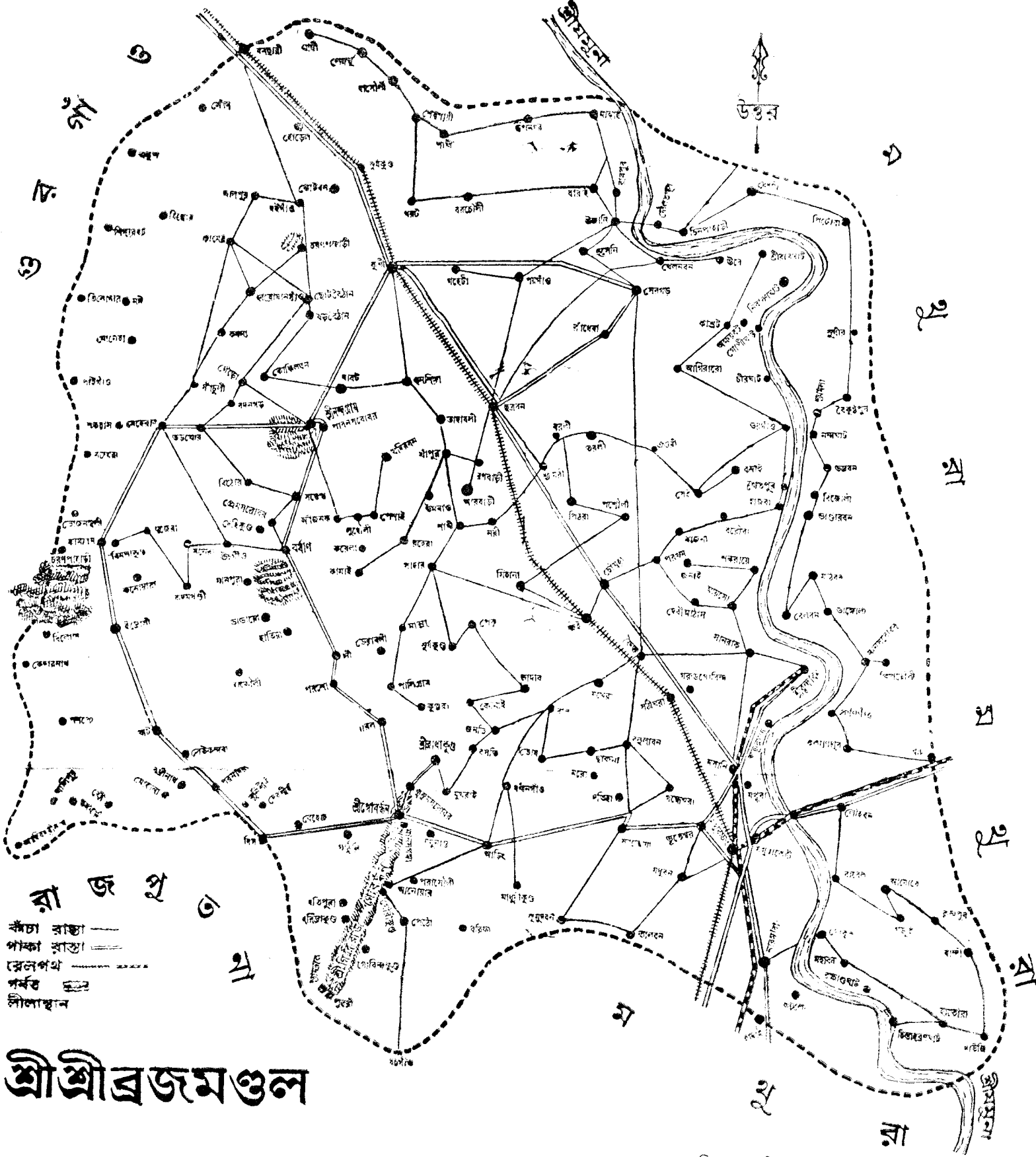

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল

শ্রীধাম নবদ্বীপ পোড়াঘাট শ্রীহরিধ্বোনকুটীরস্থ
৺শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা
শ্রীযুং মুকুন্দ দাস বাবাজী মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

❀ নব প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ❀

১। শ্রীশ্রীভাগবত মাহাত্ম্য (পদ্মপুরাণ)
২। শ্রীশ্রীভগবদ্ভক্তি সার সমুচ্চয়
৩। শ্রীশ্রীস্তোত্র রত্নাবলী
৪। শ্রীশ্রীহংসদূত, (টীকা, অন্বয়, অনুবাদ)
৫। শ্রীশ্রীপদাঙ্কদূত, (টীকা, অন্বয় অনুবাদ)
৬। শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা, (সটীক)
৭। শ্রীশ্রীনরোত্তম প্রার্থনা
৮। শ্রীশ্রীলঘুভাগবতামৃত, (টীকাদ্বয়োপেত আভাসানু
৯। সচিত্র শ্রীশ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্য (ব্রজমণ্ডল পরিক্র
১০। শ্রীশ্রীভজন গীতি, (শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম

ভিক্ষা ১৫.০০

শ্রীহরিনাম প্রেস, বৃন্দাবন